

পথের বাধা সরিয়ে দিন মানুষকে এগোতে দিন



ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৪

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।

উৎসর্গ

দেশের সকল তরুণেব হাতে তুলে দিলাম, যারা অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রাখে। গুরুজনদের পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনার জন্য অপেক্ষা না-করে দেশেব বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদেরকে পরিচিত করে, নিজেদেব বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভব করে এককভাবে ও সংগঠিতভাবে তাবা এগিয়ে আসুক।



পথের বাধা সরিয়ে নিন, মানুষকে এগুতে দিন

ভূমিকা

সভা-সমিতি, অনুষ্ঠান করতে গেলে বক্তা যোগাড় করতে হয়। যে কাউকে দিলেই বক্তা যোগাড়ের এ দায়িত্ব পালন সুসম্পন্ন হয় না। একাজের জন্য বিশেষ প্রতিভাবান এবং কুশলী ব্যক্তির প্রয়োজন পড়ে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এত কুশলী যে তাঁরা বোবার মুখ দিয়েও কথা বের করিয়ে ছাড়েন। অতীতে বিভিন্ন সময়ে আমিও যে এরকম প্রতিভা সম্পন্ন বক্তা-সংগ্রহকারীর হাতে পড়েছিলাম তার সাক্ষ্য প্রমাণের সংকলন নিয়েই এই গ্রন্থ।

আমরা কথারু জাতি। কথা বলতে ভালবাসি। কথার পিঠে কথা চড়িয়ে কথার পাহাড় বানাই। কথা সৃষ্টিতে আমাদের আনন্দ। আমাদের কথার জগতের সঙ্গে কাজের জগতের কোন ঘনিষ্ঠতা নেই। কাজের জন্য কথা এবং কথার জন্য কাজ, এরকম কোন নিয়ম দ্বারা আমরা শাসিত হতে চাইনি কোনদিন। কথার জন্য কথা, এটাই বোধ হয় আমাদের জন্য এখন নিয়মে দাঁড়িয়েছে।

বক্তৃতার মাধ্যমে কথার জগতে প্রবেশ করে আমার ভিন্ন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এই কথারু জাতির ভেতর কাজের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহের এবং শ্রদ্ধাপরায়ণতার সন্ধান পাচ্ছি। প্রতিটি বক্তৃতার পর অনেক দিন ধরে মানুষের মুখে সে বক্তৃতার উল্লেখ শুনি। বক্তৃতার কপি সংগ্রহ করার জন্য চিঠি পাই। আমার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে এসেছেন এমর্মে বিস্তারিত কর্মসূচীর অনুলিপি পাই। সব চাইতে অবাক হয়েছি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় এবং গণতান্ত্রিক ফোরামের সম্মেলনে প্রদত্ত আমার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়ায়। এত চিঠি, এত টেলিফোন, এত জনের দেখা করতে আসা, এত মতামত, এত মন্তব্য সব কিছুই অভাবনীয় ছিল আমার পক্ষে।

এত দিন আমার ধারণা ছিল আমার পরিচয় গ্রামীণ ব্যাংকের কারণে। এখন আমার মনে হচ্ছে আমার পরিচয় এই দু'টি বক্তৃতার কারণে। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, বেকার তরুণ, বিভিন্ন পেশার পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সন্ত্রাস সংগঠনকারী মাস্তান, আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনীতির পোড়খাওয়া জেলখাটা প্রাক্তন নেতা, সরকারী ও বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতা, দোকানদার, ব্রিক-ফিল্ডের ম্যানেজার অসংখ্য অপরিচিত মানুষ অসংখ্যরকম চিঠি লিখেছেন আমার বক্তব্যের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়ে। তাঁদের নিজেদের বক্তব্য যুক্ত করে।

মানুষ কাজ চায়। কথা চায় না। শৃংখলা চায়। বিশৃংখলা চায় না। গতি চায়। স্থবিরতা চায় না। নিয়ম চায়। অনিয়ম চায় না।

অপরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে যখন শুনি তিনি আমারই বক্তৃতার বিভিন্ন লাইন উদ্ধৃতি করে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছেন তখন আনন্দ পাই। এ জাতি আসলে কথারু জাতি নয়। কাজের অভাবেই আমাদের সৃজনশীলতার স্ফুরণ হয়েছে কথার মাধ্যমে।

যেদিন 'সাফ' গেমস শেষ হলো সেদিন সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে একদল ছাত্রের হাতে পড়ে গেলাম। সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কারো সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটা চায়ের দোকানে ঢুকেছিলাম এক কাপ চা খেতে। ঘেরাও হয়ে গেলাম। প্রথম প্রশ্ন ঃ ষাট লক্ষ টাকার বাজী পোড়ানোর অর্থনীতিটি আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। তারপর অসংখ্য প্রশ্ন। একসঙ্গে সকল প্রশ্ন গর্জে ওঠে আমার দিকে। আমি তরুণ। আমি কাজ চাই। আমাকে ঋণ দিন,আপনিই তো বলেছেন ঋণ মানুষের মৌলিক অধিকার। আমি নিজের কাজ নিজে বের করে নেবো। আমি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। এখন কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে আমার শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবো। কিছুদিন পর শক্তিহারা হয়ে আমি পচে যেতে চাই না। আমার শক্তিকে ব্যবহার করুন। আপনি যদি ব্যবহার করতে না পারেন আমাকে সুযোগ দিন ব্যবহার করার। আরো বহু প্রশ্ন।

দু'ঘন্টা আলাপ করে মাথা নীচু করে ছাত্রদের কাছ থেকে বহুকষ্টে বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছি। একটা অসহায় শূন্যতা বহন করে।

মাথা নীচু করে ফিরে এসেছি এজন্য নয় যে এসব প্রশ্নের জবাব আমাদের কাছে নেই। মাথা নীচু করে ফিরে এসেছি একারণে যে এদের প্রতিটি প্রশ্নের, প্রতিটি সমস্যার জন্য আমাদের কাছে চমৎকার সব সমাধান অপেক্ষা করে আছে, চমৎকার সব অভিজ্ঞতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা হাত বাড়িয়ে তা তুলে নিচ্ছি না। এই কারণেই দুঃখ। ছাত্ররা আমার কাছে চাকরী তো চায়নি --- ঋণ চেয়েছে মাত্র। ঋণ দিতে পারার মত আয়োজন করতে পারছি না কেন আমরা ? দেশে এত কাজ করার অপেক্ষায় আছে, তবু দেশের প্রাণবন্ত এত তরুণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না কেন ?

এই বই প্রকাশ করার চিন্তা এসেছে 'সুবর্ণ'র জাহাঙ্গীরের মাথায়। এর প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের চারদিকে ছড়ানো সমাধানগুলি তুলে নেবার আগ্রহ যদি সৃষ্টি হয়, এপথের প্রতিবন্ধকতাগুলি অপসারণ করার মনোবল যদি গড়ে ওঠে তাহলেই উদ্যোগটি সার্থক হবে।

সূচীপত্র

পথের বাধা সরিয়ে নিন, মানুষকে এগুতে দিন

এই মহান ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন সভায় আমন্ত্রণ করে আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্য আমি মাননীয় উপাচার্য মহোদয়, আপনার প্রতি এবং আপনার সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে বিশ্বের আসরে একটা মর্যাদাপূর্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। এই প্রতিষ্ঠানেরই একজন কৃতী ছাত্র ডঃ এফ. আর.খান দুনিয়ার সামনে বাংলাদেশীদের মাথা সমুন্নত রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন। অন্যান্য কৃতী ছাত্র, যাঁরা দেশে ও বিদেশে প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত রচনায় নিজেদের মেধার পরিচয় দিয়ে গেছেন এবং দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারাকে আরো বলবান করে তুলেছেন। আজ আপনারা যাঁরা এই গৌরবোজ্জ্বল বিদ্যাপীঠ থেকে ডিগ্রী গ্রহণ করলেন তাঁরা মানুষের মংগলের কাজে নিজেদের জ্ঞান ও সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করে নিজেদেরকে এবং এই মহান বিদ্যাপীঠকে সার্থক প্রমাণিত করবেন- এই কামনা করছি।

আপনাদের যাত্রা শুভ হোক

জীবন পথে আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। বাংলা চর্তুদশ শতাব্দীর শেষ বছরটিতে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হচ্ছে। নতুন শতাব্দীতে প্রবেশের মধ্য দিয়েই আপনাদের নতুন জীবন শুরু হবে। পুরনো শতাব্দীকে যেরকম আমরা পেছনে রেখে যাবো, আসুন, সেরকম পেছনে রেখে যাই মানুষ হিসেবে আমাদের সমুদয় দুর্বলতা, আর আমাদের যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা।

নতুন শতাব্দীতে প্রবেশের সাথে সাথে আশা করি জাতিকেও একটি নতুন জীবন লাভের এবং অসংখ্য নতুন সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টিকরার জন্য দৃঢ় অংগীকার নিয়ে আপনারা এগিয়ে আসবেন।

এক শতাব্দী থেকে আরেক শতাব্দীতে উত্তরণ একটি বিরাট পরিবর্তন। এই পরিবর্তন যেন শুধু পঞ্জিকা বদলে সীমাবদ্ধ না থাকে।

শতাব্দীর হালখাতা অনুষ্ঠানে পুরনো ভংগী, পুরনো চিন্তা, পুরনো কাঠামোগুলিকে কঠিন দৃষ্টিতে বাছাই করে আমরা শুধু শুভ অংশটি বের করে নেবো।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে, সমাজ জীবনকে যা কিছু বিড়ম্বিত করেছে তাদেরকে ত্যাগ করবো। নতুন জীবনের অংগীকার দিয়ে আমরা নতুন শতাব্দীকে বরণ করবো।

দেশের মানুষের সামনে আমরা ভাগ্যবানেরা যত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছি, যত বাধার নিরেট প্রাচীর তৈরী করেছি- নতুন দিনের শুরু হোক তা অবলুপ্তির দৃঢ় সংকল্প দিয়ে। আধুনিক বিশ্বের মহাশক্তিশালী প্রযুক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে আপনারা যে সংকল্প ব্যক্ত করবেন সে সংকল্প বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা অন্যদের চাইতে অনেক বেশী হবে তা বলাই বাহুল্য।

সাধারণ মানুষের শক্তিই রাষ্ট্রের মূল শক্তি

প্রত্যেক মানুষ সীমাহীন সম্ভাবনার আধার। সে-মানুষ দরিদ্রতম পরিবারের সদস্যই হোক, কি নিকৃষ্টতম বস্তির বাসিন্দাই হোক। যে সমাজ যত বেশী মানুষের যত বেশী পরিমাণ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে সে -সমাজ তত বেশী শক্তিশালী হবে। সে সমাজই দ্রুত নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারে যেই সমাজ জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে এমন অবস্থানে নিয়ে যেতে পারছে যেন প্রত্যেকে নিজের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এই সুযোগ মানুষ পায় যদি সরকারের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মানুষের সেবামুখী হয়, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়, শিক্ষা ব্যবস্থা সার্বজনীন হয়, কর্মমুখী ও স্বনির্ভরতামুখী হয়, প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনসমূহ সকল মানুষের বিকাশের সহায়ক হয়। বিশেষ করে সর্বনিম্ন স্তরের মানুষের বিকাশের সহায়ক হয়।

আমাদের সরকারী ব্যবস্থাপনা কাঠামো, কর্মপদ্ধতি,নীতিমালা, জাতীয় অগ্রাধিকার কিছুই ব্যাপক মানুষের বিকাশ-অভিমুখী নয়। আমরা সাধারণ মানুষের নাম ভাঙিয়ে এমন সব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছি যেটা শুধু আমাদের নিজেদেরই ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি আনে। এমন সব প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন করেছি যেগুলি আমাদের মত ভাগ্যবানদের কর্তৃত্বকে আরো দৃঢ় করে।

বাংলাদেশ আজ অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের দেশ। এই দারিদ্র্য রচনায় প্রযুক্তি তার মেধা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এখন দারিদ্র্য নিরসনে অধিকতর কার্যকর প্রযুক্তি নিয়ে জাতিকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ গরীব দেশ নয়, মানব সম্পদ ব্যবহারে ব্যর্থ দেশ

আমরা আমাদের দেশকে গরীব দেশ হিসেবে বর্ণনা করি। এর ফলে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তার জন্য নিজেদের গায়ে আর কোন দোষের ছায়া পড়ে না। এটা একটা গা বাঁচানো বর্ণনা। ভাবখানা এই আমাদের পূর্ব পুরুষরা কিংবা প্রকৃতি আমাদের ভান্ড ভরে দিয়ে যায়নি বলেই আমাদের আজ এই অবস্থা।

দেশের দারিদ্র্য বিশেষ ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট একটি পরিস্থিতি মাত্র : দেশ হিসেবে গরীব দেশ হবার প্রধান দায়িত্ব দেশের নীতি নির্ধারকদেরই গ্রহণ করতে হবে। আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে, নীতির দোষে নিজেদের অবস্থার পবিবর্তন করতে পারছি না- একথা মেনে নিতে হবে। এর ওর ষড়যন্ত্র বলে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টাটা হাস্যকর ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

"গরীব দেশ" বলে বর্ণনা না-করে আমরা আমাদের দেশকে "মানব সম্পদ ব্যবহারে ব্যর্থ দেশ" হিসেবে বর্ণনা করলেই আসল কথাটা সরাসরি বলা হবে। এতে আমাদের করণীয় গুলিও পরিস্কার হয়ে যাবে। উন্নয়ন উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সেটাও স্পষ্ট হবে।

দেশে উৎপাদন কম বলে মাথাপিছু হিসেবে সবাই কম পাচ্ছি। যাঁরা উৎপাদনের কাজে প্রতিভাবান, বিপুল উৎপাদন সংগঠন করতে পারতেন তাঁরা হয় উৎপাদনে উৎসাহী না হয়ে বিশেষ বিশেষ সুবিধা থাকার কারণে দ্রুত অর্থ উপার্জনকারী অন্যান্য কাজকর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, অথবা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে উৎপাদনের রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন। বড় ধরনের উৎপাদনে যেতে পারে এরকম লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে কম। দেশের কোটি কোটি মহিলা পুরুষ প্রত্যেককে যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনে নিয়োজিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারতাম তবে মোট উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বেড়ে যেতে পারতো। এ ধরনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা প্রবন্ধ রচনা করেছি, পরিকল্পনা ঘোষণা করেছি- কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার কোন প্রচেষ্টা নিইনি। ফলে উৎপাদন কমই রয়ে গেছে। মানব সম্পদে বিপুলভাবে সম্পদশালী হয়েও দেশের মানুষ গরীব রয়ে গেছে।

মানব সম্পদ ব্যবহার মানে মানুষকে নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের প্রযুক্তিতে নিরঙ্কুশ অধিকার দেওয়া। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হিসেবে এখন বিশ্বের উন্নততম প্রযুক্তির চাবিকাঠি আপনাদের হাতে। যে দেশ আপনাদের মত আধুনিকতম জ্ঞানে সমৃদ্ধ প্রযুক্তিবিদ সৃষ্টি করতে পারে সে দেশে মানবসম্পদ অব্যবহৃত থাকে কি করে? সে দেশে দারিদ্র্য লুকিয়ে থাকবে কোন জায়গায়?

এক লক্ষ কোটি টাকা কোথায় গেলো ?

গত একুশ বছরে আমরা উন্নয়নের জন্যে বিদেশী বন্ধুদের কাছ থেকে পেয়েছি ২৪ বিলিয়ন ডলার। ডলারের বর্তমান বিনিময় মূল্যে সেটা প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়। সুন্দর সুন্দর কথায় জড়ানো প্রকল্পের পেছনে এই অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রত্যেক প্রকল্প চমৎকার সব ফলাফলের অংগীকার ব্যক্ত করেছে।

প্রকল্পের ফলাফল কি হয়েছে সেটা পরে আর শোনা না গেলেও প্রকল্প রচনাকারীরা তাঁদের মোটা ফি নিয়ে গেছে এবং বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় তাঁরা সমৃদ্ধ হয়েছেন এই সুবাদে আরো উচ্চতর ফি-তে নতুন প্রকল্প রচনার কাজ পেয়ে গেছেন, পরামর্শকরা তাঁদের মূল্যবান পরামর্শের জন্য মূল্যবান প্রতিদান নিয়ে গেছেন, সরবরাহকারীরা চড়া দামে মালামাল, যন্ত্রপাতি সরবরাহ দিয়ে গেছেন, ঠিকাদার আরো দশজনের সংগে ভাগাভাগি করে মোটা মুনাফা ঘরে তুলেছেন। কিন্তু যার কারণে এত সব আয়োজন তার কোন খোঁজ রাখা প্রয়োজন কেউ অনুভব করেনি। সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

প্রকল্প রচনাকারীরা, প্রকল্প অনুমোদনকারীরা, আমাদেরকে বুঝিয়েছেন- উন্নয়ন এভাবেই হয়। ঝটপট সবাই সব কিছু পায় না। ক্রমে ক্রমে সব হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। উন্নয়নের জন্য চাই প্রবৃদ্ধি। প্রবৃদ্ধির বয়লারে স্টীম তৈরী করতে তার চুল্লীতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। দরিদ্র লোকদের এটা বুঝতে হবে। সহ্য করতে হবে।

দরিদ্ররা কষ্ট করেই যাচ্ছে। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন তাঁরা। দারিদ্র্য বাড়লেও দাঁতে দাঁতে কামড় দিয়ে থেকেছেন। উন্নয়নের বয়লারে পর্যাপ্ত স্টীম তৈরী হবার জন্য খালি পেটে দোয়াদরূদ পড়েই যাচ্ছেন। ২১ বছরে এক লক্ষ কোটি টাকার কাঠখড় পুড়িয়েও স্টীম আর তৈরী হলো না। এখন মনে সন্দেহ জেগেছে এই চুল্লীর মাথায় আসলে কি কোন বয়লার আছে? এত টাকার কাঠখড় আসলে কি চুল্লীতে পড়েছে? অর্থনীতির জটিল বিষয়কে সহজ করে বলার জন্য কখনো কখনো অর্থনীতিবিদরা বুঝিয়েছেন প্রবৃদ্ধি হচ্ছে বানের জোয়ারের মত। যখন আসে তখন সব কিছু এর উপর ভাসবে। ধনী গরীব সকলে বানের জোয়ারে এগিয়ে যাবে। ধনীর স্পীড বোট যেমন ছুটবে এর উপর, গরীবের ডিংগী নৌকাও তরতর করে এগিয়ে যাবে।

উৎসাহী অর্থনীতিবিদরা যেটা বুঝতে চান না সেটা হলো বেচারা গরীবদের উন্নয়নের বানের পানিতে ভেসে থাকার মত কোন অর্থনৈতিক নৌকাই নাই। "উন্নয়নের" বন্যা যদি কখনো আসে তবে তারা এতে বেঘোরে মারা পড়বে শুধু।

দারিদ্র্য নিরসন সম্বন্ধে আমরা আন্তরিক নই

সারা পৃথিবীতে এমন আরেকটি ভূখন্ড পাওয়া যাবে না যেখানে দারিদ্র্যের ঘনত্ব বাংলাদেশে বিরাজমান ঘনত্বের চাইতে বেশী হবে, মানবতার অবমাননা এর চাইতে নিকৃষ্টতর হবে। আমরা সুযোগ পেলেই দারিদ্র্য নিরসনের আকাঙ্খা ব্যক্ত করি। কিন্তু আদতে দারিদ্র্য নিরসন সম্বন্ধে আমরা আন্তরিক নই। যদি আন্তরিক হতাম তাহলে দারিদ্র্য নিরসনকে উন্নয়নের মূল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করতে দ্বিধা করতাম না। উন্নয়নের নামে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ দারিদ্র্য নিরসনের পেছনে ব্যয় করতাম।

দারিদ্র্য নিরসনের নামে "দুঃস্থ মাতা প্রকল্প" কিংবা "কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী" গ্রহণ করেই আমরা দায়িত্ব সম্পাদন করছি। কেউ কেউ শুনছি ফুড

ষ্টাম্পের কথাও প্রস্তাব করছেন আজকাল। এর কোনটাই দারিদ্র্য নিরসন প্রকল্প নয়। এগুলি হলো দারিদ্র্য লালন প্রকল্প।

নির্মাণ কাজে পূর-প্রকৌশলীদের কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত দক্ষ পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনের ব্যাপারে সিরিয়াস হলে আমরা তাঁদের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতাম। "ক্রিটিক্যাল পাথ" পদ্ধতিতে সমস্ত আয়োজনের দিনক্ষণ ঠিক করতাম, সেভাবে ব্যবস্থাপনা, কর্ম পরিকল্পনা গড়ে তুলতাম। জাতির সমস্ত মেধা, প্রযুক্তি-জ্ঞান এবং সাংগঠনিক প্রতিভা দারিদ্র্য নিরসনের কাজে নিয়োজিত করতাম। পৃথিবীর সকল অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে এর পেছনে লাগাতাম। কোন বছর কত শতাংশ দারিদ্র্য নিরসন করবো তার সময়সূচী নিয়ে অগ্রসর হতাম।

মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা সহজে সোচ্চার হই। কারো একটি মৌলিক মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে আমরা আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে এগিয়ে আসি। মৌলিক অধিকারের মাপকাঠিতে যদি আমরা দারিদ্র্যকে বিচার করি তাহলে দেখা যাবে দারিদ্র্য হচ্ছে সকল মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার নাম। অথচ এক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন আয়োজন গড়ে উঠে না।

উচ্চতম বিজ্ঞান ও উচ্চতম প্রযুক্তি এখন নিম্নতম মানুষটিরও ব্যবহারযোগ্য

দ্রুত পরিবর্তন চলছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। মাত্র চার পাঁচ দশকের মধ্যে প্রযুক্তির ধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। প্রযুক্তি যখন উৎপাদনকে দ্রুততর এবং ব্যাপকতব করার কাজে তার যাত্রা শুরু করে তখন তার প্রবণতা ছিল উৎপাদন ইউনিটকে সম্প্রসারিত করে উৎপাদন ব্যয় কমানোর সুবিধা করে দেয়া। প্রযুক্তির ঝোঁক ছিল পুঁজিঘন বিনিয়োগের দিকে। শক্তি ব্যবহার বহুল, নবায়ন-অযোগ্য সম্পদ ব্যবহার ঘন কর্মকান্ডের দিকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অতীতের সেদিনগুলো পিছনে ফেলে এখন এমন এক অবস্থানে এসেছে যেটা মানব সম্পদ ব্যবহারে অনগ্রসর দেশসমূহের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহব্যঞ্জক। মাইক্রোচীপের আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে সম্পূর্ণ এক নতুন পথ ধরে ভৌত প্রযুক্তি দ্রুত এগিয়ে গেছে। প্রতিটি নতুন ধাপ ভৌত-প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের দিকে নিয়ে এসেছে। ইলেকট্রনিক এবং কম্প্যুটার প্রযুক্তি মাইক্রোচীপের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে অতীতের সকল ধ্যান-ধারণাকে রাতারাতি পাল্টে দিয়েছে।

যে কম্প্যুটারকে একদিন সকলে ভয়ের চোখে দেখেছিল মানুষের কর্মসংস্থান কেড়ে নেবে মনে করে, আজ মাইক্রোচীপের বদৌলতে কম্প্যুটার হয়ে গেছে মানব সম্পদ ব্যবহারে অনগ্রসর দেশসমূহের জন্য বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির আরেকটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। কম্প্যুটার তৈরী, প্রোগ্রাম তৈরী, ড্যাটা এন্ট্রি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিপুল জনশক্তিকে সহজে কাজে লাগানো যায়। ভবিষ্যতে সারা দুনিয়ার তথ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও ক্রমে আমাদের কাছে চলে আসবে। যদি আমরা তা নিতে প্রস্তুত থাকি।

মানবসম্পদ ব্যবহারে অনগ্রসর দেশগুলির জন্য আরেকটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে আছে প্রযুক্তির অন্য একটি ক্ষেত্রে- বায়ো টেকনোলজী বা জীব-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। এটিও বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি হওয়া সত্ত্বেও অতি-অনগ্রসর দেশেও এর প্রয়োগ করা যায়। এতে বিনিয়োগ লাগে অতি অল্প। জীব-প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে অসংখ্য টেকনিশিয়ানের হাতের ছোঁয়ায় রোগমুক্ত পছন্দসই চারা তৈরী করে শুধু যে ফলন বৃদ্ধি করা যাবে তাই নয়– প্রতিটি গাছে সর্বোচ্চমানের ফসল নিশ্চিত করাও সম্ভব হবে। পরিবেশের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে মানব সম্পদ ব্যবহারের চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয় এই জীব- প্রযুক্তির মাধ্যমে। ভবিষ্যতে উন্নত বিশ্বের জন্য উন্নতমানের চারা তৈরী করে দেয়ার দায়িত্বও আমাদের উপর বর্তাবে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ থেকে ত্রিশ লক্ষ নিম চারা কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানতে পেরেছি। প্রতিটি চারার জন্য তারা তিন মার্কিন ডলার করে দেবে বলে জানিয়েছে। তারা চীন দেশ থেকেও লক্ষ লক্ষ নিম চারা সংগ্রহ করছে।

ফুল ও অর্কিড রফতানী করা এখন অনেক দেশের রমরমা ব্যবসা। নয়নাভিরাম গাছের চারাও শুধু সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু হিসেবে রফতানী দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ কেন এই প্রযুক্তি প্রয়োগে পিছিয়ে থাকবে তার কোন কারণ দেখি না।

আমাদের প্রযুক্তিবিদদের ভূমিকা কি ?

ঘটনা পরম্পরায় বিশ্বের প্রযুক্তি এগুচ্ছে মানবসম্পদ ব্যবহার সহজ করে দেয়ার অনুকূলে। নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের দিক থেকে সহজ হচ্ছে। বিনিয়োগের স্বল্পতার দিক থেকে সহজ হচ্ছে। অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে সহজ হচ্ছে। এই শুভ পটভূমিতে আমাদের প্রযুক্তিবিদদের কাজ সহজ হয়ে যাবারই কথা।

আপনারা যারা আজ এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রযুক্তিবিদ হিসেবে সনদপত্র গ্রহণ করলেন তাঁরা দেশের মানবসম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন। আপনাদের অধীত বিদ্যা, আশা করি, এব্যাপারে আপনাদেরকে সাহায্য করছে।

ছাত্র সমাজের সব চাইতে মেধাবী অংশটি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে আবার যারা প্রথম সারির তাদের থেকেঽ অনেকে আসে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের তপস্যা শেষ করে আপনারা শেষ পর্যন্ত কি হলেন ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা বাবুই পাখীর মত কিংবা মৌমাছির মত প্রকৌশলী হননি। ছক ধরা কাজ নিখুঁত দক্ষতার সংগে সম্পাদন করার বিদ্যা অর্জন করেই নিশ্চয়ই আপনারা ক্ষান্ত হননি।

বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারে সঞ্চিত সকল জ্ঞানের সংগে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। তার সংগে আরো বড় কাজ হলো শিক্ষার্থীর সৃজনশীল গুণাবলীকে সমৃদ্ধ করে দেয়া। দেশের মানুষের সমস্যাবলী এবং প্রচলিত সমাধানসমূহের সংগে পরিচিত করে দেয়া। শিক্ষার্থীকে তার নিজের

সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে নতুনতর, উন্নততর সমাধান খুঁজে বের করতে উদ্বুদ্ধ করা।

আপনাদের আহরণ করা জ্ঞান এবং অনুশীলন করা সৃজনশীলতা নিয়ে আজ আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগণ ত্যাগ করবেন। প্রযুক্তির জটিল তত্ত্ব আপনাদের জানা আছে এবিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর যে কোন দেশের সমকক্ষ মানের বহুতল ভবন দক্ষতার সংগে ডিজাইন করার এবং নির্মাণের ক্ষমতা আপনারা রাখেন, এ আমাদের জানা। নিয়ম-না-মানা দুরন্ত নদীকে পোষ মানাবার কৌশল অবশ্যই আপনাদের জানা আছে। জটিল বিশালায়তন বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব আপনাদের নখদর্পণে।

বিদ্যুতের সিস্টেম-লস বন্ধ করার প্রযুক্তি চাই

এর সংগে আশা করি বিদ্যুতের সিস্টেম লস নামক ডাকাতি কিভাবে বন্ধ করা যায় তার প্রযুক্তিও আপনারা আয়ত্ত করেছেন। বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলায় প্রতি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ২৫ বার মুখ দেখানো আর লুকানোর মারাত্মক বদঅভ্যাস থেকে দেশের অর্থনীতিকে আমরা কিভাবে রেহাই দিতে পারি তার প্রযুক্তি নিশ্চয়ই আপনারা সংগে করে নিয়ে বেরুচ্ছেন। সপ্তায় সাতদিন বিদ্যুৎ দেবার ক্ষমতা যদি না থাকে তবে সপ্তায় ছ'দিন বা পাঁচ দিন, বা চার দিন বিদ্যুৎ দিন। কিন্তু যে ক'টা দিন বিদ্যুৎ দেবেন সে ক'টা দিন যেন এক মুহুর্তের জন্যও মনে সন্দেহ না জাগে বিদ্যুতের প্রাপ্তি সম্বন্ধে। দেশের শিল্প কারখানা ব্যবসায়-বাণিজ্য, গবেষণাগার সব কিছু লাটে ওঠার যোগাড় হয়েছে খামখেয়ালী বিদ্যুতের পাল্লায় পড়ে।

দেশের সকল প্রযুক্তিগত প্রশ্নে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ক্রম অগ্রসরমান অবস্থান নিশ্চয়ই আছে। আমরা আশা করি যে তার সংগে আপনাদের ঘনিষ্ট পরিচয় হয়েছে। তার মাধমে জেনে নিয়েছেন একটি গ্রামে কিভাবে সস্তায় এবং গ্রহণযোগ্য করে স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপন করা যাবে। আমাদের গ্রামের মা-বোনদেরকে চরম প্রয়োজনে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার “কবর-আজাব” থেকে মুক্তি দিয়ে দিনে রাতে যে কোন সময় আব্রু রক্ষা করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার ব্যবস্থা আপনারা নিশ্চয়ই করতে পারবেন। আমরা আশা করি যে, সাধারণ সংক্রামক রোগ থেকে, মানুষকে রক্ষা করার প্রযুক্তিগত দিকটাও আপনাদের জানা হয়েছে। আগের চাইতে ভাল, সস্তা, টেকসই ব্যবস্থা কি হতে পারে সে ব্যাপারে আপনারা নানা বিকল্প রচনা করে দেখেছেন। শুধু বাস্তবায়নের সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

আমরা ধরে নিচ্ছি যে, গ্রামে কী কী পদ্ধতিতে প্রতি ঘরে নলবাহিত পানি সরবরাহ করা সম্ভব সেগুলি নিয়ে আপনারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রেখেছেন। অন্যান্য দেশ এব্যাপারে কী করছে, আমরা তাদের চাইতে আরো দক্ষ পদ্ধতিতে কিভাবে করতে পারি তার বুদ্ধিটাও আপনারা বের করে রেখেছেন।

আমরা ধরে নিচ্ছি যে, বাংলাদেশের একজন প্রযুক্তিবিদ হিসেবে আপনি একজন গরীব মানুষের স্বল্প সম্বল দিয়ে টেকসই একটি ঘর কিভাবে বানানো যায় সে বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন। সস্তায় টেকসই গৃহ নির্মাণের জন্য কী কী সরঞ্জাম

সরবরাহ করা যেতে পারে সে বিষয়েও চিন্তা করেছেন। অন্যান্য দেশে পোড়া মাটির ঝামা-মার্বেল দিয়ে কিভাবে অতি উঁচু দরের হাল্কা বিল্ডিং ব্লক তৈরী হচ্ছে, মাটির তৈরী ঘরকে টেকসই করার ব্যবস্থা হচ্ছে, চাটাই এর উপর প্রলেপ দিয়ে ঢেউটিনের সমকক্ষ রুফিং ম্যাটেরিয়াল তৈরী করছে, ইত্যাদি বহুতর প্রযুক্তির সংগে নিজেকে পরিচিত করেছেন।

বারো হাজার টাকায় তৈরী ঘরের জন্য আন্তর্জাতিক স্থাপত্য পুরস্কার

গ্রামীণ ব্যাংক বর্তমানে বাংলাদেশের ত্রিশ হাজার গ্রামে ১৪ লক্ষ ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষকে নানা কাজে ঋণ দিচ্ছে। তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯২ জন ভূমিহীন মহিলা।

গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীন মানুষকে গৃহ নির্মাণের জন্যও ঋণ দেয়। বারো হাজার টাকার গৃহ নির্মাণ ঋণ নিয়ে একজন মানুষ চারটি আর, সি, সি, পিলার দিয়ে একশ' বর্গহাতের একটি টিনের চালের ঘর তৈরী করেন। সংগে থাকে একটি স্যানিটারী ল্যাট্রিন। এ পর্যন্ত দেড় লক্ষেরও বেশী ঘর তৈরী হয়েছে গৃহ নির্মাণ ঋণের টাকা দিয়ে। ঋণ পরিশোধের হার শতকরা ৯৮ ভাগ।

আপনারা হয়ত শুনেছেন এই কর্মসূচী এবং ঘরটির স্থাপত্যিক গুণাবলীর জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৯ সালে "আগা খান আন্তর্জাতিক স্থাপত্য পুরস্কার" লাভ করেছে। এটা বিশ্বের স্থাপত্য ক্ষেত্রে অতি সমাদৃত পুরস্কার। দুনিয়ার সেরা স্থপতিরা বাছাই করেন কারা এই পুরস্কার পাবার উপযুক্ত। বাংলাদেশী একজন স্থপতি হিসেবে আপনিও নিশ্চয় গর্ববোধ করেছেন আমাদের এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে। বিদেশ থেকে যেমন আগ্রহী স্থপতিরা, গৃহ নির্মাণ বিশেষজ্ঞরা দেখতে আসছেন এই কর্মসূচীর অধীনে নির্মিত ঘর, আমার বিশ্বাস, আপনিও তেমনি আপনার সহপাঠীদের সংগে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত বিষয় হিসেবে দেখতে গিয়েছেন এই কর্মসূচী। ফিরে এসে এই কর্মসূচীর প্রযুক্তিগত নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। চিন্তা করেছেন। উত্তর খুঁজেছেন কিভাবে একই খরচে আরো উন্নতমানের ঘর বানানো সম্ভব হবে, আরেকটু বেশী খরচ করতে পারলে আরো কত বেশী সুবিধা নিশ্চিত করা যেতো, কিভাবে পিলারটির ডিজাইন পাল্টালে খরচ অনেক কমে যেতো, পিলারের জন্য নতুন একটি প্রযুক্তি প্রয়োগ করলে সব কিছু কত সহজ করা যেতো, টিনের পরিবর্তে দেশীয় উপাদানে কিভাবে ছাদ তৈরী করা যেতো, বাঁশের দেয়ালের জায়গায় কিভাবে সহজে বিল্ডিং ব্লক ব্যবহার করা যেতো, কিভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি করা যেতো, ইত্যাদি। আপনার মাথা থেকে বের হওয়া একটা ছোট বুদ্ধি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের জীবনে অনেক প্রশান্তি এনে দিতে পারে।

গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ভূমিহীন ঋণ গ্রহীতারা প্রায় সাড়ে পাঁচশত রকম বিভিন্ন কাজে টাকা খাটায়। কেউ গাভী পালে, কেউ ধান ভানে, মুড়ি ভাজে, তাঁতে কাপড় বোনে, বাঁশবেতের কাজ করে, ফসল উৎপাদন করে। ব্যাপকতম ভিত্তিতে সর্বোত্তমভাবে মানব সম্পদ ব্যবহারে আগ্রহী প্রযুক্তিবিদ হিসেবে আপনারা হয়তো গ্রামীণ ব্যাংকের পরীক্ষিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার

সুযোগ নিয়ে প্রকল্প নিয়েছিলেন কিভাবে ধান ভানা প্রযুক্তিতে পরিবর্তন এনে মহিলাদের উপার্জন ক্ষমতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়া যায়, দুধ ও ফসল সংরক্ষণের উন্নততর প্রযুক্তি সরবরাহ করে তাঁদের উৎপাদনে ভ্যালু এডেড বাড়িয়ে উপার্জন বাড়ানো যায়, বাজারে প্রাচুর্যের দিনে পণ্য সংরক্ষণ করে অভাবের দিনে বিক্রি করে ভাল মুনাফা করা যায়, নানা ধরনের নতুনতর প্রযুক্তি তাদের হাতে তুলে দেয়া যায়।

দেশের শতকরা ৭৫ জন মানুষ নিরক্ষর। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরক্ষরতার হার আরো ভয়াবহ। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে ঘোষণা দেখি ঃ " ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা।" এটা দেখে মনটা খারাপ হয়ে যায়। যাঁরা এই ঘোষণা দেন তাঁরা বোধ হয় মনে করেন ২০০০ সালে পৌঁছতে আমাদের আরো ৫০০০ বছর সময় লাগবে। ঘোষণাটিকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সারা দেশে যে একটা তুলকালাম কান্ড শুরু করা দরকার তার কোন চিহ্ন কোথাও নজরে পড়বে না।

বিশ্বের সম্ভাবনাময় নতুন প্রযুক্তিগুলি যতই আমাদের দুয়ারে এসে অপেক্ষায় থাকুক না কেন আমরা তা হাত বাড়িয়ে উঠিয়ে নিতে পারবো না যদি না আমাদের জনগোষ্ঠীকে অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা জ্ঞান ও পরিবেশ জ্ঞান দিতে পারি। আমার বিশ্বাস এই অনুধাবনের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি প্রযুক্তি খুঁজেছেন- কিভাবে, কত কম সময়ে, কত কম খরচে বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষকে এই জ্ঞান দেয়া যায়। অবশিষ্ট অর্ধেক মানুষকে এই জ্ঞান দিতে আর কত বছর সময় লাগবে। কতরকম প্রযুক্তিকে কিভাবে সমন্বিত করে একাজ করা যায়।

বন্ধুরা মিলে কী কী করবেন ?

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবার পর আপনি কী কী করবেন সে নিয়েও নিশ্চয়ই বহু রকম পরিকল্পনা চলছে আপনার মাথায়। হয়তো আপনারা কিছু বন্ধু মিলে ইতিমধ্যে ঠিক করেছেন কার্তিক আর চৈত্রের মংগাতে পড়ে যাতে কাউকে অনাহারে থাকতে না হয় সেজন্য একটি এলাকায় কী প্রযুক্তি দরকার সে বিষয়ে আপনারা একটা অ্যাকশন রিসার্চে হাত দেবেন। নিজেদের আয়ের পয়সা এবং নিজেদের সময় দিয়ে আপনারা একাজটি করবেন।

কেউ বা হয়তো ঠিক করেছেন ডাক্তার বন্ধুরা মিলে যেরকম মাঝে মাঝে "চক্ষু শিবির" করেন আপনারাও সেরকম বোরো মৌসুমে "যন্ত্র শিবির" পরিচালনা করবেন। যাতে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বোরো মৌসুমে উৎপাদন ব্যাহত না হয়। অন্যরা 'বিদ্যুৎ শিবির' পরিচালনা করবেন যাতে বিদ্যুতের অভাবে বিদ্যুৎচালিত সেচ যন্ত্র বন্ধ না-থাকে, কিংবা কলকারখানা বন্ধ না-থাকে।

ডাক্তার বন্ধুরা যেরকম ফ্রি ক্লিনিক করেন, বিনা পয়সায় গরীবের চিকিৎসা করেন-আপনারা ঠিক করেছেন আপনাবা বিনে পয়সায় গরীব মানুষের ঘরের ডিজাইন বানিয়ে দেবেন, সঠিক উপকরণ চিহ্নিত করে দেবেন, নির্মাণের ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন। বস্তি এলাকায় এবং গ্রামে স্যানিটেশান, বিদ্যুৎ, খাবার পানি, স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি মিলিয়ে সমন্বিত বসতি পরিকল্পনা তৈরী করে দেবেন।

কেউ হয়তো ভাবছেন আমরা জায়গায় জায়গায় "প্রযুক্তি পরামর্শ কেন্দ্র" খুলবো। প্রযুক্তিকে মানুষের জন্য সহজলভ্য করবো। খাল-কাটাকে অবহেলা না- করে খাল-কাটা যাতে সকলের জন্য মংগল আনে তার ব্যবস্থাপত্র দেবো। খাল-কাটা আর রাস্তা বাঁধার মধ্যে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সেটার অবসান ঘটিয়ে একে যাতে অপরের পরিপূরক হয় সেভাবে নীলনক্সা তৈরী করে দেবো। কেউ হয়ত ভাবছেন, দুর্যোগের দিনে আমরা দ্রুতগতিতে "প্রযুক্তি স্কোয়াড" পাঠাবো। ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, চলাচল ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, তথ্য আদানপ্রদান ব্যবস্থা যাতে দ্রুত পুনর্বাসিত হয় তার ব্যবস্থা করবো। সংগে সংগে আরও পরিকল্পনা তৈরী করবো যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্যোগে এগুলি এত সহজে বিধ্বস্ত হয়ে না-যায়।

কেড়ে—খাওয়া সংস্কৃতির অবসান করতে হবে

আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই সমাধান করতে হবে। আমাদের রোজগারে আমাদের চলবে। যার যার রোজগারে তাকে চলতে হবে। একজনের রোজগার আরেকজনে কেড়ে খাওয়ার যে সংস্কৃতি আমরা গড়ে তুলেছি তার অবসান করতে হবে। দেশের মানুষের ঘাড়ে চেপে, তাদেরকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে তাদের রোজগার কেড়ে খাওয়ার সকল আয়োজন ঘৃণাভরে ভেংগে দিতে হবে।

যে প্রযুক্তি কেড়ে খাওয়ার সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, সে প্রযুক্তি থেকে রেহাই পাবার প্রযুক্তিও আমাদের বের করতে হবে।

প্রযুক্তিবিদ হিসেবে আপনার সনদ পাবার অর্থ সরকারী চাকুরী বাগাবার পাসপোর্ট পাওয়া নয়। আর সরকারী চাকুরী পাওয়া মানে আপনার টেবিলের ড্রয়ারে রোজ গাদা গাদা টাকা এসে জমা হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা নয়। সাধারণভাবে সমাজে এখন প্রযুক্তিবিদদের সনদকে "উপরি পাওয়ার" লাইসেন্স হিসেবেই গণ্য করা হয়। যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা কিছু প্রযুক্তিবিদ অপব্যবহার করার কারণে সকল প্রযুক্তিবিদদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে, ভবিষ্যতে যেন কারো কাছে এসব সুযোগ সুবিধা না-থাকে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং লাগসই প্রযুক্তি বের করার দায়িত্বও প্রযুক্তিবিদদের। আপনাদের যে বন্ধু "উপরি পাওয়ার" সরল রাস্তার সন্ধানে আছেন তাঁকে নিবৃত্ত করার দৃষ্টান্ত আপনাদেরই দেখাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আলোর জগতে না-ঢুকে কৃত্রিম জগতে ঢুকে যাচ্ছি

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া এখনো বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরে, তালে, লয়ে বাঁধা। বিদেশী বইয়ের বক্তব্যকে বেদবাক্য জ্ঞান করে নিজেদের স্বাভাবিক বুদ্ধি, বিচারশক্তিকে থেৎলিয়ে দিচ্ছি। জ্ঞানের একেকটি ক্ষেত্রে একেকজন পন্ডিতকে "অথরিটি" জ্ঞান করছি এবং তাঁর কাছে নিজের অস্তিত্বকে সমর্পণ করছি। তাঁর দৃষ্টিভংগী ছাড়া নিজের কোন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগী দাঁড় করাবার সাহস পাচ্ছি না। ফলে যেখানে জ্ঞান হবার কথা ছিল নিজের চোখে নির্ভুলভাবে দেখার জন্য পরিষ্কার ঝরঝরে আলো, সেখানে "জ্ঞান" হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের

চোখ হারানোর এক সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। নিজের চোখের জায়গায় জেনেশুনে বসিয়ে দিচ্ছি ধার করা চোখ। নিজের বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করে অন্যের বিচারবুদ্ধির কাঠামোতে নিজের আশ্রয় করে নিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীরা আলো. সন্ধান না পেয়ে পাচ্ছে কেতাবী চিন্তাশক্তি।

এই প্রবণতা আরো জোরদার হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা আমাদের সকল কাজে এত বেশী বিদেশ নির্ভর হয়ে গেছি যে কোন বিষয়ে আর নিজেদের উপর ভরসা করতে শিখছি না। বিদেশী পরামর্শকদের পরামর্শ ছাড়া আমরা হাঁচি দিতেও সাহস পাচ্ছি না। তাঁরা যা বলেন সেটাই শেষ কথা। বিদেশী অর্থদাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা তাঁদের মতো চিন্তা করতে শিখছি, তাঁদের মতো বলতে শিখছি। তাঁদের মতো করে লিখতে শিখছি।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, বাজারের সঙ্গে তাল রেখে, যে চিন্তার বাজার-দর ভালো, যে লেখার বাজার -দর চড়া, তারই চর্চা করছে।

একটা উদাহরণ দিই। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা রচনা করার জন্য সাড়ে তিনশ' কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে শুধু পরামর্শকদের জন্য। কার না লোভ হয় এই সাড়ে তিনশ' কোটি টাকার কাগজ বানানোর শিল্পে শরীক হতে। অতএব অর্থদাতাদের মতো করে বলবো নাতো কার মতো বলবো ?

প্রযুক্তিবিদদের ক্লায়েন্ট কারা ?

প্রযুক্তিবিদদের ক্লায়েন্ট কারা ? কাকে সেবা দেবার জন্য তাঁরা জ্ঞানার্জন করবেন ? বিশ্ব ব্যাংককে পরামর্শ দেবার জন্য ? অন্য কোনো দাতা সংস্থাকে বুদ্ধি দেবার জন্য ? কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য ? গ্রাম সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য ? বিত্তশালীদের পরামর্শ দেবার জন্য ? বিত্তহীনদের সেবা দেবার জন্য ?

পেশাজীবী হতে হলে সেবা গ্রহণকারীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আগেভাগে জেনে নিতে হয়। সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি মনে করি যে বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য দাতাসংস্থাই সরাসরিভাবে এবং পরোক্ষভাবে মূলতঃ প্রযুক্তিবিদদের সেবাগ্রহণকারী, তাহলে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। কাজেই প্রযুক্তিবিদরা সেভাবেই নিজেদের তৈরী করবেন এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কি আছে ?

সমাজ-সচেতনতাকে কোথায় রাখবো ?

পেশাজীবী হলেই সমাজ-সচেতনতাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে এমন কোনো শর্ত মোটেও নেই। একজন ভালো প্রকৌশলী একই সঙ্গে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে একজন উত্তম সংগঠক বা কর্মী হতে পারেন। এ দু'য়ের মধ্যে কোনো বিরোধ তো নেই-ই বরং একে অপরকে সার্থক করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় এই দু'টি অংশকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীকে তৈরী করতে হবে। তা

না হলে একজন শিক্ষার্থী প্রকৌশলী হতে গিয়ে সামজচিন্তা বিবর্জিত একটি ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিকামী যন্ত্রে পরিণত হবে।

সাধারণ মানুষের হাতে গড়া প্রযুক্তি

দাতাগোষ্ঠীর সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে দেশের মানুষের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনাময় অনেকগুলি দিক আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। প্রযুক্তির ক্ষেত্র থেকে আমরা কয়েকটা উদাহরণ নিতে পারি।

বাংলাদেশের হাজার হাজার গরীব চাষী এখন আড়াইশ টাকা দামের ট্রেডল পাম্প দিয়ে জমি সেচ দিচ্ছে। এটা সাধারণ মানুষের হাতে তৈরী হয়েছে। সাধারণ মানুষ এটাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। ট্রেডল পাম্পের দ্রুত প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রকৌশলীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আশা করি।

আমাদের দেশে দাঁড়টানা নৌকা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। অথচ আমরা এটা খেয়ালই করছি না। এই অভাবনীয় কান্ড ঘটে গেলো গত কয়েক বছরের মধ্যে। দাতা সংস্থার কোন প্রকল্পের অধীনে যদি এটা ঘটতো তবে দুনিয়া জুড়ে এটা নিয়ে টেলিভিশন প্রোগ্রাম হতো। সেমিনার, ওয়ার্কশপ,সিম্পোজিয়ামের ঝড় উঠতো। সাধারণ মানুষের নিজের তাগিদে, নিজের বুদ্ধিতে এটা হয়ে গেছে বলে এটা নিয়ে কেউ সেমিনার করছে না, মূল্যবান মূল্যায়ন গবেষণা চালাচ্ছে না, টেলিভিশনে বিশেষ প্রোগ্রাম দেখানো হচ্ছে না। কোন কোন প্রযুক্তিবিদ বরং নৌকার এই যান্ত্রিকীকরণের বিরোধিত করেছেন- এতে ব্যাক গিয়ার সংযোজন করা হচ্ছে না বলে।

এরকম একটা বিরাট কান্ড হয়ে যাবার পরেও আমাদের প্রযুক্তিবিদদের দৃষ্টি এর দিকে পড়ছেনা। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিকে আরো পরিশীলিত রূপ দেয়ার একটা বড় সুযোগ এখানে প্রযুক্তিবিদদের জন্য রয়ে গেছে। আর কিছু না হোক অন্ততঃ যন্ত্রস্থাপনের ফলে নৌকার ডিজাইন পরিবর্তন করে তার দক্ষতা বাড়ানো যাবে কিনা, জ্বালানী খরচ কমানো যাবে কিনা- তা দেখা যেতে পারে। গিয়ারের বিষয়টা ত রইলোই। আমরা কি এখনো এসব বিষয় বিবর্তনের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো, কখন সাধারণ মানুষ ঠেকে ঠেকে ক্রমান্বয়ে সব কিছু শিখে নেবে ?

রিকশার ডিজাইন নিয়ে নানা সময় প্রশ্ন উঠেছে। নানা স্থানে নানা রকম ডিজাইনের রিকশা চালুও আছে। কানাডা থেকে একটা ডিজাইন এসেছে রিকশার। আমাদের প্রকৌশলীরাও এব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে আমরা জানি। কিন্তু সে উদ্যোগে আবার ভাটা পড়ে গেছে। যেমন রিকশা তেমনটি রয়েই গেছে। এটাই কি রিকশার সর্বোত্তম ডিজাইন ?

সরকারের অনুরোধে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় মিশুকের ডিজাইনের দায়িত্ব নিয়েছিল। রাস্তায় যখন মিশুক চলতে দেখি তখন মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। এটা আমাদেরই প্রযুক্তিবিদদের মেধার ফসল। আমাদের সাধারণ মানুষের শত

সমস্যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এরকম হাজারো মিশুকের সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। শুধু প্রকৌশলীদের হাতের ছোঁয়া পেলে তারা জীবন পাবে।

বিশ্বে এখন বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যারা চেষ্টা করছে অতি উচ্চ মার্গের প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসলে এতে অভিজ্ঞ প্রকৌশলীরা তাঁদের সৃজনশীলতা ব্যবহারের সুযোগ পেতেন এবং তাঁদের ছাত্ররা অনুপ্রাণিত হতো। সাধারণ মানুষেরও শক্তি বাড়তো।

ভারতীয় ডিম

প্রযুক্তি বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় ডিমের প্রসংগ না এনে পারছি না। দেশের সব মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে ভারতের ডিম। দৈনন্দিন বাজারসওদাকে কেন্দ্র করে এই প্রথম বাংলাদেশের মানুষকে মৌলিক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হতে দেখলাম। এই বিরাট সাফল্যের জন্য আমি ভারতীয় ডিম আমদানীকারকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা বড় ভোঁতা হয়ে পড়েছিলাম। চারদিক থেকে ধাক্কা খাচ্ছি, থাপ্পড় খাচ্ছি কিন্তু আমাদের বৈষ্ণবী মেজাজে মোটেই চিড় ধরছে না। ভারতীয় ডিম আসার পর এই প্রথম ভ্রু-কুঁচকানী দেখলাম।

বহুদিন ধরে ভারত থেকে বহু কিছুই আসছে। আমরা সবাই জানি। সবাই দেখি। কিছু খোলা পথে আসে। কিছু চোরাই পথে আসে। ডিম আসছে টমেটো আসছে, পালং শাক আসছে, ডাল আসছে, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, আম, কমলা, আপেল, আনারস, চিনি হরদমই আসছে। এখন আবার শুনছি দিল্লী থেকে রুই মাছ আসছে!

তাঁতীদের দুরবস্থার প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে আমার সহকর্মী খালেদ শামস আবিষ্কার করলেন ভারত থেকে বছরে দুইশ' কোটি টাকার তাঁতের কাপড় আসছে। "মাদ্রাজ চেক" নামক তাঁতের কাপড় পোষাক শিল্পে ব্যবহার করার জন্য এদেশে আমদানী করা হয়।

বিদেশ থেকে খোলাপথে জিনিস আসা অপরাধের কিছু নয়। ভারত থেকে যে ধরনের পণ্য আমদানী করা হচ্ছে তা নিয়েই আমাদের মন খারাপ হয়েছে। ডিম আসবে কেন ? নিজেদের ডিম নিজেরা উৎপাদন করেও খেতে জানবে না এ জাতি ?

এটাই হলো আসল প্রশ্ন। জবাব সোজা। যা কিছু আমদানী করছি ভারত থেকে, সব কিছু অনায়াসে উৎপাদন করা যায় এদেশে। কিন্তু আমরা করছি না। এটা আমাদের ঔদাসীন্য ছাড়া কিছু নয়। আমরা সবাই অন্য কাজে ব্যস্ত। কেড়ে খাওয়ার কাজে। ভাগ বাটোয়ারার কাজে। একভাই রাজনীতিবিদ সেজে একাজ করছি, আরেক ভাই সরকারী কর্মকর্তা হয়ে একাজ করছি, এক ভাই পরামর্শক সেজে একাজ করছি, আরেক ভাই এক বাহিনী বা অন্য বাহিনীতে গিয়ে একাজ করছি, কেউ ব্যবসায়ী নাম নিয়ে একাজ করছি, কেই সাংবাদিক নাম ধারণ করছি, কেউ শ্রমিক সেজে করছি, কেউ ছাত্র সেজে করছি। মোটামুটি সকলের কমবেশী একই ধান্দা।

আমাদের যে-মেধা কাড়াকাড়ির কাজে লাগাচ্ছি সে মেধা যদি উৎপাদনের কাজে লাগাতাম তবে বাংলাদেশের ডিম, ডাল, মাছ, টমেটো, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, আম, কলা সারা ভারতকে খাওয়াতে পারতাম। লক্ষ্য করে দেখুন, ভারতের সংগে বাণিজ্যে আমাদের একটা মস্ত বড় সুবিধা আছে। ভারতের কাছে বাংলাদেশ একটা ছোট্ট বাজার। বাংলাদেশের কাছে ভারত সীমাহীন এক বাজার। যেকোন দু'চারটি পণ্য নিয়ে ভারতের বাজার দখল করতে পারলেই এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে। এবং এটা না পারার কোন কারণ নেই।

সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়ীর মধ্যে ঐক্যজোট গড়তে হবে

আমাদেরকে ঐক্যজোট বানাতে হবে। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়ী মিলে একটা ঐক্যজোট গড়ে তুলতে হবে। যার যার বর্তমান কর্ম পদ্ধতি এবং পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্কের রীতি রেওয়াজ পাল্টে ফেলতে হবে। সরকার সম্রাটসুলভ মেজাজ নিয়ে মুখ ব্যাজার করে উচ্চাসনে বসে থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পৌরাণিক যুগের গুরু সেজে বিমূর্ত চিন্তায় বিভোর থাকবেন না, ব্যবসায়ীরা শুধু কুইক টু-পাইস করার জন্যে চকচকে চোখ নিয়ে মানুষকেনার ফন্দীতে থাকবেন না। সবাই একে অপরকে সমান সাথী মনে করে হাতা গুটিয়ে একসংগে কাজে নামবে। যেখানে যত বাধা সবাই একসংগে হাত লাগিয়ে সে-বাধা সরাবে। এখনকার আইন পাল্টে ফেলতে হবে। শুধু কাজ করার সুযোগ দেবার জন্য আইন হবে। মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে খাবি খাওয়ানোর আইন রহিত হয়ে যাবে।

এটা যদি করতে না-পারি তবে, আপনি পছন্দ করুন আর না-ই করুন, ভারত থেকে আরো পণ্য আসবে। ভূটান থেকে আসবে। সামনে নেপাল থেকে আসবে। বার্মা থেকে আসবে। স্রোতের মত আসবে। এটাই অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম। এটাকে বাঁধ বেঁধে ঠেকানোর কোন প্রযুক্তি বাঁধ বিশেযজ্ঞদের নেই।

অন্য দেশের পণ্য ঠেকাতে চাই নিজের দেশের সস্তা, গুণগত মানে অধিকতর ভাল পণ্য। ডিম এদিকে আসার পথ বন্ধ হবে যদি আপনি তার চাইতে সস্তায় ডিম খাওয়াতে পারেন। সেটা যদি পারেন তবে ভারতীয় ডিমের চেহারা আর আপনাকে দেখতে হবে না। বরং আরেকটু চেষ্টা করলে দিল্লীতে বসে ঢাকার ডিম কিনতে পারবেন।

প্রযুক্তিতে আমাদের এগিয়ে থাকতে হবে, পরিশ্রমে আমাদের এগিয়ে থাকতে হবে, ব্যবস্থাপনায় আমাদের এগিয়ে থাকতে হবে। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে শ্লোগান দিয়ে ডিম ঠেকাতে পারবেন না। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিস আক্রমণ করে, কিংবা লং মার্চ করে ডিমের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারবেন না।

"গ্রামীণ চেক" দিয়ে "মাদ্রাজ চেক"- কে বেদখল করার উদ্যোগ

গ্রামীণ ব্যাংক দায়িত্ব নিয়েছে এদেশের তাঁতীদের দিয়ে "গ্রামীণ চেক" তৈরী করে "মাদ্রাজ চেক"-কে বেদখল করার। আমরা পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে

জানিয়ে দিয়েছি, বিদেশী পোশাক আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে জানিয়ে দিয়েছি যে গ্রামীণ ব্যাংক তাঁতীদের সংগঠিত করে মাদ্রাজ চেকের সমকক্ষ এবং তার চাইতে উন্নতমানের তাঁতের কাপড় "গ্রামীণ চেক" একই মূল্যে সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছে। যদি গুণে মানে সমকক্ষ না-হয় আমরা সমস্ত মূল্য ফেরৎ দিতে প্রস্তত আছি।

গ্রামীণ চেকের নমুনা প্রস্তুত করে গ্রামীণ ব্যাংক যেখানেই সরবরাহ করেছে একবাক্যে সবাই বলেছে এটা মাদ্রাজ চেকের চাইতে বরং ভাল। তাহলে আমরা ২০০ কোটি টাকার মাদ্রাজ চেক আমদানী করছি কেন? সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে না এ প্রশ্নের। একটিই জবাব ঃ আমরা সবাই অন্য কাজে ব্যস্ত।

বাংলাদেশের গ্রামীণ চেক শুধু বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত পোষাক শিল্পেই ব্যবহার করা যাবে তা নয়। এটা শ্রীলংকা, মধ্যপ্রাচ্য, এমন কি ভারতে অবস্থিত পোষাক কারখানাগুলিতেও রফতানী করা সম্ভব। বাংলাদেশের তাঁতীরা দৈনিক প্রায় পৌনে এক কোটি টাকার নতুন কাজ পাবে যদি আমরা মাদ্রাজ চেক আনা বন্ধ করতে পারি।

গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশান

গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি ঃ গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশান। কৃষিতে নতুন ব্যবস্থাপনা, নতুন পদ্ধতি, নতুন ফসল, নতুন প্রযুক্তি আনার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে। পেটের দায় মহাজনের কাছে দেয়া বন্ধকী জমি এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছাড় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। চাষীদের সংগে যৌথ চাষের চুক্তি করা হচ্ছে। চাষীদেরকে উৎপাদিত ফসল থেকে শোধ করে দেয়ার অংগীকারের বিনিময়ে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে।

এ বছর ৫০,০০০ একর জমিতে গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশান বিভিন্ন ফসল চাষ করছে। তার মধ্যে যে দুটি নতুন ফসল বড় আকারে চাষ হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে ভুট্টা এবং সয়াবীন। ১৬০০ একর জমিতে ভুট্টা চাষ হচ্ছে। এর মধ্যে ৮৫০ একরে হাইব্রীড ভুট্টা লাগানো হয়েছে। এক হাজার একর জমিতে সয়াবীন চাষ হচ্ছে। মানুষ সয়াবীন এবং ভুট্টা চাষে বিপুল আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। শুধু বীজের অভাবে আমরা এবছর একরেজ আর বাড়াতে পারিনি। চাষীরা নতুন ফসলে আগ্রহী নয়, সনাতন পন্থায় সনাতন চাষ করতে চায়, এটা যে কত বড় বানোয়াট কথা সেটা ফাউন্ডেশানের সংগে কাজে নামলেই বুঝতে পারবেন।

গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশানের লক্ষ্য হচ্ছে জীব-প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উন্নতমানের ফসল উৎপাদন করা এবং কৃষি পণ্যকে একটি অতি আকর্ষণীয় রফতানী পণ্যে পরিণত করে কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থান পাল্টে দেয়া।

সামনে থেকে বাধা সরিয়ে দিন

মানুষের সামনে থেকে বাধা সরিয়ে দিন। আমরা যারা সমাজের মাথা আমরা নিজেরাই মানুষের চলার পথে বড় বড় প্রতিবন্ধক হয়ে বসে আছি। আমরা যা যা প্রতিষ্ঠান বানিয়েছি, নিয়ম নীতি বানিয়েছি তার সবকিছুই নিরেট পাথরের মত মানুষের রাস্তা জুড়ে বসে আছে। এগুলি সরালেই মানুষ এগুতে পারবে।

যারা দেয়াল সরাতে আগ্রহী তারা এগিয়ে আসুন। মানুষকে এগুতে দিন। বিকশিত হতে দিন। সরকার নির্ভরশীলতা, বিদেশ নির্ভরশীলতা থেকে মানুষকে রেহাই দিন।

মানুষকে বাধা দেওয়াটাই যেন "সরকার" নামক প্রতিষ্ঠানটির পবিত্রতম দায়িত্ব। তাই যেন সে মানুষের সামনে একের পর এক বাধা সৃষ্টি করে যায় নিবিষ্ট মনে। একজন নাগরিক যদি ধারণা করে বসে যে সরকারের কাজ হলো শিষ্টের দমন এবং দুষ্টের পালন তাহলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। আইন ভাংগা যেন সরকারের স্বাভাবিক অধিকার। সরকারের আশে পাশে যাঁরা থাকেন তাদের উপরও যেন এই অধিকার বর্তে যায়। সরকার মানে হচ্ছে মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য নির্মিত একটি সুবিশাল যন্ত্র। মানুষকে হেনস্তা করার সকল বুদ্ধি নিয়ে সরকার সর্বত্র অফিস সাজিয়ে বসে থাকেন। এ কাজে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ।

আমাদের জালে আমরাই আটকা পড়ে আছি

সমাজের অগ্রগতির প্রথম শর্ত হচ্ছে নিয়মবদ্ধতা। সমাজের কিছু মৌলিক বিষয় অলংঘনীয় নিয়মে বাঁধা থাকবে। কার কী পাওনা, কার কী দেনা সবাই স্পষ্টভাবে জানবে এবং তা পালন করবে। কারো জন্য কোথাও সারপ্রাইজের মাইন পোঁতা থাকবে না। নিয়ম ভেঙ্গে বাহাদুরী দেখাবার দুঃসাহস কারো হবে না।

সরকার হবে "নিয়মের" ধারক, বাহক এবং রক্ষক। সরকার নিশ্চিত করবে যে, যারা নিয়ম মানে তারা গ্রীন চ্যানেলে বিনা বাধায় বিনা প্রশ্নে এগিয়ে যাবে। যারা নিয়ম ভাঙ্গবে তারা পার পাবে না। সরকার হবে উদ্বুদ্ধকারী। দেশের নাগরিকদের সঠিক পথে এগিয়ে আসতে উৎসাহ যোগাবে। সাহস যোগাবে। সরকার হবে ইতিবাচক সরকার। নেতিবাচক নয়।

এখন হচ্ছে সম্পূর্ণ তার উল্টা। সৎ ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে পারছে না। সৎ শিল্পপতির কারখানার চাকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সৎ কর্মচারী পুনঃ পুনঃ শাস্তি পাচ্ছে। যে আইন মানতে চাচ্ছে তার হেনস্তার সীমা নেই।

অথচ আপনি যেখানেই যান সেখানে সাক্ষাৎ পাবেন প্রতিভাবান দেশপ্রেমিক মানুষের। রাজনীতিতে দেখুন, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দেখুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে দেখুন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখুন, সামরিক বাহিনীতে দেখুন, পুলিশ বাহিনীতে দেখুন, শ্রমিকদের মধ্যে দেখুন, ছাত্র সমাজের দিকে দেখুন- সর্বত্র ছড়িয়ে আছে সাহসী, মেধাবী, সৃজনশীল, দেশ প্রেমিক মানুষ।

বাংলাদেশে আমরা এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আছি। সব দিকে এত ভাল লোক। কিন্তু এমন এক সিস্টেম নিজেরা তৈরী করে রেখেছি যে কার্যক্ষেত্রে ভালো

লোকেরা ভালো করতে পারছে না। ভালো লোকদেরকে খারাপ কাজ করতে হচ্ছে। কিংবা তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছে। অথচ এই হাতগুলিকে সচল করা গেলে তা দিয়ে দেশে সোনা ফলানো যেতো।

এর থেকে উদ্ধার পেতে হলে, আমাদেরকে ভিন্ন সিস্টেম তৈরী করতে হবে। সকল সিস্টেমের গোড়া হল সরকার। তাই ভিন্ন ধারণার "সরকার" সৃষ্টি করার কথা ভাবতে হবে। সে নতুন ধারণার "সরকারের" বৈশিষ্ট্য হবে তারা মানুষের সংগে সমতলে অবস্থান করবে। তারা মানুষকে সামনে রাখবে, নিজেরা পেছনে থাকবে। তারা সৎ মানুষকে সৎ থাকার পরিবেশ নিশ্চিত করবে। সকল মানুষের (সকল মহিলা এবং সকল পুরুষের) কর্মদক্ষতাকে বিকশিত করার ব্যাপক সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। যে আইন যেভাবে পালিত হবার কথা সেভাবে পালিত হওয়া নিশ্চিত করবে।

তাদের কাছে বস্তা বস্তা আইন থাকবে না। থাকবে কতকগুলি সহজ সরল আইন-যেগুলি সরকার নিজে আগে মানবে, তারপর অন্যরা মানছে কিনা দেখবে।

এই নতুন ধরনের সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসন চালাবে না। প্রায় সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর ছেড়ে দেবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকল তথ্য, সকল খবর সকল মানুষকে চাওয়ামাত্র পাবার ব্যবস্থা করবে। যেমনঃ ভূমির মালিকানার খবর কম্প্যুটারে টিপ দিলেই তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে। তহশিলদারের দরবারে নজর নিয়াজ দিয়ে এই তথ্য বের করতে হবে না। তহশিলদারকে বশ করে, জরীপকারীকে বশ করে, গোপনে একজনের জমি আরেকজনের নামে লিখিয়ে নিতে পারবে না।

এই নতুন ধরনের সরকার ক্রমাগতভাবে জনগণের সংগে খোলামেলা সংলাপের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোন সময় ভূল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে সেটা বাতিল করতে, প্রত্যাহার করতে লজ্জাবোধ করবে না। নিজের ভূল-ভ্রান্তির জন্য অন্যকে দায়ী করার জন্য গলাবাজী করবে না। এই সরকার জনগণের কোন অংশকে অবহেলা করবে না, দূরে সরিয়ে রাখবে না।

পৃথিবীর দুরূহতম মানবিক সমস্যা যে দেশে, সে দেশে একটি অনড়, অসংবেদনশীল সরকার ব্যবস্থা বিনা দ্বিধায় বহাল থাকবে সেটা মেনে নেয়া ঠিক হবে না। বিদেশী পরামর্শকরা কি বলেন তার অপেক্ষা না করে আমরাই আমাদের মত করে নতুন ভংগীতে দাঁড় করাতে পারি সরকার ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে। পরীক্ষামূলকভাবে অগ্রসর হতেও দোষ নেই।

এদেশের তরুণদের মধ্যে অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা আছে

তরুণদের সামনে এসে দাঁড়ালে নিজের ভেতর প্রচন্ড শক্তি অনুভব করি। আজ এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে সেই একই প্রচন্ডতা অনুভব করছি। বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা আছে। তার বহু প্রমাণ তরুণরা ইতিমধ্যে দিয়েছে।

দেশের নীচের অর্ধেকাংশ মহিলা ও পুরুষকে যদি কেউ তাদের মানবেতর অবস্থান থেকে বের করে আনতে পারে তবে তরুণরাই পারবে। নীচের অর্ধেকাংশ

মানুষ যে পাঁকে আটকে রয়েছেন শুধু তাঁদের চারদিক্ থেকে সে পাঁকটা সরিয়ে দিতে হবে। সে সরানো যাবে নিরংকুশভাবে তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে, দেশের উন্নয়নে নিবেদিত সম্পদে তাঁদের সরাসরি অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে শক্তিশালী প্রযুক্তি তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে।

নীচের অর্ধেকাংশ মহিলা ও পুরুষ যদি পাঁক থেকে বেরিয়ে এসে এদেশের অর্থনীতিতে একটা হেঁচকা টান দেয়– এই অর্থনীতি রাতারাতি বাঘের চেহারা না পেলেও নেহাত কম শক্তিশালী অর্থনীতি হবে না।

মানুষের চলার পথের বাধা সরাবার কাজে আপনাদের মেধা কাজে লাগাবেন– আজ শুভ দিনে আপনাদের কাছে আমি এই অনুরোধ রাখলাম। নতুন শতাব্দীর হালখাতা নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তিবিদদের অবদানে ভরে উঠবে- এই আশা রাখলাম।

আপনাদের প্রত্যেকের জীবন সার্থক হোক। আপনাদের প্রত্যেকের জীবন মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক।

প্রিয় ছাত্রবন্ধুগণ, সুধীবৃন্দ মাননীয় উপাচার্য, মাননীয়া চ্যান্সেলর, ধৈর্য সহকারে আমার এই দীর্ঘ বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদজানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মে ৮, ১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সমাবর্তন বক্তৃতা।

একজন অরাজনৈতিক নাগরিকের রাজনীতি বিষয়ক কিছু কথা

(দোষ হলে মাফ করবেন)

আমি কোন দিন কোন রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা করিনি। আমাকে যখন গণতান্ত্রিক ফোরামের জাতীয় মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে আপনাদের সামনে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলো আমি বিশ্বাস করতে পারিনি এটা সত্যি সত্যি কেউ আমাকে বলতে পারে। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই অনুরোধ ঠেকাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সফল হতে পারিনি। বন্ধুত্বের দাবী আমার সমস্ত যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

অরাজনৈতিক মানুষের রাজনীতি বিষয়ক কথা বলা খুবই বিপজ্জনক। তা-ও আবার ঝানু রাজনীতিবিদদের সামনে। কপালে কত দুঃখ থাকলে এরকম একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রাজী হতে হয় তা আপনারাই অনুমান করুন।

রাজনীতি মানুষকে ভালবাসার পেশা

রাজনীতিকে আমি ভয় করি। দেশের রাজনীতির হাল-হকিকত দেখে কেউ একে ভালবাসে একথা আমার মনে হয় না। রাজনীতি যারা করে না তারা যেমন একে ভয়ের চোখে দেখে, আমার মনে হয় যারা রাজনীতি করে তারাও একে ভয়ের চোখে দেখে।

অথচ রাজনীতি হওয়ার কথা ছিল একটি মহান পেশা। মানুষকে সেবা করার পেশা। সমাজকে পথ দেখাবার পেশা। মানুষকে ভালবাসার পেশা।

যে রাজনীতি হওয়ার কথা ছিল মানুষকে ভালবাসার পেশা, সেটা আমাদের হাতে রূপ নিয়েছে হিংসা চরিতার্থ করার পেশায়, বিদ্বেষকে

ঘনিভূত করার পেশায়, হানাহানি, এমন কি খুনখারাবীর পেশায়। তরুণদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তুলে দিয়ে এক বন্ধুকে দিয়ে আরেক বন্ধুকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করার পেশায়।

বলুন এ অবস্থায় রাজনীতিবিদদের এবং রাজনীতিকে ভয় না -করে উপায় কি? রাজনীতিবিদরা আইনের শাসনের কথা বলেন, কিন্তু তাঁরাই আইন মানেন না। সমাজে যাঁরা আইন ভাংগেন তাঁরা তাঁদেরকে প্রশ্রয় দেন। তাঁদেরকে নেতার সারিতে বসিয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্রের কথা বলেন, গণতন্ত্রের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দেবার ঘোষণা দেন কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রকে পরিহার করে চলেন।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকান্ড দেখলে মনে হবে একদল আরেক দলের পিছু লাগাটাই যেন তাঁদের প্রধানতম কর্মসূচী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা কিংবা দখলে রাখাটাই তাঁদের কর্মকান্ডের মূল প্রেরণা। এই ক্ষমতা দিয়ে দেশের মানুষের জন্য কিছু করার কথা আছে এটা তাঁদের কাজকর্ম থেকে পরিস্কারভাবে ধরা পড়ে না।

রাজনীতি কেন?

সমাজের অগ্রগতি এবং পশ্চাদপদতার নিয়ামক হলো রাজনীতি। একে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সমাজের জন্য কিছু করার উপায় নেই। তাই সমাজকে নিয়ে, মানুষকে নিয়ে ভাবতে গেলে রাজনীতির কথাতে আসতেই হবে। রাজনীতি সবাই করে না, কিন্তু সকলকে রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করতে হয়। চিন্তিত হতে হয়।

রাজনীতি সম্বন্ধে আমার ধারণা হচ্ছে এটা এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের বিচ্ছিন্ন মানুষ সমষ্টিগত কতকগুলি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং সেই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য নানা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে। নিজের এবং সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, কিংবা তা অর্জনের পন্থা সম্বন্ধে সকলে একমত হতে পারেন না বলে মানুষ নানা রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই আবার বহু মানুষের বহু রকমের ইচ্ছায় এক একটা কোয়ালিশন। মূল কয়েকটি বিষয়ে একমত হয়ে দল গঠিত হলেও, দলের সকলেই সব বিষয়ে একমত হবে এমনটা কেউ আশা করে না।

রাজনীতি দেশের মানুষের সমষ্টিগত ইচ্ছাগুলি, আকাংখাগুলি চিহ্নিত করে তার মালা গেঁথে এটাকে রাষ্ট্রীয় করণীয়তে পরিণত করে। অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার, আকাংখার, আশার মূল সুরগুলিকে যে রাজনৈতিক দল সফলভাবে চিহ্নিত করতে পারে সে-রাজনৈতিক দলকেই মানুষ দায়িত্ব দেয় তা বাস্তবায়নের। সে-দল মানুষের ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হলে মানুষ আবার বিকল্প খোঁজে।

রাজনীতিতে দেশের সকল মানুষের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে শিখতে হয়। এটাই গণতান্ত্রিক নিয়ম। কারো ইচ্ছাই অবহেলার নয়, অবজ্ঞার নয়, তাচ্ছিল্যের নয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এথনিক ক্লিনজিং (ethnic cleansing) যেমন

গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নয় রাজনৈতিক ক্লিনজিং-ও সেরকম গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নয়। শক্তি প্রয়োগ করে কেউ কারো মতকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে না।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অপ্রধান সুরগুলি হারিয়ে যায় না। কখনো তার মধ্য থেকে কোন কোন সুর প্রধান সুরগুলির সারিতে আসে, কোন কোন সুর রূপান্তরিত হয়ে অন্য সুরে পরিণত হয়। তাই রাজনীতিবিদের ভূমিকা এত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মানুষের মনের সুর ধরতে পারেন, যেসব সুর মানুষের মনে এখনো জাগেনি, কিন্তু জাগানোর সময় এসেছে সে-সুর তিনি জাগাতে পারেন, পরিস্থিতির সহযোগিতায় সে-সুরকে তিনি প্রধান সুরে পরিণত করতে পারেন। যিনি পারেন, তিনিই সার্থক নেতা।

আমাদের রাজনীতি

আমরা সর্বত্র সকল রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি। এটা আমাদের অবসর বিনোদনের একটা সহজ উপায়। বুদ্ধি চর্চারও একটা পন্থা। আমাদের আশা অনেক। কিন্তু তা পূরণ হবার কোন লক্ষণ কখনো আমরা দেখি না। যে কাজ যেভাবে অগ্রসর হবে বলে আশা করেছিলাম সেটা সেভাবে অগ্রসর হয় না। রাজনৈতিক কর্মকান্ড কখনো কোন রীতি-রেওয়াজ, নিয়ম ও আইনের ছক ধরে চলে না। প্রত্যাশিত পথকে এড়িয়ে চলাই যেন এর নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এজগতের সব কিছু speculative। কাজেই ভবিষ্যৎ বাণীর প্রয়োজন সৃষ্টি হয় পদে পদে। ঘোড়দৌড় নিয়ে যেরকম বাজী চলে আমাদের দেশে সেরকম বাজী রাখার ব্যবসায় যদি চালু থাকতো তবে বেশ একটা জমজমাট ব্যবসায় ফাঁদা যেতো রাজনীতি নিয়ে। ডঃ কামাল হোসেন পার্টি করবেন, কি করবেন না এটার উপরই বাজী রেখে বহুজনে বহু পয়সা আয় করতে পারতো।

প্রতিপক্ষকে প্রস্তুতি নেবার সুযোগ না-দেবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি সবকিছু অস্পষ্ট রাখতে চায়। এই আলোছায়ার খেলায় আমরা যত সময় এবং দক্ষতা ব্যয় করি তা যদি কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজে লাগানো যেতো তবে যেকোন দল জনগণের কাছে আরো বেশী ঘনিষ্ট হতে পারতো। জনপ্রিয় হতে পারতো। রাজনীতির জগতকে কুয়াশাচ্ছন্ন রাখছি বলে গুজব-শিল্প বাংলাদেশে সবচাইতে বড় শিল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। (এখানে "শিল্প" শব্দটি উভয়ার্থে গ্রহণ করা যেতে পারে– ইন্ডাস্ট্রি অর্থে এবং আর্ট অর্থে)।

রাজনীতিকে আমরা এরকম ধোঁয়াটে করে রাখি কেন? আমার মনে হয় নিজেদের উপর আমাদের আস্থা নেই বলে। আমরা সব সময় সকল বিকল্প উন্মুক্ত রেখে পথ চলতে চাই। যেকোন মুহুর্তে যেকোন রকমের সিদ্ধান্ত নেবার নিরংকুশ অধিকার হাতের মুঠোয় রাখতে চাই। মানুষের সংগে আমাদের সম্পর্ক ক্ষীণ বলে যেকোন ছোটখাট দুর্ঘটনায় আমাদের অবস্থান উল্টে যেতে পারে এটা বুঝতে কারো কষ্ট হয় না।

মানুষ রাজনীতি করবে মানুষের কল্যাণের জন্য। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নয়। প্রতিপক্ষ যারা তারাও দেশের মানুষের সমষ্টি। তাদের "ঘায়েল" করার

ত কোন অর্থই হয় না। তারাও এদেশের নাগরিক। তাদের ইচ্ছার দাম অন্য কারো ইচ্ছার দামের চাইতে কোন অংশে কম নয়।

রাজনীতি হবে রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য। আমরা রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলির সব কিছু ভুলে গিয়ে একটি তাৎক্ষণিক লক্ষ্য নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ি–প্রতিপক্ষকে ঠেকাও।

এর জন্য একটাই যুক্তি। প্রতিপক্ষ ক্ষমতায় আসলে তারা আমাদের অস্তিত্ব রাখবে না। এক দল আরেক দলের প্রতি এরকম হুমকি হয়ে পড়লে, দেশের মানুষ কি আর নিরাপদে থাকতে পারে?

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই রাজনীতি

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই রাজনীতি। মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্যই রাজনীতি। অথচ আমরা রাজনীতি করে যাচ্ছি মানুষকে বিভক্ত করার জন্য। কোন কথাটি দেশের মানুষকে বেশী করে বিভক্ত করবে আমরা খুঁজে পেতে সে কথাটিই আবিস্কার করি এবং কারণে অকারণে উঁচু গলায় সেটা উচ্চারণ করি। কোন কথাটি অন্য দলের মানুষের মনে বেশী আঘাত দেবে সেটা ব্যবহার করবার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত।

আমরা এমন সব কথার সৃষ্টি করি যেগুলির নানা ব্যাখ্যা দাঁড়ায়। ক্রমে ক্রমে কথাগুলি মানুষকে বিভক্ত করার কাজে সাংকেতিক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করি। বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এই কথাগুলিও মানুষকে বিভক্ত করার কাজে লাগানো হচ্ছে। আমাদের জাতীয়তা একটাই। এর চাইতে নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট বিতর্কহীন জাতীয়তা দুনিয়ার আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। যেখানে দুনিয়ার হাজারো জাতীয়তা এসে জাতীয়তার ঘন্ট পাকানো হয়েছে সেখানে জাতীয়তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। অথচ আমরা এক ভাষা, এক জাতীয়তা, এক ঐতিহ্যের ছোট এক ভূখন্ডে দিলাম একটা মোক্ষম প্যাচ কষে। যেন এটা নিস্পত্তি না-হলে কিছুতেই অন্য কিছুতে হাত দেয়া যাবে না। সুইজারল্যান্ডে কোন জাতীয়তাবাদ? একদিকে জার্মান ভাষাভাষী জার্মান সংস্কৃতির ধারক জনগোষ্ঠি, আরেকদিকে ফরাসী ভাষাভাষী ফরাসী সংস্কৃতির ধারক জনগোষ্ঠী, অন্য দিকে ইটালীয় ভাষাভাষী ইটালীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক জনগোষ্ঠী। দুনিয়ার একটা নির্ঝঞ্ঝাট জাতি হিসেবে তারা দিব্যি শান্তিতে কাটিয়ে যাচ্ছে। কেউ জাতীয়তা নিয়ে কচলাকচলি করছে না। আমাদের কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলায়?

আমাদের রাজনীতি বিভক্তকরণের রাজনীতি

শব্দের লেবেল এঁটে মানুষকে বিভক্ত করা কেন ? আমাকে যে লেবেলের নীচেই রাখুন না কেন আপনি কি আমার বাঙালীত্ব আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন? দুনিয়ার সামনে বাংলাদেশী হিসেবে আমার পরিচয় কি আপনি মুছে দিতে পারবেন ?

আমি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে সচেতন থাকতে চাই। কিন্তু তার কোনটাকে নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করতে চাই না। আমার মূল পরিচয়েই আমি সব চাইতে বেশী প্রশান্তি খুঁজে পাই। আমি মানুষ। আমি সৃষ্টির সেরা জীব। পৃথিবীর সকল জীবের আত্মসম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার উপর। সকল

মানুষকে মানুষের মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমার উপর।

এর পরে আমার আরো বহু পরিচয় আছে। আরো বহু দায়িত্ব আছে। আমি সবটা জেনে রাখতে চাই। সকল দায়িত্ব পালন করতে চাই। কিন্তু আমার এক পরিচয় দিয়ে অন্য কোন পরিচয়কে খাটো করতে চাই না। অন্য কোন দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে চাই না।

আমরা যেন এমন সমাজ গড়তে পারি যেখানে প্রত্যেক মানুষ তার প্রত্যেক পরিচয় এবং দায়িত্ব বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেকে নিজেই যেন নিজের সকল পরিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। নিজের এমন আরো পরিচয় নিজে সৃষ্টি করতে পারে যাতে তার মনুষ্যত্বের পরিচয়টি আরো মহত্ত্বর হয়ে বিকশিত হতে পারে।

বিভক্তকরণের রাজনীতি আমাদেরকে প্রতিশোধের রাজনীতির দিকে নিয়ে গেছে এবং সেখানে এক গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে।

ক্ষমার মাধ্যমেই শক্তি সুনিশ্চিত হবে

প্রতিশোধের রাজনীতির এই গোলক ধাঁধাঁয় আমরা কতদিন ঘুরপাক খাবো ? আমাদের প্রতিশোধের তালিকায় এতরকম প্রতিশোধ জমা হয়ে আছে যে এই তালিকা ধরে এগুলো আমাদের হাড্ডি মাংস আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। একই কথা, একই ঝগড়া, একই কোন্দল কলের গানের ভাংগা রেকর্ডের মত বেজেই চলেছে। এই দ্রুত অগ্রসরমান পৃথিবীতে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকার অধিকারটুকু আদায় করতে হলেও আমাদেরকে সামনে এগুতে হবে। নতুন কাজে হাত দিতে হবে। আমাদেরকে চলতে শিখতে হবে। আমাদেরকে চলার গান কে শেখাবে ? বারো কোটি মানুষকে নিয়ে একটা দিন বসে থাকলেও যে আমরা অন্য জাতির তুলনায় বহু পথ পিছিয়ে যাই। আমাদের ত কোন্দল নিস্পত্তির আশায় বসে থাকার একটা মুহুর্তও সময় নেই। বারো কোটি মানুষ বসিয়ে রাখা দূরের কথা একজন মানুষকেও বসিয়ে রাখার উপায় আমাদের নেই। চারদিকে করার মত এত সব কাজ ছড়িয়ে আছে, মানুষ বসে থাকবেও বা কেন ?

শোককে যদি শক্তিতে পরিণত করতে চাই তবে ক্ষমা দিয়ে শুরু করতে হবে। মনের মধ্যে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন না-রেখে ক্ষমা করতে হবে। ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ। ক্ষমার মাধ্যমেই দেশের শক্তি সুনিশ্চিত হবে। আমরা যে যা অপরাধ করেছি আসুন পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করে দিয়ে কাজের পথে একযোগে এগিয়ে যাই। ভবিষ্যতে যাতে কেউ পুরনো অপরাধ বা নতুন কোন অপরাধ করতে না পারে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের কারণে প্রাণ দিয়েছেন- আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের সকলের আত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হবে যেদিন তাঁরা দেখবেন বাংলাদেশের কোন মানুষ আর দরিদ্র নয়, বাংলাদেশের কোন মানুষ আর নিরক্ষর নয়, বাংলাদেশ সম্মানিত জাতিগুলির অন্যতম, বাংলাদেশের মানুষের

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতি পৃথিবীকে বিস্মিত করছে। তাঁরা সেদিন মনে করবেন এদেশের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছে।

যদি উল্টোটা হয়, যদি তাঁরা দেখেন আমরা প্রতিশোধ নেবার জন্য হানাহানি করছি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করছি, দেশে মানুষের খাবার নেই, পরণের কাপড় নেই, এদেশের মা-বোনদের নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিক্রী করে দেয়া হচ্ছে, বিদেশের জেলে আমাদের মা-বোনেরা আটকে পড়ে আছে-আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের আত্মা আর্তনাদ করে জিজ্ঞেস করবে- এরই জন্য কি প্রাণ দিয়েছিলাম? আমরা কি তাহলে ভুল করেছিলাম?

আমরা যাঁরা সন্দেহ করি বাংলাদেশের কিছু মানুষ এখনো পাকিস্তানকে ভুলতে পারছে না, তাঁদের এটা স্মরণে রাখতে হবে যে, ওয়াজ নসিহত কিংবা রক্তচক্ষু দেখিয়ে তাঁদের মন থেকে আমরা পাকিস্তান মুছে দিতে পারবো না। যদি দেখাতে পারি আমরা এদেশে রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের চাইতে অনেক বেশী শান্তিতে বাস করছি, এদেশে সকলের কথা বলার সুযোগ আছে, কাজ করার সুযোগ আছে, রাজনীতি করার সুযোগ আছে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব আছে, যদি দেখাতে পারি অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা পাকিস্তানের চাইতে অনেক বেশী এগিয়ে আছি- তখন খোঁজ নিলে দেখা যাবে তাঁদের মন থেকে পাকিস্তান নামটি কখন কিভাবে মুছে গেছে তাঁরা নিজেরাই টের পাননি।

যদি অন্য রকম হয়- যদি দেখা যায় পাকিস্তানে প্রগাঢ় রাজনৈতিক শান্তি স্থায়ী হয়ে গেছে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব বিরাজ করছে, পাকিস্তান নতুন অর্থনৈতিক বাঘের সারিতে গেছে, বাংলাদেশের মেয়েরা পাকিস্তানীদের বাড়ীতে ঝিগির করছে, বাংলাদেশের ছেলেরা পাকিস্তানীদের রাস্তা সাফ করছে, গাড়ী মুছছে– এটা আন্দাজ করা বোধ হয় অন্যায় হবে না যাঁরা পাকিস্তানের নাম বহুদিন আগে ভুলে গিয়েছিলেন তাঁদের মনেও নতুন করে নামটি জেগে উঠবে।

একাত্তুর সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত রাজনীতিতে আমরা বহু ভুল করেছি। এগুলি নিয়ে ঘাটাঘাটি করে আমরা শুধু নিজেদেরকে আঘাত করবো এবং দুর্বল করবো মাত্র। ইতিহাসবেত্তাদের, বিশ্লেষকদের হাতে এসবের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিবিদরা এগিয়ে আসুন দেশে ঐক্য সৃষ্টি করতে। গতির জন্য ঐক্য করুন, একের পর এক দ্রুত গতিতে সমস্যা সমাধানের জন্য গতি সৃষ্টি করুন।

একই পথে ঘুরপাক খাচ্ছি

আমি যতবারই আমার রাজনৈতিক এক নেতা বন্ধুর কাছে অভিযোগ করি যে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি (তার দলসহ) মেলায় পথ-হারানো শিশুর মত একই পথে বারবার আসছে যাচ্ছে। সে ততই ক্ষেপে গিয়ে আমাকে বলেঃ দ্যাখো, বাজে বকো না। যেটা বুঝ না সেটা নিয়ে কথা বলো না। ব্যাংক চালানো আর রাজনীতি এক জিনিস নয়। আমি তাকে বুঝাই– আমি রান্না করতে না-জানতে পারি কিন্তু রান্না কোনটায় স্বাদ হলো কোনটায় হলো-না এটাও বলতে পারবো না?

রাজনৈতিক বন্ধুদের তর্কে পরাস্ত করা খুব কঠিন কাজ। সে বল্ল ঃ তুমি ত স্বাদের কথা বলছো না। তুমি মন্তব্য করছো রান্না কিভাবে হচ্ছে তার উপর। তুমি রাজনীতির মানুষ নও। কিন্তু যদি এসময় রাজনীতিতে থাকতে তাহলে কি করতে?

বল্লামঃ তোমার দল যা যা করছে না সেগুলি করতে হবে। যেগুলি করছে সেগুলির অনেক কিছু করা বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া সব চাইতে ভাল হয় রাজনীতি করার ধরণটা যদি আগাগোড়া বদলে ফেলতে পারতে।

বন্ধু এবার চেপে ধরলো ধরন পাল্টানো মানে কি? রাজনীতি কি আবার তোমার কাছে নতুন করে শিখতে হবে?

সে আমার বহু পুরনো বন্ধু। আমার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। তার প্রতিও আমার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা খুব একটা মেলে না।

একটি রাজনৈতিক দলের দিবাস্বপ্ন

আমার বন্ধুকে জবাব দেয়া হয়নি। সেও আর জবাব চায়নি। আমি কিন্তু মনে মনে জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছি। নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি নতুন ভংগীর রাজনীতি কি হওয়া উচিত? আমি যদি রাজনীতি করতাম, কি করতাম?

আমি যদি রাজনীতি করতাম তাহলে নতুন ভংগীতে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করতাম। (জানি আপনারা হাসছেন। ভাবছেন এই যে ঘুরে ফিরে সেই পুরনো কথা, আরেকটা রাজনৈতিক দল, যা দেশের সকল সমস্যার সমাধান করবে। যথেষ্ট হয়েছে, এবার ভালোয় ভালোয় বসে পড়ুন)।

আমার ধারণা আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গতিহীনতার, দিক নির্দেশনাহীনতার সবচেয়ে বড় কারণ হলো আমাদের রাজনৈতিক দলগুলিতে দলের কর্মীদের অবস্থান ও ভূমিকা। দলের কর্মীরা কতগুলি শব্দ কিংবা বাক্যকে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে তাঁদের দলের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কর্মীদের মোট কাজের মধ্যে বৃহত্তর অংশ হচ্ছে জনসভা সফল করার জন্য লোকজন জড়ো করা (রাজনীতির চলতি ভাষায় তাকে "চোঙ্গা ফোঁকা" বলে আখ্যায়িত করা হয়), হরতাল সফল করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভয়ভীতির আয়োজন রাখা (প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা), বিশেষ বিশেষ দিবস উদযাপনের আয়োজন করা (পোস্টার লাগানো, চিকা মারা, ও অন্যান্য), দলের উচ্চতর পর্যায়ে সম্মেলনে লোকজন যোগাড় করে নিয়ে যাওয়া, বড় নেতারা সফরে আসলে তাঁদের জন্য যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন করা, স্থানীয় তদবির করা, প্রতিপক্ষকে সামাল দেবার জন্য প্রস্তুত থাকা, দলের ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ পেলে সুযোগ হাতছাড়া না-করা, ইত্যাদি।

কর্মীদের কাজ হলো নেতৃত্বের ইচ্ছাগুলিকে বাস্তবায়ন করা। নেতৃত্ব যদি হঠাৎ করে মত পাল্টিয়ে ফেলেন, পথ পাল্টিয়ে ফেলেন, কর্মীদেরকে সংগে সংগে সেটা সমর্থন করতে হয়। এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু নতুন বাক্য শিখতে হয়। কর্মীরা দলের (নেতৃত্বের) সেবা করে যাবে -এটাই হলো নিয়ম। একদিন ক্ষমতায় গেলে তাদের কিছু সুবিধা হবে এরকম হয়তো একটা ধারণা

থাকে। দল ক্ষমতায় না-গেলেও একটি দলের সংগে জড়িত থাকার, ক্ষমতাবান লোকজনের সান্নিধ্যে থাকতে পারার,তার ফলে কিঞ্চিৎ সামাজিক স্বীকৃতি কিংবা আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা হয়তো থাকে। ভবিষ্যতে সিঁড়ি বেয়ে দলের উপরের দিকে উঠারও একটা আশা থাকে।

কর্মীই হবে দলের নীতি নির্ধারণের কারিগর

আমার কল্পিত রাজনৈতিক দলে আমি কর্মীকে দলের একজন সংগঠক, দলের নীতি বাস্তবায়নে একজন প্রথম কাতারের সৈনিক এবং দলের নীতি নির্ধারণে একজন তাত্বিক হিসেবে দেখতে চাই।

আমার দিবাস্বপ্নের রাজনৈতিক দলটিকে এখানে আমরা "আমার দল" নামে অভিহিত করবো (নামটা মন্দ হয়নি- পত্রিকার পাতায় "আমার দলের প্রার্থী পরাজিত" একথা পড়তে যে কারো মনে কষ্ট হবে)। এই দল গ্রাম থেকে শুরু হবে। গ্রামের তরুণদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পাঁচজন পাঁচজন তরুণকে নিয়ে কর্মীদের এক একটা গ্রুপ হবে (গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়মের প্রভাব দেখতেই পাচ্ছেন)। পুরুষরা পুরুষদের নিয়ে গ্রুপ করবে, মহিলারা মহিলাদের নিয়ে গ্রুপ করবে। তরুণরা যারা " আমার দলের" নীতি ও কার্য পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হবে তাদেরকে গ্রুপ গঠন করার পর দলের কর্মী হবার জন্য আবেদন করতে হবে। প্রাথমিক আবেদনের পর তাদেরকে স্থানীয়ভাবে দলের আদর্শ,লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সফলভাবে ভর্তি পরীক্ষা পাস করার পর তাদেরকে এক বছরের জন্য প্রশিক্ষণার্থী কর্মী হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এই এক বছরের মধ্যে তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হবে। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। স্থানীয় উদ্যোগে এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য একটা বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এরকম অন্যান্য ক্ষেত্রেও (যেমনঃ বৃক্ষ রোপন, মাছ চাষ, যৌতুক প্রথার অবসান, নারী নির্যাতন অবসান, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খেলাধূলার মান উন্নয়ন, পাঠাগার স্থাপন বা উন্নয়ন ইত্যাদি) দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

এক বছর সমাপ্তির পর গ্রুপের সকল কাজকর্ম মূল্যায়ন করে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের কর্মী হিসেবে গ্রহণ করা হবে। গ্রুপ নিজেদের মধ্যে সভাপতি ও সচিব নির্বাচন করবে। প্রতি বছর নির্দিস্ট দিনে সভাপতি ও সচিবের নির্বাচন হবে এবং দায়িত্ব হস্তান্তর হবে। কেউ কোন সময় পুনঃ নির্বাচিত হতে পারবে না।

"আমার দলের" কাজ একযোগে সকল গ্রামে শুরু হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে গ্রামে একটি ছেলে বা একটি মেয়েকে "আমার দলের" কর্মসূচীতে বিশ্বাসী পাওয়া যাবে তাকে নিয়েই কাজ শুরু করা যাবে। ছেলেটি বা মেয়েটির কাজ হবে আরো চারজন ছেলে বা মেয়েকে উদ্বুদ্ধ করা এবং একটি গ্রুপ গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

গ্রাম পর্যায়ের গ্রুপের সদস্যরাই হবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মী। তিনি হবেন দলের নীতি নির্ধারণের এবং বাস্তবায়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি মানুষের সংগঠক। সমাজ পরিবর্তনের সংগঠক। আগামীতে সমাজ যেখানে পৌঁছতে চায় তার আয়োজক। তিনি মানুষ থেকে শেখেন, দলকে শেখান। তিনি দলের কথা মানুষকে বোঝান। মানুষের সংগে দলের দৈনন্দিন সম্পর্কের তিনি স্নায়ুতন্ত্র। প্রত্যেক কর্মীর জন্য অন্ততঃ দশটি পরিবার সুনির্দিষ্ট থাকবে যাঁদের সংগে তিনি নানা বিষয়ে আলাপ করবেন, তাঁদের স্বপ্নকে দলের স্বপ্নে রূপান্তরিত করবেন, দলের স্বপ্নকে তাঁর স্বপ্নের সংগে সাযুজ্যপূর্ণ করবেন। দেশের চারদিক থেকে আসা কর্মীদের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই দলের বহু গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে, বহু নীতি ও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে। তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই দলকে সজীব এবং চলমান রাখবে।

"আমার দলের" রাজনীতি গ্রাম পর্যায়ে শুরু করার উদ্দেশ্য এই হবে না যে এর মাধ্যমে দ্রুত রাজধানীতে ক্ষমতার আসনে বসা যাবে। রাজধানীতে ক্ষমতার আসনে বসার লক্ষ্যকে "আমার দল" মুখ্য লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করবে না। এই দলের লক্ষ্য হবে যে কোন অবস্থান থেকে মানুষের মধ্যে দ্রুত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন নিশ্চিত করা। সে পরিবর্তন যেন কোনক্রমে চাপানো পরিবর্তন না-হয় সেজন্য মানুষের ইচ্ছাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এই দল অগ্রসর হবে।

সরকারী কর্মচারীদের সেবা নিশ্চিত করবে

গ্রাম পর্যায়ে সকল স্বীকৃত গ্রুপের সভাপতিদের মধ্য থেকে "গ্রাম কমিটি" গঠন করা হবে। গ্রাম কমিটির কাজ হবে গ্রামের অন্যান্য রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী ব্যক্তিদেরকে যথাসম্ভব সম্পৃক্ত করে গ্রামোন্নয়নের একটি পরিকল্পনা রচনা করা। পরিকল্পনা রচনার পর সেটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া। একাজে সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহযোগিতা নেয়া। গ্রামে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আছে তাদের তালিকা প্রণয়ন করা এবং তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। সরকারী কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করছেন কিনা সেটা নিয়মিত মনিটর করা। তাঁদেরকে তাঁদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা। তাঁদের কেউ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে এবং সেটা সংশোধন স্থানীয়ভাবে সম্ভব না-হলে তাঁর ওপরঅলার নিকট নালিশ করা। একই সংগে দলের ইউনিয়ন এবং থানা পর্যায়ের কমিটিতে অবহিত করা। ইউনিয়ন পর্যায়ে যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী আছেন (যেমনঃ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, ব্লক সুপারভাইজার, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীগণ ও অন্যান্য) তারা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করছেন কিনা সে ব্যাপারে মনিটর করার জন্য দলের ইউনিয়ন কমিটিকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

গ্রামের কর্মী গ্রুপগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে দলের ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হবে। ইউনিয়ন কমিটি প্রতিনিধিদের নিয়ে থানা কমিটি হবে। একই নিয়মে জেলা কমিটি হবে। শহরেও কর্মীদের গ্রুপ গঠন করা হবে। একই নিয়মে

প্রশিক্ষণ হবে। শহরের মহল্লা কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি,শহর কমিটি ইত্যাদি হবে। জেলা কমিটির নির্বাচনে জেলার সকল থানা ও শহর কমিটি অংশ গ্রহণ করবে। একইভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে।

প্রত্যেক কমিটি উপরের কমিটির নিকট লিখিতভাবে নিয়মিত মাসিক প্রতিবেদন পাঠাবে। এতে পরিকল্পনা রচনার সমস্যার কথা বাস্তবায়নের সমস্যার কথা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে কিংবা বাস্তবায়নে দোষ ত্রুটিগুলি তুলে ধরা হবে এবং সংশোধনের পথ নির্দেশ করা হবে। দলের কখন কী করণীয় সেটা এই সকল প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকবে। একই নিয়মে উপরের কমিটি নীচের কমিটির নিকট মাসিক প্রতিবেদন পাঠাবে। কি কি ব্যাপারে তারা পদক্ষেপ নিচ্ছেন সেটা নীচের কমিটিকে অবহিত রাখবে।

সকল পর্যায়ের কমিটিতে সর্বোচ্চ পদের তিনটির মধ্যে অন্ততঃ একটি পদে মহিলা নির্বাচিত করতে হবে। সকল কমিটিতে মোট অন্ততঃ তিনজন মহিলা থাকবেন।

যাঁরা আইন ভাংগেন তাঁরা নেতৃত্বে যেতে পারবেন না

দলে যোগদানের পর যে সকল কর্মী নিজের বিয়েতে যৌতুক গ্রহণ করবেন অথবা যাঁরা নিজের ছেলের বিয়েতে যৌতুক গ্রহণ করেন বা মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেন তাঁদেরকে দলের সকল রকম নির্বাচিত পদের প্রার্থিতার জন্য অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে। নির্বাচন দ্বারা গঠিত দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে দলের পক্ষ থেকে তাদেরকে মনোনয়ন দান করা হবে না।

আয়ের সংগে যাঁদের সম্পদের দৃশ্যতঃ সামঞ্জস্য নেই তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হবে। তাঁরা দলের কমিটির কাছে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না-পারলে কোন প্রতিনিধিত্বশীল কাজের জন্য তাঁদের মনোনয়ন দেয়া হবে না। যাঁরা ব্যাংকের ঋণ খেলাপী করেছেন তাঁদেরকে কোন পদে নির্বাচন করা হবে না, কোন প্রতিনিধিত্ব কাজের জন্য মনোনয়ন দান করা হবে না।

সামাজিক অনুষ্ঠানে যাঁরা অশ্লীলভাবে অর্থ ব্যয় করেন তাঁদেরকে দল থেকে বহিস্কার করে দেয়া হবে।

সাম্প্রদায়িকতা, নারী নির্যাতন ইত্যাদির অভিযোগ দলীয়ভাবে প্রমাণিত হলে তাঁদেরকে দলে রাখা হবে না।

ফৌজদারী আইনে সাজাপ্রাপ্ত কাউকে দলের কোন পদে নির্বাচিত করা যাবে না। নির্বাচিত কেউ সাজাপ্রাপ্ত হলে তাঁকে তাঁর পদ ছেড়ে দিতে হবে।

যাঁরা অন্য দল ত্যাগ করে "আমার দলের" কর্মী হিসেবে গ্রুপ গঠন করে যোগ দিতে চান তারা যদি অন্য দলের কোন পদে অধিষ্ঠিত থেকে থাকেন তবে নতুন দলে প্রথম পাঁচ বছর তাঁদেরকে কোন কমিটিতে রাখা হবে না।

দলের লক্ষ্য

যে লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে "আমার দল" সকল মানুষকে সংঘবদ্ধ করবে সেগুলি ক্রমানুসারে নিম্নরূপঃ

পূর্ব ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে-
দেশে দৃঢ়ভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা;
সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করা;
দেশ থেকে দারিদ্রের সকল চিহ্ন মুছে ফেলা;
দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা মুক্ত করা;
অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা;
দেশকে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া;
হিংসা বিদ্বেষমুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

"আমার দলের" কাছে রাজনীতির অর্থ হবে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ যাতে সম্মানের সংগে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সংগে, শান্তির সাথে প্রগতি নিশ্চিত করে বসবাস করতে পারে। এই দলের রাজনীতি ব্যক্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে। একজন নাগরিক যাতে আরেকজন নাগরিকের অধিকার কিছুতেই খর্ব করতে না -পারে তার আয়োজন করবে। "জ্বালাও, পোড়াও, খতম কর" ধরনের বিভীষিকাপূর্ণ রাজনীতি যাতে জায়গা না-পায় তার আয়োজন করবে।

মনোনয়ন দেবে স্থানীয় কমিটি

দেশের সাধারণ নির্বাচন, স্থানীয় নির্বাচন, বা যে কোন নির্বাচনে এই দল থেকে কোন প্রার্থী কেন্দ্রীয়ভাবে মনোনীত করা হবে না। সকল প্রার্থী স্থানীয় কমিটির দ্বারা মনোনীত হবেন। যাঁরা স্থানীয় উন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

এই দলের কোন শ্রমিক ফ্রন্ট বা ছাত্র ফ্রন্ট থাকবে না। শ্রমিকরা তাঁদের রাজনীতি করুক,ছাত্ররা তাদের রাজনীতি করুক। কিন্তু এই দলের অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাঁদের মধ্যে কোন সংগঠন থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এবং কলকারখানায় যাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য এই দল ক্রমাগতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

এই দল হরতালকে গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর পন্থা হিসেবে গ্রহণ করবে না। অন্য দল হরতাল আহ্বান করলে যাতে এটা রাজনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে পরিণত না-হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য "আমার দল" সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। যারা হরতালকে সমর্থন করবে না তারা যাতে বিনা ভয়ে দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যেতে পারে এব্যাপারে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেবে।

এই দল অন্য কোন দলের প্রতি অসম্মানসূচক কোন আচরণ করবে না। যেকোন দলের যেকোন মতের যেকোন নাগরিক মুক্ত কণ্ঠে তার বক্তব্য প্রকাশ

করার অধিকারকে এই দল সর্বদা সমুন্নত রাখবে। অন্য দলের সভায় হামলা করা, সভা পন্ড করা, সভায় বোমা ফাটানো, মিছিল আক্রমণ করা ইত্যাদি সকল সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে এই দল সকল সময় প্রতিবাদ জানাবে এবং নিজের কর্মীদের এর থেকে সব সময় দূরে রাখবে। কোন কর্মী এধরনের কোন কাজে অংশ গ্রহণ করলে তাকে দল থেকে বহিস্কার করা হবে।

দলের সকল পর্যায়ের কমিটিকে আবশ্যিকভাবে অন্যান্য দলের কর্মীদের সংগে সম্মানজনক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেয়া হবে।

সাধারণ নির্বাচন, স্থানীয় নির্বাচনসহ যেকোন নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে এজন্য এই দলের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে। স্থানীয়ভাবে আগ্রহী দলসমূহকে সংগে নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল গঠন করার উদ্যোগ নেবে। সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য যে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অপরিহার্য শর্ত সেটা এইদল সব সময় সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

নির্বাচনে জয়ী হওয়া বা পরাজিত হওয়াটাকে এই দল গণতন্ত্রের স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে গণ্য করবে। এই দলের প্রার্থী কোন নির্বাচনে পরাজিত হলে দলের নিয়ম অনুসারে পরাজিত প্রার্থী জয়ী প্রার্থীকে অবিলম্বে অভিনন্দন জানাবেন এবং জয়ী প্রার্থীকে দলের পক্ষ থেকে সকল রকম সহযোগিতার নিশ্চয়তা দেবেন। জয়ী প্রার্থীকে সকল নাগরিকের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি জানাবেন।

নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী জয়ী হলে পরাজিত প্রার্থীদের বাড়ী গিয়ে দেখা করে আসবেন। তাঁদের সহযোগিতা কামনা করবেন। দেশের রাজনীতিতে পরাজিত প্রার্থীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রশংসামূলক বক্তব্য রাখবেন।

জনসভা করবে না

রেডিও টেলিভিশনে অংশ গ্রহণের সুযোগের অভাবে আমাদের দেশে রাজনীতিবিদদের গণ সংযোগের একটা বড় মাধ্যম হয়ে এখনো প্রতিষ্ঠিত রয়েছে জনসভা। দেশের সকল পরিবারের কাছে রেডিও বা টেলিভিশন নেই বলে জনসভার গুরুত্ব এখনো বহাল আছে। নেতাদের জনপ্রিয়তা, কিংবা দলের কর্মসূচীর জনপ্রিয়তা যাচাইয়েরও এটা বড় একটা সুযোগ।

কিন্তু অতীতের সে জনসভা আজ নেই। দূর দুরান্ত থেকে মানুষ আসবে প্রিয় নেতাকে দেখতে, তাঁর বক্তব্য শুনতে। তিনটার মিটিং যখন শুরু হবার কথা তখনো মাঠ প্রায় খালি। বহুক্ষণ গান বাজিয়ে শ্রোতা জোগাড়ের চেষ্টা চলে। কারণ নেতা আসবে মাগরেবের আগে আগে। জনতা তাই ঐসময়ের অপেক্ষায় থাকে।

এখন কাউকে কারো জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রাকে ট্রাকে জনতা আসে। কতবড় জনতা আপনি চান সেটা বলে দেবেন। হয় নিজে টাকা ঢালবেন কিংবা অন্যকে দিয়ে টাকা ঢালাবেন। টাকার জোরে মিটিং-এর জোর।

সরকারী নেতা হলে আরো অনেক সুবিধা। স্কুলের ছেলেমেয়েরা, দুঃস্থ মাতা কর্মসূচীর মহিলারা, ভিডিপি-র পুরুষ মহিলারা, সরকারের টাকায় চলে এমন যত

প্রতিষ্ঠান আছে তাদের লোকজন যথাসময়ে সারিবদ্ধ হয়ে হাজিরা দেয়। সরকারী কর্মকর্তারা গলদঘর্ম হয়ে আয়োজন করে দেবেন রাজনৈতিক দলের সভা। অতীতে নাকি রজনীগন্ধা ফুলগুলি, যেগুলি নেতা জনতার হাত থেকে টেলিভিশনের সামনে গ্রহণ করবেন, হেলিকপটারে করে ঢাকা থেকে নেতার সংগেই নিয়ে যাওয়া হতো।

যেহেতু জনসভা তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে "আমার দল" জনসভাকে জন সংযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে না। পথসভা, ঘরোয়া বৈঠক, স্থানীয় বৈঠক, আলোচনা সভার মাধ্যমে মতের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

"আমরা সব কিছু জানি" এমন ভাববে না

"আমার দল" ক্ষমতায় না-থাকলে তখন যে দলই ক্ষমতায় থাকুক তাদের সংগে সহযোগিতা করবে। যেসমস্ত ক্ষেত্রে নীতির পার্থক্য হবে সে সমস্ত ক্ষেত্রে দলের নীতি কী কারণে উন্নততর সেটা দেশের মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করবে। ক্ষমতায় গেলে যে সমস্ত কাজ এদলের করার কথা তারা ক্ষমতায় যাবার আগে থেকেই এগুলি করতে থাকবে। "ক্ষমতায় গেলে সব সমস্যার সমাধান করে দেবো, দেশে দুধ আর মধুর বন্যা নামিয়ে দেবো"- এরকম কথার পেছনে এদল কখনো লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবে না। "আমাদের কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে- কিন্তু ক্ষমতায় না যাওয়া পর্যন্ত এগুলি কাউকে বলবো না" এধরনের কোন অবস্থান "আমার দল" গ্রহণ করবে না। বরং উল্টোটা করবে। দলের কাছে যত বুদ্ধি আছে, যত পরিকল্পনা আছে ক্ষমতাসীন সরকারকে সেগুলি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নিজেও সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাবে। "আমরা সব কিছু জানি"এমন মনোভাব "আমার দল" কোন সময় গ্রহণ করবে না। সকল পর্যায়ে আমার দল সকলের পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং নিজেদের চিন্তাভাবনা অন্যদের অবগত রাখবে। দেশের অরাজনৈতিক নাগরিকদের সংগে, বিশেষজ্ঞদের সংগে, পেশাজীবীদের সংগে, বাংলাদেশী পেশাজীবীরা যারা বিদেশে আছেন কিংবা বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন– তাঁদের সংগে যোগাযোগ রাখবে এবং মত বিনিময় অব্যাহত রাখবে। আধুনিক সংবাদ আদান-প্রদান প্রযুক্তি ব্যবহার করে সকলের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণকে সহজতর করে নেবে।

ক্ষমতাসীন সরকার ভাল কাজ করলে এদল প্রশংসা করবে। অভিনন্দিত করবে। ভাল কাজ করার জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ করবে। সকল সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রাখবে। যখন দরকার হবে কঠোর সমালোচনা করবে। বিকল্প পথ দেখিয়ে দেবে। শুধু সরকারকে হেয় করার জন্য এদল কোন সমালোচনা করবে না।

"আমার দল"সব সময় মনে রাখবে যে, যে-দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেন সে সরকার শুধু একটি দলের সরকার নয়, সে-সরকার সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের সরকার। "আমার দল" এর যারা অনুসারী তাদেরও সরকার। সরকারের কাছ থেকে দক্ষ প্রশাসন এবং উপযুক্ত নীতি আদায় করে নেয়ার দায়িত্ব সকলের।

"আমার দল" সরকার চালাবার দায়িত্ব পেলে একটি দক্ষ, মানুষের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল প্রশাসন গড়ে তুলবে। পুরনো প্রশাসনিক রীতি-রেওয়াজকে পরিবর্তন করবে। এবং সরকারও মানুষের সম্পর্ককে নথির বাঁধন থেকে মুক্ত করবে। বর্তমান "বজ্র-আঁটুনী ফস্কা গেরো"ধরনের সরকার ব্যবস্থার বদলে খোলাখুলি মানুষ-প্রশাসন সম্পর্ক ব্যবস্থা চালু করবে।

গ্রাম সরকার ও উপজেলা সরকার

এই দল নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় গেলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে তুলবে (গ্রাম সরকার, উপজেলা সরকার)। স্থানীয় সরকারের হাতে সর্বোচ্চ সম্ভব ক্ষমতা দেয়া হবে। উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনার দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় সরকার সমূহকে সফল করার জন্য সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। ক্রমাগত মনিটরিং এর মাধ্যমে সকল স্থানীয় সরকারের অবস্থান তাদেরকে অবহিত রাখা হবে। যে সকল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার পরিচয় দেবে তাদের জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা হবে। যে সকল স্থানীয় সরকার পিছিয়ে পড়বে তাদেরকে দক্ষ করে তোলার জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

গ্রাম সরকারসমূহ এবং উপজেলা সরকার সমূহের মধ্যে বিপুল প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। দারিদ্র নিরসনের প্রতিযোগিতা। স্বাস্থ্যের প্রতিযোগিতা। শিক্ষার প্রতিযোগিতা। উৎপাদনের প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেকর্ড স্থাপনের প্রতিযোগিতা। সম্পদ সংগ্রহে প্রতিযোগিতা। স্বনির্ভরতার প্রতিযোগিতা। দক্ষতার প্রতিযোগিতা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। খেলাধুলার প্রতিযোগিতা।

গ্রাম সরকার, উপজেলা সরকার আর পৌরসভা সরকারসমূহের সংবাদের জোয়ারে দৈনিক পত্রিকাগুলি ভরা থাকবে, রেডিও-টেলিভিশন উপচে পড়বে।

গ্রামের সকল মানুষের জন্য উন্নত জীবন নিশ্চিত করার উৎপাদনের জোয়ার সৃষ্টি করা হবে। বাংলাদেশের চিনি, ডিম, মাছ, কাপড়, কৃষি পণ্য ভারত ও অন্যান্য দেশে রফতানী করার উপযুক্ততা অর্জনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন গ্রাম সরকার ও উপজেলা সরকার কোন পণ্যের উৎপাদন ব্যয় আন্তর্জাতিক উৎপাদন ব্যয়ের নীচে আনতে পারলে তার সংবাদ সকলকে জানিয়ে রাখা হবে। সফল গ্রাম সরকার উপজেলা সরকারকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেয়া হবে।

স্থানীয় সরকারকে সফল করার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার নিজের কর্মসূচীকে সফল করার উদ্যোগ নেবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়তন বিপুলভাবে হ্রাস করা হবে। কিন্তু এই সরকার দক্ষতায় সর্বোচ্চ স্থানে থাকবে।

বাংলাদেশকে সার্ক দেশসমূহের মধ্যে সব চাইতে দক্ষ অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক শক্তিকে প্রয়োগ করবে।

স্থানীয় পুলিশ

"আমার দল" ক্ষমতায় গেলে পুলিশ ব্যবস্থা পাল্টে ফেলবে। স্থানীয় পুলিশ ব্যবস্থা চালু করবে। উপজেলা সরকারের নিজস্ব পুলিশ থাকবে। স্থানীয় পুলিশ প্রধান একজন নির্বাচিত ব্যক্তি হবেন। তিন বছরের জন্য তিনি নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেক পৌরসভার নিজস্ব পুলিশ থাকবে। একই নিয়মে এই পুলিশ বাহিনীর প্রধান নির্বাচিত ব্যক্তি হবেন।

কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের আইন রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

এই দল বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে দেবে। উপজেলা পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থা চালু করবে। গ্রাম সরকারের সুপারিশক্রমে উপজেলা আদালতে বিচার প্রার্থনা করা যাবে। গ্রাম সরকার সালিশের মাধ্যমে যে সমস্ত মামলা নিস্পত্তি করতে পারবে না সেগুলি তাদের সুপারিশক্রমে উপজেলা আদালতে যাবে। গ্রাম সরকারের সালিশ যে কোন এক পক্ষ মেনে না নিলে তিনি মামলাটি উপজেলা আদালতে নিয়ে যেতে পারবেন।

"আমার দলের" সরকার দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে। কোন সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে প্রতি ঘন্টা সরবরাহ বন্ধ থাকার জন্য উচ্চহারে গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। বিদ্যুৎ বন্ধ থাকার সময় যত দীর্ঘতম হবে ঘন্টা প্রতি ক্ষতিপূরণের হারও উচ্চতর হবে।

মন্ত্রীদের জন্য সিংহাসনাকৃতি চেয়ার পরিবর্তন করে সাধারণ চেয়ারের ব্যবস্থা করবে। মন্ত্রী যেখানেই যাবেন সেখানে দুই ডজন উচ্চ পদের কর্মকর্তা যাতে তাঁকে ঘিরে রাখতে না-পারেন সে ব্যবস্থা করবে।

প্রধানমন্ত্রী যেখানে যাবেন সেখানে যাতে সারা বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে হাজিরা দিতে না হয় তার ব্যবস্থা করবে।

তদবির মন্ত্রণালয় হবে

আমার জানা মতে সরকারের মন্ত্রীদের অফিস সময়ের একটা বড় অংশ ব্যয় হয় নিয়োগ, পোস্টিং, বদলী, পরিচিতজনকে ঠিকাদারী কাজ পাইয়ে দেয়া, গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সংগে দেখা করিয়ে দেয়া, প্রকৃত বা কাল্পনিক অবিচার থেকে রক্ষা করা, সরকারের ক্ষমতা দেখিয়ে কারো কোন কাজ উদ্ধার করে দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তদবিরের পেছনে। রাজনৈতিক সমর্থন অটুট রাখা কিংবা নতুন সমর্থন সৃষ্টি করার জন্য এ দায়িত্ব নাকি মন্ত্রী মহোদয়দের পালন করতে হয়।

"আমার দলের" মন্ত্রী মহোদয়দের এই দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ রেহাই দেয়া হবে। সকল রকম তদবির তাদের জন্য বেআইনী ঘোষণা করে দেয়া হবে। তবে তদবিরের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে প্রশাসনিক স্বীকৃতি দেয়া হবে। তদবির মন্ত্রণালয় নামে একটা পৃথক মন্ত্রণালয় খোলা হবে। এর দায়িত্ব একজন দক্ষ মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করা হবে। দেশের সর্বত্র এর অফিস স্থাপন করা হবে। এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সকল প্রকার তদবির সাদরে গ্রহণ করা হবে।

আইনের বরখেলাফ না-করে, যেসব তদবির পূরণ করা যাবে সেসব তদবিরের সুরাহা করা হবে। সকল ক্ষেত্রে তদবিরের ফলাফল যিনি তদবির করেছেন তাকে অফিসিয়ালি জানিয়ে দেয়া হবে।

সচিবদের মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা বন্ধ হবে

"আমার দল" যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেবে তখন অনেক ভাবনাচিন্তা করে মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ করবে। দলের কর্মসূচী তার কাছে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হবে। মন্ত্রণালয় থেকে দল কি আশা করে সেটা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। তিনি দলের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য উপযুক্ত হবেন কিনা সেটা যাচাই করে নেয়া হবে। একবার তাঁকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়ার পর প্রতি বছর কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। এই পর্যালোচনায় অগ্রগতি সন্তোষজনক বিবেচিত হলে সচিব মন্ত্রণালয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাবেন। মন্ত্রণালয়ে তাঁর কাজকর্মের পর্যালোচনা ব্যতিরেকে কোন সচিবকে এক মন্ত্রণালয় থেকে অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলী করা হবে না। (বর্তমানে কোন কোন মন্ত্রণালয়ে গড়ে ছয় মাস অন্তর সচিব পরিবর্তন করা হয়। গত বিশ বছরে পনেরো জন চেয়ারম্যান এসেছেন বি.এ.ডি.সি তে।)

"আমার দলের" দায়িত্ব পালন কালে মন্ত্রী এবং সচিবের মধ্যে সম্পর্ক সহজ এবং কার্যকর করার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রীর সংগে একজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হবে। এটা হবে রাজনৈতিক নিয়োগ। প্রাক্তন সচিব বা উচ্চ সরকারী কর্মকর্তা, অধ্যাপক বা বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে রাজনৈতিকভাবে বাছাই করে এদের নিয়োগ করা হবে। সাধারণতঃ যেসমস্ত বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দলকে তার নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নে সাহায্য করবেন, তাঁদের মধ্য থেকে এঁদের নিয়োগ করা হবে।

এবিষয়ে আমার ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতার কথা না বলে পারছি না। এটা পূর্ববর্তী সরকারের আমলের কথা। আমি আমার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সরকারের কাছ থেকে বহুদিন ধরে পাচ্ছিলাম না বলে মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট মাঝে মাঝে অভিযোগ করছিলাম। তিনি নিজে এব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন বলে কয়েকবার আশ্বাস দিলেন। কিন্তু তবু সিদ্ধান্ত এলো না। এটা যখন বুঝতে চাইলাম তখন মন্ত্রীর মুখেই শুনতে পেলাম সচিবের কাছ থেকে ফাইল চাইলে তিনি যদি কিছু মনে করেন সেজন্য মন্ত্রী মহোদয় ফাইল চাইতে পারছেন না। তিনি পরামর্শ দিলেন অন্য একজনকে দিয়ে ফাইলটা যেন আমি তাঁকে আনিয়ে দিই। তাহলে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবেন। মন্ত্রী মহোদয় তাঁর সকল আন্তরিকতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারেননি।

পরে শুনেছি এই মন্ত্রণালয়ের তখনকার সচিব যখন বদলী হলেন, তখন সারা কামরা ভর্তি হাজারো ফাইল সর্বত্র স্তরে স্তরে সাজানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। কামরায় আর ফাইল ধরছিল না বলে তাঁর টয়লেটে ফাইলের স্তূপ জমা করা

ছিল। কেউ অবশ্য আমাকে জানাতে পারেননি গ্রামীণ বাংকের ফাইলটি টয়লেটে পাওয়া গিয়েছিল কিনা।

সবার উপরে মানুষ সত্য

সরকারে কোন- অংশ সে অংশ যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, যদি মানুষের হয়রানীর বা অবমাননার কারণ হয়, যদি মানুষেব সৎভাবে দৈনন্দিন জীবন কাটাবার পথে বাধার সৃষ্টি করে, মানুষের সৎ জীবিকা অর্জনে সহায়ক না-হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় "আমার দলের" সরকার সে অংশ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ঘোষণা করে দেবে। তার অভাব পূরণের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। মানুষের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কাজ সমাধা করার উপযুক্ত বিকল্প কাঠামো পরবর্তীতে গড়ে তোলা হবে।

মানুযের চাইতে জরুরী, মানুষের চাইতে মূল্যবান- এ সবকারের নিকট আর কিছুই হতে পারবে না। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"- এই বাণীই হবে সরকারের মূলমন্ত্র।

পাল্টে ফেলতে পারি হতভাগা এই দেশটাকে, যদি---

"আমার দল" নিয়ে দিবাস্বপ্ন এখানেই শেষ করি। আমার মত বাংলাদেশের অসংখ্য নাগরিক তাদের নিজের নিজের তৈরী "আমার দল" নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে। প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমত একটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলি মনে মনে সাজায়। বাস্তবে যেসব দল আছে তাদের সংগে মিলিয়ে দেখে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হতাশ হয় বেমিল দেখে। আবার ফিরে যায় দিবাস্বপ্নে। মনে মনে ভাবে যদি একদিন সত্যি সত্যি আমার দিবাস্বপ্নের দলটি বাস্তবে দেখা দেয়? কী মজাই না হবে। তখন মন ভরে দেশের কাজে নামবো। পাল্টে ফেলবো আমাদের হতভাগ্য এদেশের চেহারা। দেখিয়ে দেবো বাঙালীর মাথায় কত বুদ্ধি, আর পরিশ্রম করার কী শক্তি।

বাংলাদেশের মানুষ বড় সৃজনশীল। বাংলাদেশের তরুণরা অসাধ্য সাধন করতে পারে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। শুধু দরকার সংগঠনের। শুধু দরকার মানুষকে পাগল করে দেবার মত কর্মসূচী। তাইওয়ান বাঘ হলো, কোরিয়া বাঘ হলো, চীন বাঘ হতে যাচ্ছে, ভিয়েৎনাম নাকি বাঘের পালে প্রায় ঢুকে পড়লোই বলে। বাংলাদেশের তরুণরাও এদেশকেও বাঘের বানাতে পারে যদি তাদের মুরুব্বীরা তাদের চালাতে জানে। কাজের মন্ত্র শিখিয়ে দিতে পারে। তখন বাংলাদেশের তরুণরা মাথা উঁচু করে বড় গলায় দুনিয়াকে বলতে পারবে ঃ বাঘ দেখেছো, এখনো রয়েল বেঙ্গল টাইগার দ্যাখোনি। এবার দেখাবো খন।

একূল ভাংগে ওকূল গড়ে

বাংলাদেশে নদীর একূল ভাংগে ওকূল গড়ে। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এদল ভাংগে ওদল গড়ে। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এটা গা-সওয়া ব্যাপার। এর কোনটাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে নতুন কোন বার্তা নিয়ে আসে না। দলের

ভাংগা-গড়া নিয়ে খবরের কাগজ ক'দিন গরম থাকে। তারপর আবার সব ঠান্ডা হয়ে যায়। নেতারা দল বদলায়। তার সংগে বশংবদ কর্মীরাও দল বদলায়। যে সহকর্মী বন্ধুরা তাদের সংগে দল পাল্টালো না তাদের মাথা ফাটায়, তাদের গলায় ছুরি চালায়, গোলাগুলি করে। এটাই নাকি দল ভাংগার নিয়ম। কিন্তু এত কিছু হবার পরেও রাজনীতি বদলায় না। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানুষের আশংকা কমে না, বরং বাড়ে।

গণতান্ত্রিক ফোরামের মহাসম্মেলনের আজ উদ্বোধনী দিবস। এই মহাসম্মেলনের মাধ্যমে আবারো এককূল ভাংগবে আরেককূল গড়বে। আপনারা যারা নতুন দল করবেন তাদের কাছে পথ সব ক'টাই খোলা। আপনারা রাজনীতির পুরনো খেলায় যোগ দিতে পারেন। দু'চার জায়গায় কিছুটা চমকের ছোঁয়া দিতে পারেন। দলাদলি, হানাহানির পরিচিত পথে অতিপরিচিতির আরামের মধ্যে নিজেদের ভাসিয়ে দিতে পারেন।

অথবা আপনারা বিদ্রোহী "দল" না হয়ে বিদ্রোহী "রাজনীতি" হতে পারেন। নতুন এক অচেনা পথে সাহস নিয়ে পা বাড়াতে পারেন। রাজনীতির প্রকৃত অর্থ উন্মোচনের এবং প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে পারেন।

বক্তৃতায়, সাক্ষাৎকারে অবশ্যই আপনারা নতুন রাজনৈতিক ধারার কথা বারে বারে বলবেন। আপনারা কি বলছেন সেটা মানুষ কৌতুকের সংগে খবরের কাগজে পড়বে। রাজনীতির এই পাতা বাংলাদেশের মানুষের পড়া আছে। এটা মুখস্ত সকলের।

আপনারা কী করবেন সেটাই তাঁরা যথেষ্ট সন্দেহ এবং অবিশ্বাস নিয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন।

আপনারা কি পারবেন তাঁদেরকে বিশ্বাসী করে তুলতে ? দেশের নেতৃত্বের উপর তাঁদের বিশ্বাস আবার আনতে? তাঁদের নিজেদের উপর বিশ্বাস আনতে? এদেশের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর বিশ্বাস আনতে? এদেশের ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস আনতে?

একজন অরাজনৈতিক নাগরিকের মুখে রাজনীতির কথা শোনার এই অসীম উদারতা এবং ধৈর্যের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এদেশের মানুষের শক্তির প্রস্রবণ উন্মোচনে আপনারা ব্রতী হবেন, একাজে সকল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রয়োগ করবেন এবং সফল হবেন এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

আগস্ট ২৭, ১৯৯৩ তারিখে গণতান্ত্রিক ফোরামের জাতীয় মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা।

তাহলে আমাদের কী হবে ?

এই সভার উদ্যোক্তারা আমাকে বলেছেন ঃ এটা ডাঃ ইব্রাহিমের মৃত্যু বার্ষিকীকে উপলক্ষ করে সভা বটে কিন্তু তাই বলে ডাঃ ইব্রাহিম সম্বন্ধে কথা বলতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। আপনি যে বিষয়ে বলতে চান সে বিষয়েই বলবেন।
তবু আমি ডাঃ ইব্রাহিমকে স্মরণ করেই আমার কথা শুরু করছি।

সে বাঁশী কি আর বাজে না?
ডাঃ ইব্রাহিমের সংগে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। তাঁর সংগে আমার সরাসরি পরিচয় ছিল না। পরিচয় হয়েছিল আমার ভাই ইব্রাহিমের মাধ্যমে। আমার আব্বাকে চিকিৎসার জন্য দু'বার তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুনবাগিচায় তাঁর বাড়ী আর চেম্বার দেখে অবাক হয়েছিলাম। কত সাধারণভাবে জীবন যাপন তাঁর। আব্বাকে পরীক্ষা করতে করতে অনেক কথাই হলো আমার সংগে। আব্বার ব্যাপারে রায় দিলেন আপনার কোন অসুখ নেই। আপনার বয়স আর আমার বয়স সমান। আমার চাইতে আপনার স্বাস্থ্য অনেক ভাল। চিকিৎসার কাজ শেষ করে তিনি আমাকে নিয়ে পড়লেন। ডায়াবেটিক সমিতি নিয়ে তাঁর মাথায় যত পরিকল্পনা আছে সব আমাকে বুঝাতে চাইলেন।
তাঁকে কথা দিয়েছিলাম একবার ডায়াবেটিক সমিতির কার্যক্রম দেখতে আসবো। আমার ওয়াদা রাখতে হয়েছিল তাঁরই তদবিরে। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের বহু মানুষকে তাঁর এই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে

হয়েছে। একবার আমন্ত্রণ রক্ষা করার পর দ্বিতীয়বার যাতে আবার আমন্ত্রিত না-হন সে ব্যাপারে আমার মত তাঁরাও যত্ন নিয়েছেন। কবার তাঁর হাতে পড়লে তাঁর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ কাজ ছিল না।

এই কর্মব্যস্ত মানুষটি তাঁর ভিজিটরকে কত যত্ন সহকারে ডায়াবেটিক সমিতির জন্ম থেকে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত যত কাণ্ড ঘটেছে তা সযত্নে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে ধরতেন তা বর্ণনা করে বুঝানো যাবে না। কার সংগে কী কথা হয়েছিল, কে কী লিখেছিল, কে কী সাহায্য করেছিল, সামান্য সিদ্ধান্তের পেছনে কত ধৈর্য সহকারে দিনের পর দিন ঘুরেছেন সব কথা তিনি বলতেন। শুধু মুখের বর্ণনায় নয়, কথায় কথায় লাইব্রেরীয়ানের কাছে এই বই চাচ্ছেন, ঐ ডকুমেন্ট চাচ্ছেন। আংগুল বুলাতে বুলাতে পড়ে শোনাচ্ছেন অংশ বিশেষ। এই ছবি, ঐ ছবি দেখাতেও ভুলছেন না। কেউ তাঁর কাছে মনোযোগের অযোগ্য ছিলেন না।

যেকোন সমাজের জন্য ডাঃ ইব্রাহিম ধৈর্য এবং অনড় ইচ্ছার একটি অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের একজন নাগরিক শুধু একটা ইচ্ছাকে আঁকড়ে ধরে সারা জীবনের সাধনা দিয়ে একটা অসম্ভব স্বপ্নকে যে বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারেন তিনি তার একটা উদাহরণ।

একটি রোগের দিকে একজন অবিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এটি এমন একটি রোগ যেটি নিরাময় হবার নয়। রোগকে সংগে নিয়ে রোগীকে জীবন যাপন করতে শিখতে হবে। এ-জীবনকে হতে হবে শৃংখলাবদ্ধ জীবন। এই শৃংখলা শেখাবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এই ডাক্তার।

দু'টি কারণে ডাঃ ইব্রাহিম আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তিনি প্রমাণ করেছেন একক নাগরিকের প্রচেষ্টায় জাতির জীবনে একটা বিশাল সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাঁর কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না, তাঁর কোন আর্থিক ক্ষমতা ছিল না, বিরাট রকম বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করে এবং বিদেশী পরামর্শকদের উপর ভরসা করে তিনি এমন একটি কর্মকাণ্ড গড়ে তুলেছেন তা-ও নয়। তারপরেও তিনি অত্যন্ত সফল একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশে ত বটেই, যেকোন দেশেই গর্ব করার মত এটি একটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান। আমি ইচ্ছা করেই এটাকে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বল্লাম, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বল্লাম না। কারণ যে চিকিৎসক 'শৃংখলাই জীবন' এই মূলমন্ত্র শেখানো দিয়েই রোগীর সংগে কথা শুরু করেন তিনি শুধু একটি রোগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কথা বলছেন না তিনি স্বাস্থ্যের সামগ্রিকতা নিয়ে কথা বলছেন।

দ্বিতীয় যে কারণে ডাঃ ইব্রাহিম আমাকে আকর্ষণ করেন সেটি হলো– তিনি যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন সে-প্রতিষ্ঠানটি তাঁর তিরোধানের পর ধসে পড়ে নি এবং আগমীতে ধসে পড়বে এরকম কোন লক্ষণও এখনো দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে নাকি যে ক'টি সাফল্য কাহিনী আছে তার পেছনে একক ব্যক্তিত্বই প্রধান চালিকা শক্তি। সেই ব্যক্তিত্বের অপসারণ বা তিরোধানের সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানটিও ধসে পড়ে। ডাঃ ইব্রাহিমের প্রতিষ্ঠিত ডায়াবেটিক সমিতি এটা প্রমাণ করেছে যে কথাটি সকলক্ষেত্রে সত্য নয়।

ডাঃ ইব্রাহিম একটি রোগকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সাধনার বিষয়বস্তু হিসেবে। আরো ত বহু রোগ আছে। দেশে বহু নামকরা, নাম না- করা চিকিৎসক আছেন। আরেকজন চিকিৎসক আরেকটি রোগকে কেন্দ্র করে এরকম দুঃসাহসিক কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন এরকমটি আর শোনা যায় না। ক্লিনিক হয়েছে, হাসপাতাল হয়েছে, কিন্তু 'ডায়াবেটিক সমিতি' ধরনের কিছু হয় নি। ডাঃ ইব্রাহিম যে–বাঁশীর সুর শুনেছিলেন, যে সুরের পেছনে সারা জীবন ধাওয়া করেছিলেন সে–বাঁশী কি আর বাজে না ? নাকি সে বাঁশী শোনার মত লোক আমাদের সমাজে আর নেই?

দারিদ্র সকল রোগের মূল উৎস

আমি চিকিৎসক নই। চিকিৎসার দুর্দশার সংগে পরিচিত অসংখ্য নাগরিকের মধ্যে আমি একজন। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা আমার কাছে আসে আমার নিজের কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আমার কাজ আমাকে একটা বড় রোগের সংগে পরিচিত করেছে। এই রোগটি হলো দারিদ্র। এই রোগটি বাকী সকল রোগের মূল উৎস। দেশের অর্ধেকাংশ মানুষ এরোগে আক্রান্ত। আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা বলছি, চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলছি– যেটুকুই এতে সাফল্য আসুক না কেন এই বড় রোগের নিরাময় না-হলে অন্য যেকোন রোগ আবার ফিরে আসতে বেশীক্ষণ সময় লাগবে না।

দেশের মাত্র শতকরা ২১ জন নাগরিকের নাকি সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। আমি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দোষ দিই না। আমাদের যে সংগতি তাতে হয়তো এর বেশী জনের কাছে পৌছানো সম্ভবই হবে না।

কিন্তু আমার প্রশ্ন ২১ শতাংশ নিয়ে নয়, আমার জিজ্ঞাসা 'সংস্পর্শে আসা' বিষয় নিয়ে। সারা জীবনে একবার ছোঁয়াছোঁয়ি হলেই ত সংস্পর্শ স্থাপন হলো। কিন্তু ওরকম ছোঁয়াছুঁয়িতে কার কি লাভ?

আরেকটি প্রশ্ন হলো এই ২১ শতাংশ মানুষ যাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের মধ্যে গরীব মানুষের অংশ কি পরিমাণ?

আমি কথাটি উঠাচ্ছি এজন্যে যে আমরা বলছি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ব্যবস্থা হলে দারিদ্র কমবে। গরীব যাঁদের সংগে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্পর্শ হয় সে সংস্পর্শটি কি এত আন্তরিক এবং নিবিড় হচ্ছে যার ফলে ঐ ব্যক্তির দারিদ্র নিরসনে এটা সহায়ক হবে? নাকি এই সংস্পর্শটি দারিদ্র না-ছুঁয়ে যতটুকু ছোঁয়া যায় শুধু ততটুকু পর্যন্ত?

গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে নানাধরনের গবেষণা কাজ অতীতে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। যেসব গবেষণায় জানতে চাওয়া হয়েছে ঋণ নেবার ফলে ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলিতে আয়-উপার্জনে বা সামাজিক অবস্থানে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে, সেগুলিতে যে-জবাব পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে এরকম ঃ ঋণ গ্রহণের ফলে আয় উপার্জন নিঃসন্দেহে বেড়েছে– কিন্তু যে-পরিমাণে বাড়ার সুযোগ ছিল সে পরিমাণে বাড়ে নি। এর সব চাইতে বড় কারণ স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা। নতুন উপার্জনের একটা অংশ নিয়মিতভাবে তাঁরা চিকিৎসার কাজে ব্যয় করতে বাধ্য

হচ্ছেন। পরিবারে অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। এবাবদ খরচও অব্যাহত থাকছে। আগে সংগতি ছিলো না বলে চিকিৎসা তেমন একটা হতো না, এখন সংগতি হচ্ছে এবং 'চিকিৎসা' হচ্ছে। কিন্তু ফলে আয় বৃদ্ধির গতি কমে যাচ্ছে।

একটা চমৎকার আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতো

গরীব পরিবারে তথাকথিত চিকিৎসার নামে যে-পরিমাণ ব্যয় হয় তা যদি কেউ সংগ্রহ করতে পারতো তবে সে-পয়সা দিয়ে তাঁদের সবার জন্য অত্যন্ত আধুনিক একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতো। সরকার গরীব মানুষকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিতে গিয়ে না গরীব মানুষকে চিকিৎসা সুবিধা পৌছাতে পারছে, না গরীব মানুষকে বিপুল অংকের খরচ থেকে বাঁচাতে পারছে। প্রতি পরিবারের চিকিৎসা বাবদ ব্যয়টা টাকার অংকে হয়তো খুব বিরাট কিছু নয়, কিন্তু এই খরচ পরিবারটির মোট আয়ের শতাংশ হিসেবে দেখানো গেলে চিত্রটা ভয়াবহ দেখাবে। আর এই অসংখ্য ছোট ছোট ব্যয় একত্র করলে এটা একটা বিরাট ব্যয়ে পরিণত হয়ে পড়ে।

আরেকটা দিক হলো এই বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করে গরীব মানুষ যে চিকিৎসা পাচ্ছেন সেটা আসলে চিকিৎসার নামে ভাওতাবাজী,প্রচণ্ড প্রহসন মাত্র। এই প্রহসন সারা দেশময় ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে আছে নকল ডাক্তার, নকল ওষুধ, ভেজাল ওষুধ, তারিখ পার হয়ে যাওয়া ওষুধ, হাসপাতাল থেকে পাচার হয়ে যাওয়া ওষুধ ইত্যাদি।

গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের 'ষোল সিদ্ধান্ত'

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যেমনঃ বি.আই.ডি.এস. ইউনিসেফ, নিপোর্ট ইত্যাদি) গবেষণা থেকে জানা যায় গ্রামীণ ব্যাংকভুক্ত পরিবারগুলির স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা গ্রামীণ ব্যাংকভুক্ত নন এমন পরিবারগুলির অবস্থার চাইতে ভাল। পুষ্টির দিক থেকে অবস্থা উন্নততর,শিশু মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কম, বসতবাটির অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর, স্যানিটেশান অবস্থা ভাল, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে বেশী ইত্যাদি।

গ্রামীণ ব্যাংক তার প্রারম্ভকাল থেকে ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করে এসেছে। এই প্রচেষ্টারই ফসল হিসেবে জন্মলাভ করেছে 'ষোল সিদ্ধান্ত' নামে গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের বহুল পরিচিত কিছু অংগীকার। ষোল সিদ্ধান্তের প্রথম সিদ্ধান্তটি ডাঃ ইব্রাহিমের মতই শৃংখলা বিষয়ক। এই সিদ্ধান্তটি হচ্ছে ঃ 'শৃংখলা, একতা, সাহস ও পরিশ্রম- গ্রামীণ ব্যাংকের এই চার নীতি কেন্দ্রের সদস্যদের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি কাজে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলবো।'

এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত সিদ্ধান্ত নয়। এগুলি সদস্যদের অসংখ্য স্থানীয় কর্মশালায় আলোচিত হয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে এসেছে। এই ষোলটি সিদ্ধান্ত এক সংগেও গৃহীত হয় নি। বছর বছর কর্মশালার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে আগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পরের সিদ্ধান্ত

যুক্ত হয়েছে। এখন ষোলটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে। মনে রাখার সময় অসুবিধে হবে বলে এখন থেকে জাতীয় পর্যায়ে আর কোন নতুন সিদ্ধান্ত এই তালিকায় যোগ না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে সদস্যগণ নতুন নতুন সিদ্ধান্ত যোগ করতে পারেন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে পারেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৬ লক্ষ। তাঁদের মধ্যে ৯৪ শতাংশই মহিলা। গ্রামীণ ব্যাংক ১০৩৪টি শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশে ৩৩,০০০ গ্রামে কাজ করে। ব্যাংকের ১৬ লক্ষ সদস্যের সকলেই ষোল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি হলো এইরকম ঃ

৩ নং সিদ্ধান্ত ঃ ভাংগা ঘরে থাকবো না। ভাংগা ঘর মেরামত করবো। যততাড়াতাড়ি পারি ভাল দেখে নতুন ঘর বানাবো।

৪ নং সিদ্ধান্ত ঃ সারা বছর ধরে সব্জি চাষ করবো। নিজেরা খাবো। বাড়তি সব্জি বিক্রি করে আয় বাড়াবো।

৬ নং সিদ্ধান্ত ঃ পরিবার ছোট রাখবো। খরচ কমাবো। স্বাস্থ্য ভাল রাখবো।

৮ নং সিদ্ধান্ত ঃ ছেলেমেয়ে বাড়ী-ঘর সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো।

৯ নং সিদ্ধান্ত ঃ গর্ত করে পায়খানা বানাবো।

১০ নং সিদ্ধান্ত ঃ টিপকলের পানি খাবো। টিপকল না-থাকলে ফিটকিরি দিয়ে পানি খাবো, কিংবা পানি সেদ্ধ করে খাবো।

১৬নং সিদ্ধান্তঃ কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যায়াম চালু করবো। সকল সামাজিক কাজ একসংগে করবো।

এই সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শাখায় শাখায় কেন্দ্র প্রধানদের নিয়ে নিয়মিত কর্মশালা করা হয়। বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তার কয়েকটা নমুনা উল্লেখ করছি।

পঞ্চাশ কোটি টাকার নলকূপ ঋণ

অপুষ্টি এবং ভিটামিন 'এ'-এর অভাব দূর করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদেরকে সব্জি চাষ করে এবং সব্জি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য উন্নতমানের সব্জি বীজ শাখার মাধ্যমে সদস্যের নিকট বিনা লাভে বিক্রি করে। এ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক সদস্যদের নিকট ৫৫ লক্ষ টাকার সব্জি বীজ বিক্রি করেছে (৫০টন বীজ)।

গলগণ্ড রোগ প্রতিরোধ করার জন্য এ-পর্যন্ত ৫০৬ টন আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রি করেছে। পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ৩৫ টন ফিটকিরি এক টাকার প্যাকেট বানিয়ে বিক্রি করেছে। এক টাকার এক প্যাকেট ফিটকিরি দিয়ে ৫ সদস্যের একটি পরিবারের এক মাসের খাবার পানি বিশুদ্ধ করা যায়।

ডায়রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য ১০ লক্ষ খাবার স্যালাইন বিক্রি করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সকল সদস্য এবং তাঁদের ছেলেমেয়েদের লবণ-গুড়ের শরবৎ

তৈরী করার ফরমুলা শেখানো হয়। ব্যাংকের পাস বইয়ের জ্যাকেটে এই ফরমুলা রঙিন ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দেয়া থাকে। কেউ ভুলে গেলে যেন মনে করে নিতে কোন অসুবিধা না হয়। গ্রামীণ ব্যাংক সকল সদস্য এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের ডায়রিয়ার ছড়া শিখিয়ে দেয়। ছড়াটি এরকম ঃ

আধাসের ভাল পানি
যতন করি মেশাও আনি
চিমটা লবণ মুঠা গুড়
খাইয়া আপদ কর দূর।

গ্রামীণ ব্যাংক খাবার পানির সমস্যা দূর করার জন্য টিউবওয়েল বসানোর জন্য সদস্যদেরকে ঋণ দেয়। এ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণে সদস্যদের বাড়ীতে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণে সদস্যরা এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ১৫ হাজার টিনের ঘর নির্মাণ করেছে। এই ঘরগুলির সংগে একটি স্যানিটারী ল্যাট্রিন বসানোর জন্য ঋণ দেয়া থাকে। গৃহ ঋণ বাবদ গ্রামীণ ব্যাংক এ পর্যন্ত ২৪০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।

যাঁরা গৃহ ঋণ নেন নি তাঁদেরকেও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য পৃথক ঋণ দেয়া হয়। এই পৃথক ঋণ দিয়ে এ পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশী স্যানিটারী ল্যাট্রিন বসানো হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যাদের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত ৮৮০ জনকে ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

এতসব উল্লেখ করলাম এজন্য যে এত আয়োজন হলো, তাছাড়া ঋণ বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জন বাড়লো, তার কারণে খাবারের নিশ্চয়তা এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পেলো, স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো, তা সত্ত্বেও গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের আর্থিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে চিকিৎসা খাতে ক্রমাগত ব্যয়। এর মাধ্যমে আন্দাজ করা যায় স্বাস্থ্য খাতে আমরা কত বড় একটা শূন্যতার মধ্যে আছি।

স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সিরিয়াস হতেই হবে।

দারিদ্র নিরসন করার ব্যাপারে যদি আমরা সিরিয়াস হই তবে স্বাস্থ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সিরিয়াস হতেই হবে। বর্তমানে যেভাবে আমরা চলছি সেভাবে চলতে দেয়ার কোন উপায়ই নেই।

দেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক সূচক ও পরিসংখ্যানগুলি দেখলে কোন সচেতন নাগরিক মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারবেন না। প্রতিবেশী দেশগুলির সংগে নিজেদের তুলনা করলে নিজের মনে ধিক্কার জন্মায়। ছোট দেশ শ্রীলংকা কী-ই না কৃতিত্ব দেখিয়েছে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে। অথচ দেশটায় যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। যখন-তখন যেকোন জায়গায় হামলা হচ্ছে। দেশের মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, সামরিক নেতা, এমনকি

প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত প্রাণ দিতে হচ্ছে এই যুদ্ধে। অথচ অন্য যুদ্ধ কিন্তু থেমে নেই। মানুষকে গড়ে তোলার যুদ্ধে তারা বহু দেশের মধ্যে অগ্রগামী রয়েছে।

শ্রীলংকাকে দেখে মনে সাহস হয়। তাদের জন্য গর্ব অনুভব করি। হাজার হোক তারা আমাদেরই জ্ঞাতিভাই, জ্ঞাতিবোন। বাংলাদেশ থেকেই ত তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সেই দ্বীপে বসত গড়েছিল। তারা যে কৃতিত্ব দেখাচ্ছে আমরাও সে কৃতিত্ব দেখাতে পারবো নিশ্চয়ই।

কিন্তু কবে পারবো? গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা থেকে যখন খবর আসে আমাদের আরো একজন সদস্য কিংবা আরো একজন মহিলা কর্মী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তখন মন ভেংগে পড়ে। আর মনকে প্রবোধ দেয়া যায় না। আরো একটি অহেতুক মৃত্যুকে আমরা ঠেকাতে ব্যর্থ হলাম।

শিশু মৃত্যুর খবর আরো বেশী। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়েসী শিশুর মৃত্যুর হার হাজারে ১৩৩ জন। শ্রীলংকায় এই সংখ্যা মাত্র ২১। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে শ্রীলংকার প্রতি। শিশু মৃত্যুর হার থেকে অনেক খবর পাওয়া যায়। অনেকগুলি অবস্থা মিলে শিশুর মৃত্যু ঘটায়। শিশুর মৃত্যুর হার কমবেশী দেখে আঁচ করা যায় একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষার ব্যাপকতা, অপুষ্টির ব্যাপকতা, স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা, স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা, পানীয় জলের প্রাপ্যতা, সমাজে মহিলাদের অবস্থান ইত্যাদি।

শিশুদের পুষ্টি বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে প্রায় নিম্নতম অবস্থানে আছে। বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়েসী শিশুদের মধ্যে প্রতি তিনজনের দুইজন অপুষ্টির শিকার। অর্থাৎ তিনজনের মধ্যে দুইজনের ওজন স্বাভাবিক ওজন থেকে কম।

প্রতি লক্ষ শিশুর জন্মদানকালে বাংলাদেশে ৬০০ মায়ের মৃত্যু হয়। শ্রীলংকায় মৃত্যু হয় মাত্র ৮০ জনের। বাংলাদেশে যেখানে প্রতি মিনিটে সাতটি শিশুর জন্ম হয়, সেখানে প্রতি বিশ মিনিট অন্তর সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে একজন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে।

কী পদক্ষেপ নিলে আমরা এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি থেকে বের হবার পথ খুঁজে পেতে পারি?

সরকারী পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে যে-ব্যয় করা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য সরকারের যে অবকাঠামো আছে তার মাধ্যমে বর্তমানে যে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হচ্ছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশী স্বাস্থ্য সেবা দেয়া সম্ভব– এবক্তব্যের সঙ্গে আমার মনে হয় না বাংলাদেশের কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন। আমার মনে হয় এখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হতে পারে। কী কী পদক্ষেপ নিলে এটা হতে পারে আমরা তা বের করতে পারি এবং সেগুলি করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ নিতে পারি।

শুধু একটা ব্যাপারে শক্ত হতে পারলেই অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়া যাবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যিনি যে– দায়িত্ব পালন করার কথা তিনি অবশ্যই সে দায়িত্ব পালন করবেন, যাঁর যা করার কথা নয়, তিনি কিছুতেই সেটা করতে পারবেন না,

যাঁর যা পাবার কথা, তিনি তা অবশ্যই পাবেন, যাঁর যা পাবার কথা নয় তিনি তা কিছুতেই পাবেন না।

এটা কি খুব বেশী চাওয়া হলো ?

অনেক পরিবর্তন দরকার

আমাদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে দ্রুত, নিশ্চিত এবং ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য করণীয় অনেক। দেশের সকল মানুষ এই পরিবর্তনের অপেক্ষায় দিন গুনছে। দেশের নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসকরা এই পরিবর্তনের পথ চেয়ে আছেন।

আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে এটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা না-হয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমাদের মন্ত্রণালয়কে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় না-বলে চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বললে যেন বর্তমান কার্যক্রমের সঙ্গে অনেক সঙ্গতিপূর্ণ নাম হতো। আমরা স্বাস্থ্যের সূচকের দিকে নজর না–রেখে রোগীর সংখ্যা গুনছি। চিকিৎসা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাকে অবহেলা করার কথা কেউ চিন্তাই করতে পারে না। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় বলেই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগীর সৃষ্টি হয়। যেখান থেকে রোগের সৃষ্টি হচ্ছে সেখানেই বেশী করে মনোযোগ দিতে হবে।

যে-সেবা বিনামূল্যের সেটা গরীব পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না

স্বাস্থ্য সেবাকে বিনামূল্যে দেয়ার যৌক্তিকতা দেখানো হয় এই বলে যে গরীব মানুষ পয়সা দিয়ে এই সেবা গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু এ-কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, যে-সেবা বিনামূল্যে দেয়া হয় সেটা গরীব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। যে-সেবা বিনামূল্যের তার মধ্যে জবাবদিহিতার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। বিনামূল্যের সেবা করুণার বিষয়ে পরিণত হয়– এতে গরীব মানুষ দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সমাজের ভাগ্যবানদের দাবী করার জোর এত বেশী যে গরীবরা সেখানে ঠাঁই পায় না।

বিনামূল্যে সরকার বহু নলকূপ বিতরণ করেছে। এই নলকূপের কোনটা কোন গরীব মানুষের বাড়ীতে বসেছে এ-দাবী কেউ করতে আসবে না। গ্রামীণ ব্যাংক নলকূপ বসানোর জন্য ঋণ দিচ্ছে বলে ৫০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বাজার মূল্যে নলকূপ কিনে পৌনে দু'লক্ষ ভূমিহীন পরিবার তাঁদের বাড়ীতে নলকূল বসাতে পেরেছেন। তিন লক্ষ ভূমিহীন পরিবার এপর্যন্ত তাঁদের বাড়ীতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বসাতে পেরেছেন। প্রতি সপ্তায় আরো নতুন নতুন ভূমিহীন পরিবারে নলকূপ বসছে, স্যানিটারী ল্যাট্রিন বসছে এ-ঋণের মাধ্যমে। বিনামূল্যে হলে এটা তাঁদের বাড়ীতে বসতো না।

দেশের মানুষকে আমি বিষয়টা ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা রাজনীতির উপজীব্য বিষয় হতে পারলো না

আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক চেতনাবোধের মধ্যে স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাচ্ছে না। নিজেদের দল ক্ষমতায় গেলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে কী কী কর্মসূচী গ্রহণ করবে,শিক্ষা ব্যবস্থাকে কীভাবে পুনর্বিন্যাস করবে এ বিষয়ে কোন রাজনৈতিক দলের কোন বক্তব্য নেই। "সকলের জন্য শিক্ষা," "সকলের জন্য স্বাস্থ্য"– এ-জাতীয় কিছু ঢালাও কথার বাইরে কোন বিবরণ দেল না। ভোটারদের পক্ষে দল বাছাই করার সময় এসব বিষয়ে দলের নীতি বিবেচনা করার কোন সুযোগ হয় না। এমন কোন দল নেই যারা এগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নিয়ে এসে নাগরিকদের কাছ থেকে সমর্থন চায় যদি চাইতো তবে আমার মনে হয় রাজনীতিকে মানুষ আরো কাছের জিনিস মনে করতে পারতো এবং তাতে মনোযোগী হবার কারণ খুঁজে পেতো।

যতদিন স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা রাজনীতির উপজীব্য বিষয় হয়ে না–উঠবে ততদিন এর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে না। এখন যা কিছু পরিবর্তন আসে তা আসে দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শকদের সৌজন্যে। এতে আমাদের কোন ভূমিকা নেই।

স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাকে রাজনীতির প্রাসঙ্গিক বিষয় করে তোলার একটা নিশ্চিত পদক্ষেপ হচ্ছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় সরকারের আওতাধীন বিষয়ে পরিণত করে দেয়া। থানা পর্যায়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে তুলে তাদের হাতে এই দু'টি বিষয় তুলে দেয়া যায়।

স্বাস্থ্যের বর্তমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে আমি আমার নিজের কিছু ধারণার কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। কিন্তু আমি মনে করি না আমার কথাই শেষ কথা। এর চাইতে আরো ভাল কার্যকর ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। কিন্তু যে–ব্যবস্থাই হোক সেটা গ্রহণ করার সময় এসে গেছে। আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না।

মূল রোগের মূল ওষুধ কর্ম-সংস্থান

যে মূল রোগের কথা বলতে গিয়ে এত কথার মধ্যে এসে গেলাম সে মূল রোগের কাছে ফিরে যাই। দারিদ্রই আমাদের মূল রোগ। দারিদ্র থেকে আমাদের নিরাময় চাই। এই নিরাময় পেতে হলে স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে, শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, উপার্জন নিশ্চিত করতে হবে। উপার্জনের জন্য চাই কর্মসংস্থান।

কর্মসংস্থান দু'রকমের হতে পারে। আত্ম-কর্মসংস্থান আর মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান।

আত্ম-কর্মসংস্থান খুবই সোজা কাজ। বিরাট অংকের টাকার প্রয়োজন হয় না এধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে। মাথাপিছু খুব অল্প টাকার বিনিময়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু এর জন্য আর্থিক শৃংখলা দরকার। আর্থিক শৃংখলা মানতে জানে, এরকম আর্থিক প্রতিষ্ঠান দরকার বর্তমান যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে তার মাধ্যমে গরীব মানুষ বা বেকার যুবককে ঋণ দেয়ার নিয়ম

নেই। গরীব মানুষকে এবং বেকার যুবককে ঋণ দিতে পারে সেরকম নতুন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের গরীব মানুষকে ঋণ দিয়ে প্রমাণ করেছে এটা কোন আজগুবী চিন্তা নয়। টাকার অভাবে যে গরীব মানুষ কোন উপার্জনের কাজে হাত দিতে পারছেন না-গ্রামীণ ব্যাংকের মারফরত তিনি ঋণ নিতে পারেন। সে ঋণ আবার তিনি নিয়মমত, সময়মত ফেরতও দিয়ে দিচ্ছেন। গ্রামীণ ব্যাংকের সকল ঋণের আদায়ের হার ৯৮ শতাংশেরও বেশী।

এরকম ঋণ কর্মসূচী আরো আছে। সরকারী কর্মসূচী আছে। বেসরকারী কর্মসূচী আছে। বেসরকারী কর্মসূচীর আয়তন বেশ বড়। ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা, স্বনির্ভর ইত্যাদি ছাড়াও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশানের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে এখন ৮৬টি বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গরীবদেরকে ঋণ দিচ্ছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যরা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে এখন একশ' কোটি টাকারও বেশী ঋণ নিচ্ছেন। আবার সাপ্তাহিক কিস্তিতে নিয়মিতভাবে এই ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। এধরনের ঋণ কর্মসূচীর পেছনে সরকারের আরো সমর্থন ও সহানুভূতি প্রয়োজন। সরকারী ব্যাংকগুলিকেও সরকার একাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। শুধু গরীবকে ঋণ দেয়ার জন্য আরো নতুন নতুন ব্যাংক সৃষ্টি করার জন্য সরকার বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করতে পারে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থবিরতা কাটছে না

আত্ম-কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিরাট আয়তনে মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের আয়োজন করতে হবে। কিন্তু দেশের অসংখ্য বেকার মানুষের (মহিলা ও পুরুষ) কর্মসংস্থান করতে হলে যে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন সেটার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

অর্থনীতি এখন হিমশীতল অবস্থায় আছে। আমাদের অর্থমন্ত্রীর নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতির স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। শিল্পে বিনিয়োগের জন্য পুঁজি সরবরাহে উদ্যোগী হবার জন্য অর্থমন্ত্রী মহোদয় বহুবার ব্যাংকারদের সংগে বৈঠক করেছেন, সুদের হার কমাবার জন্য চাপ দিয়েছেন। সুদের হার কমেছে, ব্যাংকাররা উদার হবার চেষ্টা করছেন-কিন্তু বিনিয়োগের ঢেউ উঠছে না। দেশী বিনিয়োগকারীরা যেখানে বিনিয়োগ করতে পা বাড়াচ্ছেন না, সেখানে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কি দোষ দেবো ?

এই স্থবিরতার নানা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া হচ্ছে। নানা প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হচ্ছে। কোনটাই ফেল্‌না ব্যাখ্যা নয়। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই শেষ ব্যাখ্যা নয়। কেউ বলছেন বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছে। সে মন্দার রেশ আমাদের উপর এসে পড়েছে।

কিন্ত আশেপাশে তাকিয়ে দেখলে এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে মনে একটা সায় পাওয়া যায় না। ইউরোপ-আমেরিকাতে মন্দা চললেও সিংগাপুর,চীন,মালয়েশিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, তাইওয়ানে বিপুল অংকের বিনিয়োগে কারো কোথাও

আটকাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ এই এগারো বছরের বার্ষিক গড় বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণের দিকে তাকালে এই কথাটা পরিস্কার বোঝা যাবে। এই মেয়াদকালে সিংগাপুরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে বছরে ২.৩ বিলিয়ন ডলার হারে। অন্যান্য দেশগুলিতে এই বিনিয়োগের বার্ষিক হার ছিলঃ চীনে ১.৭ বিলিয়ন ডলার, মালয়েশিয়ায় ১.১ বিলিয়ন ডলার, হংকং এ ১.১ বিলিয়ন ডলার,থাইল্যান্ডে ০.৭ বিলিয়ন ডলার, তাইওয়ানে ০.৭ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় এই একই মেয়াদকালে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে সেটার পরিমাণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের তুলনায় নেহাতই খুচরো পয়সার মত। দক্ষিণ এশিয়ার এই চার দেশের মধ্যে আবার বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ অতি তুচ্ছ। আশির দশকে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ এই চারটি দেশে হয়েছে তার বাৎসরিক গড় পরিমাণ– ভারতে ৫০ মিলিয়ন ডলার, পাকিস্তানে ৪২ মিলিয়ন ডলার, শ্রীলংকায় ৪১ মিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশে মাত্র ১.৭ মিলিয়ন ডলার।

লক্ষণীয় যে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার ব্যাপারে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির চাইতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি অনেক পিছিয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ায় তিনটি অগ্রগামী দেশের মধ্যে আয়তনে এবং জনসংখ্যায় বিপুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে প্রায় একই কাতারে ছিল। বাংলাদেশ এই তিন দেশের কাতার থেকে দূরে বহু পেছনে পড়ে আছে।

ভারতে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে সেটা প্রথম দিকে পুরোপুরি (৯৫%) পশ্চিমা দেশগুলি থেকে এসেছে। আশির দশকের শেষের দিকে ভারতে জাপানী বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়তে আরম্ভ করেছে।

পাকিস্তানে বৈদেশিক বিনিয়োগের ৮৬ শতাংশ এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। শ্রীলংকায় বৈদেশিক বিনিয়োগের ৭৫ শতাংশ এসেছে পূর্ব এশিয়ার নব রূপান্তরিত অর্থনৈতিক ব্যাঘ্র রাষ্ট্রসমূহ থেকে। বাংলাদেশে যেটুকু অল্পসামান্য বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে তার প্রায় পুরোটাই পূর্ব এশিয়ার এই নতুন ব্যাঘ্র অর্থনীতিগুলি থেকে।

ভারতে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে তার ৯০ শতাংশ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের দিকে গেছে। মাত্র ৫ শতাংশ গেছে সার্ভিস খাতে। পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার অর্ধেক বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে সার্ভিস খাতে। পাকিস্তানে এই বিনিয়োগ হয়েছে প্রধানতঃ হোটেল ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে, শ্রীলংকায় বাণিজ্য, পর্যটন ইত্যাদিতে। বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের ৪১ শতাংশ গিয়েছে সার্ভিস খাতে, ৩৪ শতাংশ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে। শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে যা বিনিয়োগ হয়েছে সেগুলি মূলতঃ রফতানী প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজেই হয়েছে।

ভারত বাংলাদেশের জন্য নতুন “মধ্যপ্রাচ্য” হতে যাচ্ছে

ভারতে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত তার দীর্ঘকালের নীতিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। ভারত তার বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছে। '৯১ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে '৯২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বারো মাস সময়ে ভারত ১.২৩ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে। যদি এই অনুমোদনপ্রাপ্ত ১২৩০ মিলিয়ন ডলারের অর্ধেক বিনিয়োগও সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হয় তবে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৬১৫ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ পুরো আশির দশকের দশ বছরে যে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে তার চাইতেও বেশী।

এই গতি যদি অক্ষুণ্ন থাকে তবে চীন, কোরিয়া, তাইওয়ানের পথে এগিয়ে যেতে ভারতের আর বেশী সময় নেবে না। ভারত ২০০০সালের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য “নতুন মধ্যপ্রাচ্য”কিংবা “নতুন মালয়েশিয়া” হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

শ্রীলংকা আর বাংলাদেশের মধ্যে মিল এবং গড়মিল

শ্রীলংকার আর বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল, অনেক বিষয়ে গড়মিল। মিলটি হলো দু'টো দেশেই শিল্পের ভিত তৈরী হয় নি। কাজেই শিল্পখাতে উভয় দেশকে যাত্রা শুরু করতে হয় রফতানী প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্য দিয়ে। বৈদেশিক বিনিয়োগের দ্বিতীয় খাত খুঁজে বের করতে হয় সার্ভিস সেক্টরে।

শ্রীলংকার সঙ্গে বাংলাদেশের গড়মিলগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে শ্রীলংকার মানুষ শুধু সার্ক দেশগুলি নয়– দুনিয়ার বহু দেশ থেকে এগিয়ে। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শ্রীলংকায় শিক্ষার হার ৮৭ শতাংশ। বাংলাদেশ এই দু'টি ক্ষেত্রে দুনিয়ার সকল দেশের মধ্যে একেবারে পেছনের সারিতে।

নতুনতর প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শ্রীলংকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যত তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে পারবে বাংলাদেশের নিরক্ষর মানুষ তত তাড়াতাড়ি রপ্ত না-ও করতে পারে। ধৈর্যহীন বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা যদি এই দু'দেশের মধ্যে বাছাই করার সময় শ্রীলংকার দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তাদের দোষ দেয়া যাবে না।

শ্রীলংকার দুর্ভাগ্য যে তারা একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে পড়ে গেছে। এর শেষ এখনো দেখা যাচ্ছে না। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের শ্রমিক অসন্তোষ, হরতাল এবং সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রতি তুলনামূলকভাবে আগ্রহের অভাব–এই চিত্রটি রাখা হলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে শ্রীলংকা আবারও আকর্ষণীয় দেশ হিসেবে এগিয়ে আসে।

আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা এবং দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ শ্রীলংকার সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে। এটা দক্ষিণ এশিয়ার সকল রাষ্ট্রের জন্যই প্রযোজ্য। আমরা কেউ এখনো প্রশাসন যন্ত্রের যন্ত্রণা থেকে মানুষকে রেহাই দেবার ব্যাপারে কোন

উদ্যোগ নিই নি। ভারত এটা সহজে পারবে বলেও মনে হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুযোগই সবচাইতে বেশী। ব্যবস্থাপনায় দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য একটি প্রশাসন কাঠামো গড়ে তুলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

বিনিয়োগকারীদের উৎসাহের রস নিংড়ে নেয়া হয়

অভিযোগ আসে বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক মাড়াই-যন্ত্রে দেশী-বিদেশী সকল বিনিয়োগকারীরই উৎসাহের রস নিংড়ে নেয়া হয়। একবার এর পাল্লায় পড়লে বিনিয়োগ করার ইচ্ছা আর অবশিষ্ট থাকে না। বিনিয়োগের ঠেকাটা যেন শুধু বিনিয়োগকারীর। সরকারী যন্ত্র যেন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পোষণ করা হচ্ছে তাকে নানা রকম আর্থিক এবং মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে ক্রমাগত জর্জরিত করার জন্য।

এর সঙ্গে যখন যুক্ত হয় কাস্টমস, অন্যান্য কর আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, পুলিশ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, পরিবহন বিভ্রাট, দুর্নীতি, ঘন ঘন হরতাল, মাস্তানদের উৎপাত, ট্রেড ইউনিয়নের নাম ভাঙ্গিয়ে একশ্রেণীর শ্রমিক ও শ্রমিকনেতার মাস্তানী ইত্যাদি তখন বিনিয়োগের বাপের নাম ভুলে যেতে ইচ্ছা করে।

এরপরেও যারা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসেন তাদের সম্বন্ধে মনে শ্রদ্ধাটা আগে না–জেগে, সন্দেহটাই জেগে বসে। সন্দেহ জাগে তারা হয়তো অন্য মতলব নিয়ে এসেছেন। বিনিয়োগের ছদ্মবেশে তারা কি ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ করার জন্য এসেছে? তারা কি আন্ডার-ইনভয়েসিং,–ওভার-ইনভয়েসিং এর খেলায় নামার জন্য এসেছে? তারা কি সম্পদ-পাচারের উদ্দেশ্যে এসেছে ?

কমিউনিস্ট দেশ চীন তার দরজা খুলে দিয়েছে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য। সাদরে ডেকে আনছে দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীদের। তার বিপ্লবী তত্ত্বগুলি সরিয়ে রেখেছে, জঙ্গী ভাষাকে মোলায়েম করে নিয়েছে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের মন–তুষ্টির জন্য। ফলে এখন তার বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চল্লিশ বিলিয়ন ডলারে। পাইপ লাইনে রয়েছে আরো বহু বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ। ভারতে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ এপর্যন্ত মাত্র আধা বিলিয়ন ডলার, আর বাংলাদেশে ১৭ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগে ঢেউ উঠবে কি, বরং দেশ থেকে উল্টো বহুদিনের পুরনো কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী ব্যবসা গুটিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমাদের উপায় কি?

তাহলে আমাদের উপায় কি?

উপায় একটাই। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শক্ত হাতে পরিস্থিতির হাল ধরতে হবে। কোথাও কোন ঢেউ না-তুলে আলগোছে নৌকায় বসে থেকে এক নির্বাচন থেকে আরেক নির্বাচনে পাড়ি দেয়া দলীয় দিক থেকে বাহবা পাবার মত একটা কৌশল হতে পারে, কিন্তু নৌকার অসংখ্য যাত্রী, যারা পাটাতনের নীচে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর, তাদের জন্য এটা একটা আশার কথা হতে পারে না।

দেশে এখন একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। একটা স্বৈরাচারী সরকারকে প্রবল আন্দোলনের মুখে উৎখাত করে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এক নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন। এই সরকারের মেয়াদকাল অর্ধেক পার হয়ে গেছে। সরকারকে দেশের নীচের অর্ধেকাংশ মানুষকে দুর্বিসহ দারিদ্রের যন্ত্রণা এবং অবমাননা থেকে মুক্তি দেবার জন্য এখন তিনটি ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকার যত বেশী দৃঢ়তার পরিচয় দেবেন তত সহজে সরকার এর বিরোধিতাকারীদের প্রতিহত করতে পারবেন। এই তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে ঃ কর্মসংস্থান (আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থান), গরীবের জন্য স্বাস্থ্য এবং গরীবের জন্য শিক্ষা।দারিদ্র নিরসনের জন্য তিনটি বিষয়ই অতি গুরুত্বপূর্ণ। তবু আমি এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্বের ক্রম অনুসারে এভাবে সাজাতে চাই ঃ (১) কর্মসংস্থান (২) গরীবের জন্য স্বাস্থ্য এবং (৩) গরীবের জন্য শিক্ষা। কেউ যদি অন্য কোন ক্রম পছন্দ করেন তবে আমি এনিয়ে তাঁর সঙ্গে বিতর্কে নিয়োজিত হয়ে সময় নষ্ট করবো না।

দারিদ্র-নিরসনের কথা বললে এই তিনটি বিষয়কেই বোঝাতে হবে। অন্য কথা টেনে এনে বিষয়টাতে যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলা না-হয়।

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় দেশের মানুষের কাছে, বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল দলের নেত্রীর আপোষহীন দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য। তিনি তাঁর আপোষহীনতা দলের কর্মীদের মধ্যে সঞ্চার করতে পেরেছিলেন বলে সেটা দলীয় আপোষহীনতায় পরিণত হয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর দলের নেত্রীর আপোষহীনতা শুধু ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। তিনি তাঁর সে আপোষহীনতা আবার দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করলে দেশের সকল মানুষকে সঙ্গে পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তাঁর এই আপোষহীনতা অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে,অত্যন্ত আন্তরিকভাবে, অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এবং পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা দিয়ে প্রকাশিত হোক দারিদ্রের বিরুদ্ধে, যেসমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন এবং নীতিমালা দারিদ্র সৃষ্টি করেছে এবং দারিদ্র পোষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে।

স্বৈরাচারের পতনের জন্য তিনি তাঁর রাজনৈতিক দলকে যেভাবে সংগঠিত করেছিলেন একই সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি এখন তাঁর দলকে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে পারেন। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যেরকম অন্য সকল দলের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন একইভাবে দারিদ্র নিরসনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার ক্ষেত্র রচনা করতে পারেন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কৃতিত্ব দেখানোর জন্য দলের নেত্রী যেভাবে তাঁর সহকর্মীদের পুরস্কৃত করেছেন, যারা আন্দোলনে মুখ লুকিয়ে ছিল তাদের তিরস্কৃত করেছিলেন, তেমনি দারিদ্র নিরসনের কাজে যেসকল সহকর্মী কৃতিত্ব দেখাবেন এবং দেখাতে ব্যর্থ হবেন তাঁদেরকে পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করবেন।

ক্ষমতায় আসার পর শুধু সফলভাবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঠেকানো বা বেকায়দায় ফেলানোর প্রতিভাই যেন সহকর্মীদের পুরস্কৃত করার মাপকাঠি হয়ে না-দাঁড়ায়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সহকর্মীরা

কৃতিত্ব দেখাবেন তাঁদের তিনি রাজনৈতিকভাবে পুরস্কৃত করবেন–যাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারলেন না তাঁদেরকে রাজনীতির পেছনের সারিতে ঠেলে দেবেন। একটা হাসপাতালকে, একটা থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র কিংবা একটা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সত্যিকারভাবে গরীব মানুষের স্বাস্থ্যের চিকিৎসার কাজে বাস্তবে নিয়োজিত করার সাফল্যের জন্য, কিংবা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাদানের কাজে সারা বছর বিরামহীনভাবে নিয়োজিত রাখার সাফল্যের জন্য, কিংবা বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করে বিনিয়োগকারীকে সংগ দিয়ে তার পথের সকল আমলাতান্ত্রিক ও মাস্তানতান্ত্রিক বাধা ডিংগিয়ে সফলভাবে বিনিয়োগ সম্পাদন করে উৎপাদনে নিয়ে আসার জন্য, কিংবা একজন রফতানীকারকের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি করে দেবার জন্য রাজনৈতিকভাবে সহকর্মীরা যদি পুরস্কৃত হতে থাকেন তবে দলের মধ্যে এসব কাজে উৎসাহের সৃষ্টি হবে বৈকি। এতে দলের ভেতরে কাজের লোকেরা প্রথম সারির দিকে আসার সুযোগ পাবে, কথার মার-প্যাঁচের শিল্পীরা পেছনের দিকে পড়তে আরম্ভ করবে।

সুদৃঢ় রাজনৈতিক উদ্যোগই আমাদের একমাত্র পথ

সমাজের বিরাট বাধাকে জয় করার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন লাগে। রাজনৈতিক আন্দোলন লাগে। যেমন লাগে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। যেমন লাগে স্বৈরাচারী সরকারকে সরানোর জন্য। সমাজকে অর্থনীতির এক স্তর থেকে আরেক স্তরে নিয়ে যাবার জন্যও রাজনৈতিক সংগঠন লাগে। আন্দোলন লাগে। তবে এই আন্দোলনের আংগিক ভিন্ন। আইন অমান্য আন্দোলন করে স্বাধীনতা আন্দোলন করা যায়, স্বৈরাচারের পতন ঘটানো যায়. কিন্তু অর্থনীতিকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে যাওয়ার কাজে এই আংগিক লাগসই নয় মোটেই।

সুদৃঢ় রাজনৈতিক উদ্যোগই আমাদের একমাত্র পথ। অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের বড় নিয়ামক শক্তি একটা উদ্যোগী রাজনৈতিক দল এবং সে দলের ভিত্তিতে গঠিত একটি উদ্যমী সরকার। একটি নিরুত্তাপ, নিরুদ্যমী সরকারকে দিয়ে সমাজে ব্যাপক গতি সঞ্চার অসম্ভব। গণতান্ত্রিক সরকারের সব চাইতে বড় সম্পদ হলো তার পেছনে মানুষের সমর্থন। যে গণতান্ত্রিক সরকার এই মহামূল্যবান সম্পদকে আঁচলে গিঁট দিয়ে বেঁধে রেখে দিন-আনি দিন–খাই নীতি গ্রহণ করে চলে সে সরকারের ভবিষ্যৎ নেই।

আমরা যদিএখনই সুদৃঢ় রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থ হই তার অর্থনৈতিক পরিণতি যেমন ভাল হবে না, তার রাজনৈতিক পরিণতিও ভাল হবে না।

ভারতের সংগে এখনই আমাদের অদ্ভুত বাণিজ্যিক সম্পর্ক। চোরাচালানের কথা বাদ দিলাম, শুধু অফিসিয়াল বাণিজ্যে এই দু'দেশের সম্পর্ক বড় একতরফা। আমরা ভারত থেকে গত বছর আটশ' কোটি টাকার মালামাল আমদানী করেছি (তার মধ্যে তিনশ' কোটি টাকা ব্যয় করে এনেছি মাদ্রাজের তাঁতীদের তৈরী অতি

সাধারণ মানের তাঁতের কাপড়– যা এদেশে বানানো আমাদের জন্য ফরজ কাজ ছিল)। আমরা একই সময়ে ভারতে রফতানী করেছি মাত্র সাড়ে পনেরো কোটি টাকার মালামাল। অর্থাৎ ভারতের কাছে বিক্রি করার মত আমাদের কিছু নেই বল্লেই চলে।

এবার চিন্তা করুন এখন থেকে দশ বছর পরের কথা। বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রতি তার দীর্ঘদিনের অনাসক্তির জায়গায় এখন তার বিপুল আসক্তির কথা ভারত পরিষ্কারভাবে দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছে। বিপুলভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ শুরু হবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর অতি দ্রুত সংগঠিত হবে। চীনে যে অভাবনীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে তার গতিকেও ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে ভারতে। ভারত নানাদিক থেকে ভাগ্যবান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে একটি। শিল্পক্ষেত্রে ভারতে সুবিস্তৃত এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটা ভিত্তি আছে। আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত বিরাট এক জনগোষ্ঠী আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য আছে।

ভারতের অর্থনীতি যত দক্ষতর হতে থাকবে আমাদের অর্থনীতি ততই তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। আমাদের মোট আমদানীর বিরাট অংশ তার কাছ থেকে আসাটা বিচিত্র হবে না। ভারতীয় পণ্যের পথ ধরে আসবে ভারতীয় বিনিয়োগ। এটা কারো কোন ষড়যন্ত্রের কারণে হবে না, হবে অর্থনীতির অমোঘ বিধানে।

ভারতীয় রাজনৈতিক বলয়ে আমরা আবদ্ধ হয়ে যেতে পারি

জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কারণে ভারতের শ্রম মজুরী দ্রুত বাড়বে। তার ফলে বহু ধরণের শিল্প ভারতে অচল হয়ে পড়বে। প্রথম পর্যায়ে নেপাল ও বাংলাদেশের শ্রমিকদের উপর নির্ভর করে এ সমস্ত শিল্প চালু রাখা হবে। পরবর্তীতে এসমস্ত শিল্প ভারতীয় পুঁজির মাধ্যমে নেপাল এবং বাংলাদেশের দিকে চলে আসবে। বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের বাজার ও পুঁজির বিনিয়োগ ক্ষেত্র হয়ে যেতে যত বিলম্ব আছে বলে এদ্দিন মনে হয়েছে, এখন নতুন বাস্তবতার নিরীখে, তত বেশী বিলম্ব না-ও হতে পারে।

আমরা ত বৈদেশিক বিনিয়োগ চাচ্ছি। তাহলে ভারতীয় বিনিয়োগকে এত ভয় পাচ্ছি কেন? আমি সকল বৈদেশিক বিনিয়োগকে স্বাগতঃ জানাবার পক্ষপাতি। বাণিজ্য এমন একটা জিনিস যেটাতে কেউ জয়ী কেউ পরাজিত পক্ষ থাকে না। বাণিজ্যে উভয় পক্ষেরই লাভ। উভয় পক্ষই জয়ী। কিন্তু বিপদ বাধে তখন যখন বাণিজ্য একতরফা হয়ে যায়। বাণিজ্যে যখন প্রতিযোগীর প্রবেশাধিকার থাকে না–তখন। ভারতীয় বাণিজ্যের প্রবল ঢেউ যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করবে তখন এখানে অন্য কোন দেশ এসে আর বাণিজ্য সুবিধা করতে পারবে না। আমরা একক রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক বলয়ের অন্তভুক্ত হয়ে পড়বো। এই

বাণিজ্যিক বলয় রক্ষার জন্য স্বাভাবিক নিয়মে ভারতীয় রাজনৈতিক বলয় আমাদের দিকে সম্প্রসারিত হবে। অর্থাৎ আমরা আমাদের নিজস্ব মংগলের জন্য স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ হয়ে যেতে পারি।

এখন আমাদের করণীয় অত্যন্ত স্পষ্ট। আমাদের কাজ হবে ভারতীয় বাণিজ্য প্রবল হবার আগে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যকে প্রবল করা। শিল্পোৎপাদনের ভিৎ রচনায় আমাদেরকে অত্যন্ত তৎপর হতে হবে। জলোচ্ছ্বাসের ঢেউ আসার আগেই আমাদেরকে অর্থনৈতিক কেল্লাগুলি বানানো সমাপ্ত করতে হবে।

ভারত আমাদের জন্য এক বিরাট বাজার

আমি প্রায়ই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিই যে এই দেশ বারো কোটি মানুষের দেশ। বারো কোটি মানুষের বছরে এক জোড়া করে স্যান্ডেল লাগলে প্রতি বছর বারো কোটি জোড়াল স্যান্ডেল বিক্রী করা যাবে। ঈদে একটি করে রুমাল কেনার সামর্থ থাকলে প্রতি ঈদে বারো কোটি রুমাল বিক্রী হবে। সবার যদি টুথ-পেস্ট ব্যবহার করার সামর্থ থাকতো তাহলে বছরে ১০০ কোটি টিউব টুথ পেস্ট লাগতো ইত্যাদি। অর্থাৎ বাংলাদেশ নিজেই একটা বড় বাজার, যদি দারিদ্র থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়া যায়।

আমি এর বাইরে যে কথাটির উপর জোর দিতে চাই সেটা হলো বাংলাদেশে দেশী বা বিদেশী যে-বিনিয়োগ হবে সেটা শুধু বাংলাদেশের বাজারকে লক্ষ্য করে হওয়াটা একান্ত বোকামীর কাজ হবে। এদেশে বিনিয়োগকারীকে সব সময় বাংলাদেশের বাইরে বৃহত্তর অর্থনৈতিক গণ্ডীকে মনে রেখে বিনিয়োগ করতে হবে। আমাদের বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে প্রথম যে দেশের বাজারকে আমরা হিসেবের মধ্যে ধরবো সেটা হলো ভারত। ভারত আমাদের জন্য এক বিরাট বাজার। ভারত আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে একটা বিরাট সুযোগ। অর্থনৈতিক ভাবনায় ভারতকে ভয়-না পেয়ে বরং প্রকাণ্ড সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

ভারতে যখন অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসতে থাকবে তখন তার নিজের কারণেই বহু ধরনের শিল্প পণ্য উৎপাদন (অনেকগুলি তার ঐতিহ্যগত শিল্প– যেমনঃ টেক্সটাইল) তাকে ত্যাগ করতে হবে। বাংলাদেশ যদি এখন থেকে প্রস্তুতি নেয় অত্যন্ত সহজে সে ভারতের বাজারে সে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে। তাছাড়া ভারতের বাজারের জন্য বাংলাদেশ একদিকে যেমন কৃষি পণ্য ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করতে পারে (চিনি , মাছ, ডিম, মুরগী, কলা, আম, আনারস, জ্যাম, জেলী, আচার ইত্যাদি হাজারো পণ্য) তেমনি অতি আধুনিক পণ্য (কম্প্যুটার, টিভি, ফ্রীজ, অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী, কসমেটিক্স) উৎপাদন করতে পারে।

বাড়ীর পাশেই সুবিশাল এই ভারতীয় বাজারকে ভুলে গেলে বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোন সরকারের দক্ষতা এবং কৃতিত্বের একটি মাপকাঠি হওয়া উচিত বাংলাদেশের পণ্য ভারতীয় বাজারের কত অংশ দখল করতে পেরেছে তার

উপর। বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী সকল শিল্পপতি, ব্যবসায়ীর জন্য এটাই হবে আসল পরীক্ষা–কত টাকার উৎপাদন ভারতে বিক্রী করতে পেরেছে। উৎপাদন সম্বন্ধে পরিকল্পনা করার সময়েই এই পরীক্ষায় পাশ করার সংকল্প নিয়ে কাজে নামতে হবে।

আমাদের ঘরের পাশের আরেকটি দেশের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে আজ তারা আমাদের প্রতিবেশী হয়েও বহু দূরের মানুষ হয়ে রয়েছে। কিন্তু চিরদিন এভাবে যাবে না। এদেশটি মায়ানমার (বা বার্মা)। বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোক্তাদের জন্য বার্মায় অনেক সুযোগ আছে। কয়েক বছর আগে বার্মার উত্তরাঞ্চলে চিংড়ী উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রফতানীর দায়িত্ব উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা নিয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে এ রকম বহু সুযোগ এই দেশে আমাদের জন্য আছে।

ব্যবসায় মানে হাত-পা বেঁধে দেশের মানুষের গলায় ছুরি চালানো নয়

ব্যবসায় মানে দেশ দখল নয়। ব্যবসায় মানে ক্রেতাকে শোষণ নয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের যেখানে অর্থনৈতিক মংগল সাধিত হয় সেটাই প্রকৃত ব্যবসায়। ব্যবসায় মানে ১৫ টাকা দামের চিনি ৩০ টাকা দামে দেশের মানুষকে কিনতে বাধ্য করা নয়। শিল্প উৎপাদনের মূল লক্ষ্যই হবে ক্রমাগত সাধনা করে উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের পতাকা উড়ানো। এজন্যই দেশে বিনিয়োগ করার সময় বিদেশে রফতানীর কথাটি মনে রেখে শুরু করা এত জরুরী। বিনিয়োগের অর্থ যেন এ-না হয় যে দেশের চারদিকে দেয়াল তুলে দেশের মানুষের হাত-পা বেঁধে গলায় ছুরি চালানোর অধিকার অর্জন করা।

সরকারকে দক্ষ ফ্যাসিলিটেটর হতে হবে

এ প্রসংগে অবশ্য একথাটিও বলে রাখা ভাল। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সর্বনিম্ন ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করতে হলে একা শিল্পপতিকে বাংলাদেশের বাস্তবতার নানারকম হিংস্র ক্ষুধার্ত বন্য প্রাণীর খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে দেশের সবাই বসে তামাশা দেখার বিষয় নয়। সকল পক্ষকে এই খাঁচায় ঢুকতে হবে। এই খাঁচায় যাতে কোন ক্ষুধার্ত হিংস্র প্রাণী থাকতে না-পারে সে বিষয়ে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। এটা সরকারের কাজ। শিল্পোদ্যোক্তার কাজ হচ্ছে উৎপাদনের খেলা দেখানো। তাকে এমন খেলা দেখাতে হবে যেন তিনি আন্তর্জাতিক দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেন।

ভারত, বার্মা ছাড়া আমাদের সম্ভাব্য বাজার আছে পাকিস্তান, নেপাল এবং ভুটান। (কোথায় আমরা ভুটানে আমাদের পণ্য বিক্রি করার যোগ্যতা অর্জন করবো, তা-না, এখন আমরা ভুটান থেকে এনে ফলের রস খাচ্ছি)। ইউরোপ,আমেরিকার বাজারে আমরা প্রবেশ করেছি। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র

আমরা নিতে পেরেছি। এটা সম্প্রসারণের বিরাট সুযোগ আমাদের আছে। রাশিয়া, প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র– সমূহ, পূর্ব ইউরোপ আমাদের কাছে এখনো অপরিচিত। আফ্রিকায় ভারত এবং পাকিস্তান তাদের বাজার করে নিয়েছে বহুকাল আগে থেকে। আমরা তার খোঁজ খবরও করছি না। আফ্রিকার অনেক দেশ আছে যারা বাংলাদেশের সংগে ব্যবসা করতে আগ্রহী, বাংলাদেশ থেকে পেশাজীবী মানুষ নিয়ে যেতে আগ্রহী (যেমনঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বাবুর্চি)। কিন্তু আমরা তাদের সংগে ঘনিষ্টতা করছি না।

আমাদের ভবিষ্যৎ খোঁজ করতে হলে আফ্রিকার খোঁজ খবর রাখতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে। ভারত এবং পাকিস্তান ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। আমরা এখনো যাই নি। আমাদের সেখানে যাওয়া দরকার। আমাদের মানুষের কর্মসংস্থান হবে সেখানে। সাদা পেশাজীবীরা চলে যাচ্ছে। সেখানে আমাদের পেশাজীবিদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

সম্প্রতি ইউরোপে নিযুক্ত বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি মূল্যবান নীতি ঘোষণা করেছেন। আমাদের দূতাবাসগুলির প্রধান দায়িত্ব হবে অর্থনৈতিক ডিপ্লোমেসী, রাজনৈতিক ডিপ্লোমেসী নয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় যদি সফল হতে হয় আমাদের দূতাবাসগুলিকে "বাংলাদেশ মহাবাণিজ্যালয়ের" স্থানীয় অফিস হিসেবে কাজ করতে হবে। আমাদের সরকারকেও এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডের দক্ষ ফ্যাসিলিটেটর হতে হবে। নিয়ন্ত্রণ নয়– উৎপাদন ব্যয় কমানোর এবং বৃহত্তর বাজার সৃষ্টির কাজে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বন্ধু প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারকে গড়ে উঠতে হবে।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে ব্যক্তিগতভাবে এ দায়িত্ব নিতে হবে।

আগামী চার পাঁচ বছরে আমরা আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরাতে পারি।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে দেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতে হবে। একাজে তাঁকে সহায়তা করার জন্য তিনি রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটা টিম গঠন করতে পারেন। বিরোধীদল থেকেও প্রভাবশালী সদস্য এটিমে রাখা দরকার। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সংগে এই টিম সরাসরি বৈঠক করবে এবং সরকারের নীতি কাঠামোর অধীনে তাঁদের যা যা প্রাপ্য তা পাওয়া নিশ্চিত করবে। কোন নতুন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হলে তা দ্রুত গ্রহণ করবে।

যে সমস্ত বিদেশী বিনিয়োগকারী দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছেন তাঁদের সংগে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে বাংলাদেশে আসার জন্য আগ্রহী করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

যে সমস্ত বাংলাদেশী বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করতে চান কিন্তু চারদিকে হাংগর-কুমিরের কারণে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছেন তাঁদেরকে উৎসাহ যোগাতে হবে। তাদের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন নীতিমালা এবং সরকারী

ঘোষণায় যে সমস্ত আশ্বাস দেয়া হয়েছে সেগুলি যথোপযুক্তভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদেশে উপার্জনরত বাংলাদেশীদের উপার্জন যাতে দেশে নিরাপদ বিনিয়োগে নিয়োজিত করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা গত এক দশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আমাদের তরুণ ব্যবসায়ী শিল্পপতিদেরকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে তাঁরা কৃতিত্বের সংগে সে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারবেন।

ধর্মান্ধতা, তত্ত্বান্ধতা, স্মৃতিবদ্ধতা দিয়ে দেশ চালানো যায় না

উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল দীর্ঘদিন ধরে। এখন তারা একদেশ। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যারা উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় নি। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাজার হাজার টন বিস্ফোরক দ্রব্য উত্তর ভিয়েৎনামের উপর ছড়িয়েছিল, নাপাম বোমা দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল, ভিয়েতকং-দের মারার জন্য ভয়ংকর এন্টি-পার্সোন্যাল বোমা সর্বত্র পুঁতে রেখেছিল আজ বিজয়ী উত্তর ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট নেতারা সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নানাভাবে আবেদন জানাচ্ছে ভিয়েৎনামে মার্কিন বিনিয়োগের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে মার্কিন পুঁজিকে ভিয়েৎনামে আসার সুযোগ করে দেবার জন্য।

বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে ঢাকা-গামী প্লেনে খুঁজে পাওয়া যায় না (পাওয়া যায় শুধু দাতা সংস্থার কনসাল্ট্যান্ট এবং কর্মকর্তাদের,আর পাওয়া যায় বিদেশী ঠিকাদার, সরবরাহকারীদের প্রতিনিধিবৃন্দকে)। কিন্তু হ্যানয় আর হো চি মিন সিটি অভিমুখী প্লেনগুলি ভর্তি থাকে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি,প্রকল্প প্রস্তুতকারী এবং ব্যবসা বিশ্লেষকদের নিয়ে। মার্কিন বিনিয়োগকারীরা ওয়াশিংটনে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে ভিয়েৎনাম থেকে বিধিনিষেধ উঠিয়ে দেবার জন্য। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের একটা দল ভিয়েৎনাম সফর করে এসেছে ব্যবসায়ীদের অনুপ্রেরণায়।

মার্কিন পুঁজি ছাড়াই এখন ভিয়েৎনাম নতুন অর্থনৈতিক বাঘে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। সবার মুখে ভিয়েৎনামের সুনাম। এরকম পরিশ্রমী ও সুশৃংখল জাতি আর হয় না। ভিয়েৎনামী সরকারের প্রশংসা হচ্ছে এই বলে যে তারা বাস্তববাদী। কোন তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে গলাবাজী করে তারা সময় কাটাতে রাজী নয়। তারা মানুষের মংগল চায়। তারা দেশের মংগল চায়।

ধর্মান্ধতা দিয়ে যেমন দেশ চলতে পারে না,তত্ত্বান্ধতা কিংবা স্মৃতিবদ্ধতা দিয়েও দেশ চালানো যায় না। দেশ চলবে কঠিন বাস্তবতার নিরীখে। এখানে ভাবাবেগের জায়গা নেই। অন্ধ বিশ্বাসের জায়গা নেই। কোন সত্যই সত্য নয় যা ব্যক্তি মানুষকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে নারাজ।

কোমলতম বিকল্প সন্ধানের দিন সমাপ্ত হোক

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, অর্থাৎ ছয় কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র থেকে মুক্তি দেবার জন্য বিশাল রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজন। এই উদ্যোগে নেতৃত্ব দিতে হবে সরকারী দলকে– এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিরোধীদলগুলির দায়িত্বও নেহাৎ কম নয়। এই উদ্যোগ যাতে সফল হয় তার জন্য তাদেরকে সমর্থন যোগাতে হবে। সে সমর্থন আসবে বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা থেকে, উন্নততর বিকল্প উপস্থাপনের দ্বারা, মৌলিক নীতিসমূহের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীদেরকে আশ্বস্ত করার মাধ্যমে, ব্যাপক সংস্কার ও পুনর্গঠনে ইতিবাচক ভুমিকা পালনের মাধ্যমে।

সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস কর্মসূচীর প্রতি সক্রিয় বিরোধিতার ভয়ে, কিংবা উত্তেজনা সৃষ্টি পরিহার করার উদ্দেশে কোমল থেকে কোমলতর, এমন কি, কোমলতম বিকল্প সন্ধান করে করে পথ চলার দিন সমাপ্ত করে দিতে হবে। ভাটার টানকে জোয়ারের টানে পরিণত করতে হলে, আগামী দিন নিয়ে দুর্ভাবনাকে সত্যে পরিণত হবার সকল পথ বন্ধ করতে হলে সব চাইতে শক্ত বিকল্পটিকেই হাতে তুলে নিতে হবে। এজন্য দেশের নেতৃত্বকে মন বাঁধতে হবে। সেখানেই নেতৃত্বের বাহাদুরি।ইতিহাসে জায়গা করে নেবার পথ এটাই। এপথে চলতে গিয়ে বিজয়ী হলে যেমন ইতিহাসে নিশ্চিত স্থান, পরাজিত হলেও নিশ্চিত স্থান। যাঁরা কোমল বিকল্পের অনুসারী তাদের প্রতি ইতিহাস নির্দয়।

আগামী চার পাঁচ বছর খুবই ক্রিটিক্যাল সময় আমাদের

এদেশ সীমাহীন সম্ভাবনার দেশ। অসংখ্য সুযোগ আজ আমাদের চারধারে ভিড় করে এসেছে। বারে বারে এত সুযোগ না-ও আসতে পারে। আমাদের চমৎকার সৃজনশীল জনগোষ্ঠীর হাতে এই সুযোগগুলি এখন মুঠো মুঠো করে তুলে দেবার পালা। আমাদের চারদিকে পৃথিবী দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। দ্রুত পট পরিবর্তনের সংগে সংগে দ্রুত সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আজ যেসব দেশ সুযোগ নিচ্ছে তারা নিঃসন্দেহে এগিয়ে যাবে। আমরা যদি দ্রুততার সংগে এই সুযোগগুলি গ্রহণ করতে এগিয়ে না–যাই, সুযোগগুলির মেয়াদ ফুরিয়ে যেতে পারে। এর ফলে অনিবার্য আরো দুর্ভোগ আমাদের ভাগ্যে নেমে আসতে পারে।

আমার মনে হয় আগামী চার–পাঁচ বছর আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই ক্রিটিক্যাল সময়। যা-কিছু উদ্যোগ নেবার আছে, পরিবর্তন করার আছে এই সময়টাতে তা সম্পন্ন করে ফেলতে হবে। নইলে বিলম্ব হয়ে যাবে। সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

নির্লিপ্ততার অবসান হোক। অতীতমুখী,কলহধর্মী, হরতাল-বিবৃতির রাজনীতির অবসান হোক। সংস্কারমুখী, উদ্ভাবনমুখী, ঐক্য সৃষ্টিকারী রাজনীতির পত্তন হোক। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেশ থেকে দারিদ্রের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করুক। স্বাস্থ্যদীপ্ত বারো কোটি মহিলা ও পুরুষের কর্মব্যস্ততায় এই দেশ জেগে উঠুক।

আপনিও কি এই অংগীকার করবেন?

ডাঃ ইব্রাহিমকে ধন্যবাদ। তিনি প্রমাণ রেখে গেছেন একক মানুষ ক্ষুদ্র নয়।

আমি মাত্র একজন নাগরিক হতে পারি, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র নই। আমি একা সক্রিয় হওয়াটাই আমার দায়িত্ব। দেশের ভাল মানুষরা নিজেকে ক্ষুদ্র ভেবে মুখ বুঁজে সহ্য করে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করছেন। তাতে সমস্যা বাড়ছে বৈ কমছে না। দেশের ভালো মানুষরা এককভাবেই উদ্যমী এবং সক্রিয় হলে আমরা অনেকটা বাধা পার হতে পারতাম।

আমি আমার নিজের কর্তব্যটা স্থির করে নিয়েছি। দেশের সামনে উপস্থিত সুযোগগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য আমি নিজে নির্লিপ্ত থাকবো না। যারা নির্লিপ্ত আছে তাদের মধ্যে উদ্যম সঞ্চারের ব্যাপারে আমার একার ভূমিকাকে আমি ক্ষুদ্র করে দেখবো না– এই অংগীকার করলাম।

আপনিও কি এই অংগীকার করবেন?

ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্মরক বক্তৃতা হিসেবে অক্টোবর ২২, ১৯৯৩ তারিখে অফিসার্স ক্লাব, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, ১২২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত করুন এবং গণতন্ত্রের অপরাজেয় দুর্গরূপে গড়ে তুলুন

প্রথমে কিছু ঈর্ষা প্রকাশ করে নিই। তারপর মন ভরে অভিনন্দন জানাবো।

ঈর্ষার বিষয়টি হলো আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম তখন আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনরকম অভ্যর্থনা জানানো হয় নি। ভর্তি হবার বহুদিন পর দূর থেকে উপাচার্যের চেহারা দেখেছি। হলে থাকলেও প্রভোস্টের অফিসের পাশ দিয়ে যেতে ভয় পেতাম। আমাদের চাইতে আপনাদের কপাল কতো ভাল তার জন্যেই ঈর্ষা। এখন স্বয়ং উপাচার্য মহোদয় আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের বরণ করে নিচ্ছেন। আমরা যখন ভর্তি হয়েছিলাম তখন পাকিস্তান নামক নতুন দেশটিতে দৃঢ় আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানী শাসকদের উপর আমাদের অবিশ্বাস এবং ক্ষোভ দ্রুত জমে উঠছিল। পাকিস্তানের দুই অংশের দুই অর্থনীতি স্বীকার করে নিয়ে সেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার পক্ষে বিতর্কে অংশ নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু। বছর না-ঘুরতেই সামরিক শাসন জারী হয়ে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আর গণতন্ত্রের মুখ দেখতে পেলাম না। ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো। সে দুঃস্বপ্ন ভয়ংকর যুদ্ধে পরিণত হলো। বহু মানুষের বহু ত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম না-হওয়া পর্যন্ত আর গণতন্ত্রের মুখ দেখতে পেলাম না।

আপনাদেরকে দেখে আমি ঈর্ষান্বিত কারণ আপনারা এমন পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু করছেন যখন দেশে কোন

রাজনৈতিক মতাদর্শের বিতর্ক নেই। ভাষাগত দ্বন্দ্ব নেই। জাতিগত দ্বন্দ্ব নেই। দূর ইতিহাস থেকে টেনে আনা ঐতিহাসিক কোন গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব নেই। এমন সৌভাগ্যবান জাতি দুনিয়াতে কয়টা আছে? দীর্ঘ সংগ্রামের পর নির্দলীয় পরিবেশে চমৎকার একটা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার দেশে ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই সরকারের মেয়াদ কালের মাঝামাঝি সময়ে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। ঈর্ষা করবো না ত কী?

মতানৈক্য নেই কিন্তু একমত হতে পারছি না

আমাদের দেশে সমস্যা অনেক। এর সমাধানের ব্যাপারে খুব বেশী একটা মতানৈক্যও নেই। তা সত্ত্বেও সবাই মিলে একমত হতে পারছি না। আমাদের সমস্যাগুলি হলোঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা,রাজনীতির ধরন নিয়ে সমস্যা, প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার সংগে সরকার লাগসই না-হবার সমস্যা, স্থানীয় পর্যায়ে সরকার কাঠামো গড়ে তোলার সমস্যা, প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের পরতে পরতে সীমাহীন দুর্নীতির সমস্যা, বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনে দুঃসহ দারিদ্র্যের সমস্যা, নিরক্ষরতার সমস্যা, স্বাস্থ্যহীনতার সমস্যা, কর্মহীনতার সমস্যা, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের সমস্যা, শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির সমস্যা, পথে ঘাটে মাস্তানীর সমস্যা। আপনি সমস্যাবলীর যত বড় তালিকাই বানান-না কেন, লক্ষ্য করে দেখবেন এগুলি সৃষ্টির পেছনে আছি আমরা নিজেরাই। সমাধানও আমাদের কাছে। বাইরের কাউকে দায়ী করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করে দায়িত্ব সারার উপায় নেই।

আমাদের দেশের রাজনীতি আমাদের এই নতুন বাস্তবতার আঙ্গিকে এখনো গড়ে উঠতে পারছে না বলে রাজনীতি প্রাসংগিক হতে পারছে না। আমাদের রাজনীতি বারবার মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসংগ নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। নব্বই-এর দশকের সংগে মোকাবেলার জন্য এবং একই সংগে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ হবার আগেই সকল নাগরিকের জন্য প্রাণোজ্জ্বল জীবন নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত ভিৎ রচনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা যাচ্ছে না। নব্বুই-এর দশকে যে রাজনীতি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে এসে পৌঁছার কথা ছিল তার এখনো জন্মই হলো না।

আপনারা ভাগ্যবান। আপনারা ভাগ্যবতী। আমার প্রিয় নবাগত ছাত্র ভাইয়েরা, আমার প্রিয় নবাগত ছাত্রী বোনেরা, আপনাদের হাতেই এই নতুন রাজনীতি জন্ম লাভ করুক–এই গভীর প্রত্যাশা নিয়ে আপনাদেরকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগতঃ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় জাতির প্রতিটি মুহূর্তে সংকট নতুন এবং সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। আশা করি আপনারাও একাজে অব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের দীর্ঘ ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখবেন।

অভিনন্দন গ্রহণ করুন

এবার অভিনন্দনের পালায় আসি।

আপনাদের সকলকে মন ভরে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বহু পথ ডিঙিয়ে আজ অবশেষে আপনারা সত্যি সত্যি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছেছেন। সবাই খুশী মনে এসেছেন তা আমি দাবী করছি না। আপনি যে বিভাগে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন সে বিভাগে ভর্তি হতে পারেন নি বলে মন খারাপ করে অন্য বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। আপনি মেডিক্যাল কলেজে কিংবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিংবা বিদেশী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন নি বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপাততঃ একটি বছর কাটানোর জন্য এখানে ভর্তি হয়েছেন। যেভাবেই আপনি ভর্তি হয়ে থাকুন না কেন আপনি অভিনন্দন পাবার যোগ্য পাত্র এবং পাত্রী।

আপনি চিন্তা করে দেখুন আপনার কত সহপাঠী কোথাও ভর্তি হবার সুযোগ না-পেয়ে অবশেষে কলেজে ভর্তি হয়েছেন, কিংবা লেখাপড়া আর করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চিন্তা করে দেখুন আপনার কত সহপাঠীকে আপনি আপনার চলার পথে বিভিন্ন স্তরে পেছনে ফেলে এসেছেন যাঁরা কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগনে প্রবেশ করার সুযোগ পাবেন না।

আপনারা দেশের সৌভাগ্যবান সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার সংগে সংগে একটা বিষয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে যে আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে আপনারা দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব কিংবা তার কাছাকাছি অবস্থানে যাবেন, দেশের প্রধান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি আপনাদের নিয়ন্ত্রণে চলবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের খ্যাতিমান/ খ্যাতিময়ী অধ্যাপক/অধ্যাপিকা হবেন, এর অনেক আগেই জাতীয় সংসদের সদস্য হবেন, মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হবেন, দেশের সেরা লেখক হবেন, পণ্ডিত হবেন, সাংবাদিক হবেন। আপনাদের সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যাঁদেরকে আমি আজ মন ভরে এই অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পেলাম না চলুন তাঁদের কথাও আমরা এই শুভক্ষণে স্মরণ করি।

বাংলাদেশ নয় কোটি নিরক্ষর নাগরিকের দেশ

দেশের শতকরা ৭৫ জন নাগরিক নিরক্ষর। এর চাইতে গ্লানিকর পরিচয় আমাদের আর কি হতে পারে? প্রতি চারজন নাগরিকের মধ্যে তিনজন লিখতে পড়তে পারেন না। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে কোন আত্মমর্যাদাশীল জাতি এই পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে না। আমরা আমাদের সংস্কৃতি,ভাষাপ্রীতি এবং আত্মমর্যাদা নিয়ে অহরহ যে বড়াই করি তা একেবারেই মেকী বড়াই। গলাবাজী করে নিজেদের বিপুল ব্যর্থতা ঢাকার এটা একটা প্রয়াস মাত্র। এরকম মেকী বড়াই নিয়ে আমরা আর কতদিন কাটাতে চাই ? আমাদের আসল আত্মমর্যাদাবোধ কখন বিদ্রোহ করে উঠবে?

দেশের যে বিরাট তরুণগোষ্ঠীকে আমরা সামান্য অক্ষর জ্ঞান, হিসাব জ্ঞান দিতে ব্যর্থ হয়েছি আসুন, আজ এই শুভ দিনে আমরা তাদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাই। এরই সংগে আপনাদের এই গৌরবের মুহূর্তে এই আনন্দের মুহূর্তে আপনাদের কাছে অনুরোধ করি, আপনারা অংগীকার করুন, আপনারা

যাঁরা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন তাঁরা জীবনে যে যাই করুন না কেন সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করবেন, যেন বাংলাদেশের কোন নাগরিক নিরক্ষর না থাকেন। দেশের নাগরিককে নিরক্ষর রাখার অপরাধ থেকে সমাজকে অতি দ্রুত মুক্ত করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিরূপণ এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা অর্জনের জন্য আপনারা আপনাদের বুদ্ধি, মেধা ও শ্রমকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করবেন। অতি অল্প সময়ে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নাগরিকের সংখ্যা ২৫ শতাংশ থেকে অন্ততঃ ৫০ শতাংশে নিয়ে যাবার জন্য আপনারা নিজ নিজ আয়োজনে কর্মসূচী গ্রহণ করবেন।

তারুণ্যের শক্তিই দেশের বড় শক্তি

আপনাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনারা তরুণ। দেশের সেরা তরুণ। তারুণ্য বাধা মানে না। গতিময়তা তারুণ্যের স্বাভাবিক ধর্ম। তারুণ্যকে গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ রাখা যায় না। আপনি যদি বাধা মানেন তবে আপনি তরুণ হয়েও তারুণ্যধর্ম পালন করলেন না। তারুণ্য সমাজের নিয়মনীতিকে প্রশ্ন করে। প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করে। উন্নততর রীতিরেওয়াজের ভিৎ গড়ে তোলে। প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি যদি অচল হয়, অদক্ষ হয়–তাতে নির্ভীকভাবে আঘাত করে। আত্মগৌরবে জাবরকাটা ঝিমিয়ে পড়া সমাজপতিদের চোখের ঘুম তাড়ায়।

সকল রকম গোঁড়ামীর সংগে তারুণ্যের চির-বিরোধ। তারুণ্যের কাছে কোন কথাই শেষ কথা নয়। তরুণের কাছে কোন কিছুই ধ্রুব সত্য নয়। কঠিন যাচাই-বাছাই পর্ব শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তারুণ্যের কাছে কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। যে নীতি মানুষের মনকে সীমিত করে, প্রতিজন মানুষের মধ্যে সীমাহীন যে-সম্ভাবনা আছে তা বিকশিত হবার পথে সমাজের যে নিয়মপদ্ধতি বাধার সৃষ্টি করে, যে রেওয়াজ নতুন জ্ঞান সৃষ্টির অন্তরায় হয়– তার পরিবর্তনে তরুণরাই নেতৃত্ব দেয়। আজ থেকে এই দায়িত্ব আপনাদের উপর আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পিত হলো। যে সমাজের তরুণ সম্প্রদায় যত নিষ্ঠার সংগে এই দায়িত্ব পালন করে সে সমাজ তত তাড়াতাড়ি জড়তা কাটিয়ে গতিময় হয়।

শিক্ষাঙ্গনে সমস্যা

শিক্ষাঙ্গনে সমস্যার অন্ত নেই। সেশন জট, অস্ত্রের অবাধ বিচরণ, সন্ত্রাস, সর্বত্র অনিশ্চয়তার একটা পরিবেশ। আপনার কোন কোন বন্ধু দেশ ছেড়ে অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছেন সুনির্দিষ্ট সময়সীমায় লেখাপড়া শেষ করে কর্মজীবন শুরু করা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মের জায়গা। অনিয়মের এখানে কোন জায়গা নেই। সব কিছু ঘড়ি-ঘন্টার মাপে এখানে চলবে। আজকের কাজ কালকে করার কোন অজুহাত এখানে চলার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন তারিখে কি হবে, কখন ভর্তি পরীক্ষা হবে, ফলাফল বের হবে, ভর্তি শুরু হবে, কোন তারিখে নতুনদের সম্বর্ধনা জানানো হবে, কোন তারিখে ক্লাশ শুরু হবে, কোন দিন পরীক্ষা শুরু হবে, কোন দিন শেষ হবে, কোন দিন বন্ধ থাকবে, কোন দিন ফল প্রকাশিত হবে, কোন দিন কোন নির্বাচন হবে, কোন শিক্ষক কি পড়াবেন, কোন কোর্স এবছর

পড়ানো হবে না, নতুন কি কি কোর্স এবছর নতুন সংযোজন হলো সব কিছুই অগ্রীম মুদ্রিত হয়ে সকলের হাতে পৌঁছে যায় শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার আগে। সে-ক্যালেন্ডার ধরে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন এগিয়ে চলে বিনা বাধায়, বিনা বাক্য ব্যয়ে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব পরিকল্পনা করাটা এখন বিরাট একটা রসিকতায় পরিণত হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত দিনে পূর্বে নির্ধারিত কাজ হওয়াটা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এখন আশ্চর্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হবে। বাজারে দামের দরাদরির মত পরীক্ষার তারিখ নিয়ে দরাদরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা লাভ করতে যাচ্ছে। হঠাৎ যদি কোন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বিনা দরাদরিতে পরীক্ষার তারিখ এবং বিষয়বস্তু মেনে নেয় শিক্ষকের মনে নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে তারা বোধ হয় পরীক্ষাই দেবে না।

আপনারা যারা নতুন আসলেন তাঁরা কি দায়িত্ব নেবেন আপনাদের আমল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পূর্ব নির্ধারিত ক্যালেন্ডার অনুসারেই চলতে শুরু করবে? এই নিয়ম আর কোন দিন কাউকে ভাঙ্গতে দেবেন না। ক্লাশের দিন ক্লাশ হবে, পরীক্ষার দিন পরীক্ষা হবে, নির্বাচনের দিন নির্বাচন হবে, উৎসবের দিন উৎসব হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন অচল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন অস্ত্র এবং সন্ত্রাস। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা প্রায়ই উল্লেখ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা গেলে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অনেক সহজ হতো। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেই যদি আইন অচল হয়, গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, তবে দেশের জন্য আমরা কি আশা করবো? দেশের ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করে স্বপ্ন দেখবো?

বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা হওয়ার কথা পরম নির্ভয়ের জায়গা। দেশের, বিদেশের শহরের গ্রামের যে-কোন মানুষ যে-কোন সময় বিনা ভয়ে, বিনা দ্বিধায় এখানে চলাফেরা করতে পারার কথা। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা শহরের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। শুধু একাডেমিক চর্চাই নয়, সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নানা তৎপরতার শীর্ষ স্থানও এই বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করাটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে। দিন দুপুরেই অনেক দোয়া-দরূদ পড়তে পড়তে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পাড়ি দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মানুষের অগাধ বিশ্বাস-থাকবে, শ্রদ্ধা থাকবে, সম্ভ্রম থাকবে, কিন্তু ভীতি থাকবে কেন? যুদ্ধকালীন সময়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়া তরুণদেরকে যেভাবে মা-বাবা ভাইবোনেরা বিদায় দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছেলেমেয়েদের বিদায় দেবার সময়ও মা-বাবা ভাইবোনদের একই অনুভূতি আসে মনে। মনে অনুচ্চারিত প্রশ্নটিকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। যুদ্ধের শেষে আমার সন্তান সহি-সালামতে আবার ফিরে আসবে ত আমার কোলে?

বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করুন

সন্ত্রাস, অস্ত্র, চর দখলের যুদ্ধ, এগুলি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অংশ? যদি না-হয় তাহলে কার প্রয়োজনে এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করে? যাদের প্রয়োজনে এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করে তাদের কাছে কি আমাদের কিছুই বলার নেই?

আপনারা যারা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন তাঁরা যদি আপনাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে চলেন তবে বিশ্ববিদ্যালয় আগের মতই থাকবে। কেউ আপনাদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করে কোন মতামত ব্যক্ত করবে না। আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও আপনারা আপনাদের সহপাঠীদেরকে খুন হতে দেখবেন; আপনি নিজেই তাদের মধ্যে একজন হতে পারেন। আজকে যাঁরা জীবনের অনেক স্বপ্ন নিয়ে এই অনুষ্ঠানে শরীক হয়েছেন তাঁদেরই কেউ কেউ অস্ত্র হাতে তুলে নেবেন। দূরের কারো ইশারায় এই অস্ত্র আরেকজনের বুকে তুলে ধরবেন। নির্বাচন বানচাল করবেন। পরীক্ষা বানচাল করবেন। দেশের আইন শৃংখলা বানচাল করবেন। নিরীহ পরিবারের সকল ভবিষ্যৎ বানচাল করবেন। দেশের ভবিষ্যৎ বানচাল করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তো পুতুল নাচের জায়গা নয়। এটা আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান তরুণদের জায়গা–যাঁরা নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় চলতে জানেন, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে জানেন।

আপনারা যাঁরা নতুন এসেছেন তাঁরা কি নতুনভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অংগীকারবদ্ধ হতে পারবেন? আপনারা কি নিশ্চিত করবেন যে আপনাদের কোন সংগীকে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অস্ত্রের মুখে প্রাণ দিতে দেবেন না? আপনাদের কোন সংগীকে কোনদিন অস্ত্র হাতে তুলতে দেবেন না? সন্ত্রাসের সংগে কোনক্রমেই আপনারা নিজেদেরকে জড়িত করবেন না। যারা অস্ত্রের কথা বলে সন্ত্রাসে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি নির্বাচন বছরের নির্দিষ্ট দিনে শান্তিপূর্ণভাবে,সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার, বছরের নির্দিষ্ট দিনে পুরনো ছাত্র পরিষদ বিদায় নেয়ার, নতুন ছাত্র পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণ করার পরিবেশ নিশ্চিত করবেন ? বিশ্ববিদ্যালয়কে আপনারা গণতন্ত্রের অপরাজেয় দুর্গরূপে গড়ে তুলবেন ?

এদেশের তরুণদের মধ্যে অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা আছে সে কথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা থেকে আমার এ বিশ্বাস প্রতিদিন নতুনভাবে এবং দৃঢ়ভাবে নবায়িত হয়। তরুণরা যেটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়, বুঝতে পারে সেটা অর্জনের জন্য যে কোন পরিশ্রম স্বীকার করতে তারা দ্বিধা করে না।

আপনারা এখন তরুণ সমাজের প্রথম সারিতে এলেন। আপনারা যা পরিষ্কারভাবে বুঝবেন, দেখতে পাবেন–আপনাদের পেছনে দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণের পক্ষে সেটা দেখা, সেটা বুঝা সহজ হবে। আপনারা যদি ভুল পদ্ধতি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারেন সারা দেশ সে ভুল পদ্ধতি থেকে মুক্ত হবে। আপনারা যদি নিজেদের জন্য টেকসই গণতন্ত্রের রেওয়াজ-রীতি প্রচলন করতে পারেন সারা দেশে গণতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে তা সহায়ক হবে।

গণতন্ত্র এবং সন্ত্রাস এক সংগে চলে না। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মারণাস্ত্র সহ-অবস্থান করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তির জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত বুদ্ধির অবাধ চর্চার জায়গা। অস্ত্রের জোরে, লাঠির জোরে চর দখলের জায়গা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে যতদিন অস্ত্র চলাফেরা করবে ততদিন মুক্ত বুদ্ধিও এর অঙ্গন থেকে দূরে থাকবে, দেশেও গণতন্ত্র নিশ্চিত হতে পারবে না।

আপনারা যদি নিজেদের মংগল চান, দেশের মানুষের মংগল চান, বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরতরে অস্ত্রমুক্ত করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করুন। দেশের এবং মানুষের এগুবার পথ বিঘ্নমুক্ত করুন। মানুষের মনে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা আনার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত হলে, সন্ত্রাসমুক্ত হলে দেশের রাজনীতি দারিদ্র বিমোচনমুখী হবার সুযোগ পাবে।

আপনি সৃষ্টির অনন্য সৃষ্টি

প্রতিটি মানুষই সৃষ্টির অনন্য সৃষ্টি। আপনার মত আরেকটি মানুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মকাণ্ডে পূর্বে কখনো জন্ম গ্রহণ করেন নি, আগমীতেও জন্ম গ্রহণ করবে না। আপনার ইতিহাস আপনাকেই রচনা করতে হবে। আপনার ভূমিকা আপনি একাই পালন করবেন। আপনাকে আপনিই আবিষ্কার করবেন। প্রয়োগের মাধ্যমে আপনি নিজেকে উন্মোচিত করবেন। সীমাহীন সৃষ্টির মাঝে আপনি অনন্য। কিন্তু কতভাবে এবং কি পরিমাণে আপনি অনন্য হবেন সেটা নির্ভর করবে আপনি নিজেকে কত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন তার উপর।

নিজেকে জানার জন্যই জ্ঞান লাভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ লগ্নে আপনার জ্ঞান চর্চার প্রেক্ষিত জেনে নিন। কী হবে এই জ্ঞান দিয়ে? শুধু চাকুরীর জন্য লেখাপড়া করতে হলে ১৫টি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করলে চলে। কিন্তু জ্ঞানের জন্য লেখাপড়া করতে হলে প্রতি পর্যায়ে জ্ঞানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তাতে ফাঁক রেখে গেলে চলে না। বিদ্যুৎ–পরিবাহী তারে যেমন মাঝখানে ফাঁক থেকে গেলে বিদ্যুৎ–পরিবহন অচল হয়ে যায় তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তির মধ্যে ফাঁক রেখে গেলে প্রকৃত জ্ঞান আর অগ্রসর হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সব কিছু জেনে ফেলতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু জ্ঞানের যে শাখায় আপনি বিচরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার উত্তর–দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সীমান্ত অবশ্যই আপনাকে জেনে নিতে হবে। তার ভিত্তি জেনে নিতে হবে। তার মেথডোলজি জানতে হবে।

জ্ঞান অর্জন করতে এসে জ্ঞানের গভীরতা এবং বিস্তৃতি দেখে নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র জ্ঞান করবেন না। যাঁদের অবদানে এই ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে এবং ক্রমাগত হচ্ছে তাঁরাও আপনার মত এভাবে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। তাঁরা জ্ঞানের ভ্রু-কুচকানীতে ভয় পান নি। তাঁরা তাকে পোষ মানিয়ে তার সবলতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতাকে চিহ্নিত করেছেন। দুর্বল অংশকে সবল করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। অসম্পুর্ণতাকে পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন। জ্ঞান এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে হতে আপনি বরং নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আমরা কেন তাঁদের মত এরকম নতুন নতুন সংযোজন করতে

পারি নি? বিশ্বের ক্রম সম্প্রসারণরত জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমাদের অবদান নেই কেন?

বিশ্বের প্রয়োজনে আমি, নাকি আমার প্রয়োজনে বিশ্ব ?

তরুণ হিসেবে আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করুনঃ আমি কি বিশ্বের প্রয়োজনে নিজেকে গড়ে তুলবো? নাকি আমার প্রয়োজনে বিশ্বকে গড়ে তুলবো? আমাকে যদি আমার প্রয়োজনে বিশ্বকে সাজাতে হয় তবে বিশ্বের সকল রহস্যের সংগে আমার পরিচিত হতে হবে। এটাও নিজেকে জানার প্রক্রিয়ার একটি অংশ। এই প্রক্রিয়ার আরেকটি প্রয়োজনীয় ধাপ হচ্ছে নিজের আসন্ন পরিবেশকে জানা, নিজের সমাজকে জানা, নিজের দেশকে জানা। আমরা বাজারের চাহিদা অনুসারে নিজকে সাজাতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে আমাদের চাহিদা অনুসারে যে দুনিয়াকে সাজানো চলে এই আত্মবিশ্বাস আর নিজেদের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু করার এই শুভ লগ্নে আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই, আপনারা দেশের মানুষের সংগে, দেশের পরিবেশের সংগে, সমস্যার সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করুন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের গড়া জ্ঞান কাঠামো আমাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে, আমাদের চিন্তা এবং চোখকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে আমরা আর দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা তাদের মত করে বলা, জানা এবং দেখার আর অবকাশ রাখি না। পাশ্চাত্যের জ্ঞানচক্ষু দিয়ে আমরা আমাদেরকে দেখি, আমাদের সমস্যা বিশ্লেষণ করি। ফলে নিজেদের মাটির বাস্তবতা থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে নকল এক বাস্তবতার সৃষ্টি করি। এটা পাশ্চাত্যের দোষ নয়। তাদের জ্ঞানেরও দোষ নয়। এটা আমাদের দোষ। আমরা নিজেদের বাস্তবতাকে অন্যায়ভাবে পাশ্চাত্যের জ্ঞানের খোপে ভরে দিয়ে মনে করে নিচ্ছি সব কিছু রীতিশুদ্ধ এবং সব কিছু ঠিকঠিক মিলে গেছে।

দেশের মানুষের কাছে শিখুন

আপনাদের কাছে অনুরোধ দেশ থেকে শিখুন। দেশের মানুষের কাছে শিখুন। এটাই খাঁটি শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যে রকম আপনার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গ্রামের এক প্রান্তে চরম উপেক্ষায় বসবাসরত স্বামী তাড়িত বিরকি-বাঁধা মহিলা, ক্ষেতের কিষাণ, নদীর মাঝি সকলেই সমমানের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। আপনি যদি তাঁদের ছাত্র হতে জানেন জীবনের অনেক শিক্ষাই তাঁদের কাছ থেকে পাবেন, যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ করবে। এই শিক্ষা গ্রহণ না-করে অন্য শিক্ষা নিতে গেলেই ভুল হবে। যা কিছুই শিখুন নিজের সমাজ ও দেশের প্রেক্ষিতে তাকে সাজিয়ে নিন। তাতে আমরা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাবো। আমাদের জগৎ, আমাদের ভাগ্য আমাদেরকেই বানাতে হবে।

সমস্যার মধ্যেই তার সমাধানের বীজ নিহিত আছে। সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ছাড়া সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিদেশী পন্ডিতরা, বিশেষজ্ঞরা এসে

আমাদের সমস্যা আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের নিজেদেরকেই এটা বুঝতে হবে। নিজেদের মত করে।

আমরা যদি আমাদের জগৎটাকে আমাদের মত করে দেখতে শিখতাম, আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতাম তবে আমরাও জ্ঞানের সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারতাম।

জ্ঞানের রাজ্যের শিল্পী হবেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করার প্রথম পর্যায়েই আপনি নিজেকে জিজ্ঞস করুন জ্ঞানের রাজ্যে কি আপনি শুধুই পর্যটক হবেন'? শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে প্রধান দু'চারটা রাস্তার বাহার দেখেই কর্তব্য সমাধা করবেন'? আপনার শিক্ষক নিঃসন্দেহে জ্ঞানের রাজ্যের একজন অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী। তিনি আপনার কাছে এই শহরের প্রধান প্রধান দর্শনীয় বিষয়গুলি যত্নের সংগে তুলে ধরতে পারেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বেশী থাকলে তিনি এই শহরের অলিগলিও চিনিয়ে দেবেন। সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলির দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। আপনি যদি ভাগ্যবান/ভাগ্যবতী হন তবে এমন শিক্ষকও পেয়ে যাবেন যিনি এই শহরের সদর রাস্তা কিংবা বাই পাস রাস্তা, কিংবা অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বা অনুল্লেখযোগ্য সংযোজনী রচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু নতুন পর্যটক হিসেবে আপনি এই শহরের কোন অংশে উৎসাহিত হবেন, কোন অংশে আপনি বারবার ফিরে যেতে চাইবেন, কোন অংশ আপনাকে বিমোহিত করবে, কোন অংশ আপনার বিরক্তি কিংবা ক্ষোভের সৃষ্টি করবে সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপরই নির্ভর করবে। এ পর্যন্ত শুধু আপনি পর্যটকের ভুমিকাই পালন করলেন। কিন্তু এর চাইতে আরো অনেক বড় ভূমিকা পালন করার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। আপনি এই শহরকে সম্পূর্ণ নিজের শহর হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। এই শহর নির্মাণের শিল্পী হতে পারেন। যে কোন দুর্বল অংশ পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারেন। পুরনো অংশ ভেংগে নতুন করে গড়ে দিতে পারেন। কিংবা একেবারে সম্পূর্ণ নতুন অংশ জুড়ে দিতে পারেন। আপনি কি ধরনের ভূমিকা নেবেন সেটা আপনাকেই স্থির করতে হবে।

প্রিয় ছাত্রী বোনেরা

ছাত্রী বোনদের উদ্দেশে পৃথকভাবে দু'টি কথা বলি। এতক্ষণ যা বল্লাম আমার ভাষার দোষে তা যেন আপনারা মনে না-করেন এটা শুধু ছেলেদের জন্যই বলা। এগুলি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে বলতে চেয়েছি। আপনারা একবার দৃঢ় অংগীকার নিয়ে আমার কথাগুলি কাজে লাগাবার জন্য এগিয়ে আসলে তবে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন দ্রুততম গতিতে হবে। এটাই আমার বিশ্বাস। আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, উচ্চশিক্ষাকে একমাত্র সংসার জীবনে কাম্য অবস্থানে পৌছে সনদপত্রে রূপন্তরিত করবেন না। উচ্চশিক্ষ গ্রহণের পেছনে একটি বড় যুক্তি হচ্ছে এই শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীকে পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলে সমাজকে দ্রুত অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। আপনি যদি পেশার জগতে না ঢুকেন

তবে সমাজ একজন উপযুক্ত পেশাজীবীর সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। মনকে এখন থেকে শক্ত করুন। একে অপরকে উৎসাহিত করুন। শিক্ষা, প্রশাসন, ব্যবসায়, রাজনীতি, সাংবাদিকতা সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি নিন। আপনার পূর্বসুরীরা যাঁরা আপনাদের চাইতে বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এসেও কোন দিন পিছ পা হননি,যাঁরা দেশের জন্য অনুপ্রেরণাময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সাহস নিন। তাঁদের পথকে দৃঢ়তার সংগে বেছে নিন। তাঁদের ঐতিহ্যকে বলবতী করুন।

সফল হবো নাকি সার্থক হবো ?

একটা প্রশ্ন বারে বারে আপনার কাছে ঘুরে ফিরে আসবে। কখনো তার প্রতি মনোযোগ দেবার সুযোগ পাবেন। কখনো ভাল কোন জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না বলে হয়তো তাকে পাশ কাটিয়ে যাবেন। প্রশ্নটি হলোঃ আমি আমার জীবন নিয়ে কী করতে চাই? আমি নিজেকে কীভাবে দেখতে চাই? পেতে চাই? আমার জীবন সার্থক হবে কীভাবে? সফল হবে কীভাবে? আমি কি জীবনে সফল হতে চাই নাকি সার্থক হতে চাই?

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাল ফলাফল নিয়ে বের হয়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বিদেশে মোটা উপার্জন করা যায়, দেশে ফিরে এসে সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বসবাস করা যায়। সরকারী, বেসরকারী কর্মকর্তা হয়ে ধাপে ধাপে উপরে উঠে অনেক ক্ষমতা এবং আর্থিক সচ্ছলতা নিয়ে জীবন কাটানো যায়। এগুলি সফল হবার নিশ্চিত পথ। কিন্তু সার্থক হবার পথ কোনটি ?

সার্থক হবার শর্ত অনেক। আপনার নিজের পছন্দের শর্তগুলি আপনি নিজে বাছাই করে নেবেন। এই বাছাই প্রক্রিয়াটিও গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে নিজের সংগে পরিচয় হবে। বাছাই-এর সংগে সংগে শর্তগুলির অগ্রাধিকারগুলিও নিজে ঠিক করবেন। আপনার তৈরী অগ্রাধিকার তালিকা যদি অন্যের তৈরী অগ্রাধিকার তালিকার সংগে না মেলে তাতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। আপনি ক্রমাগতভাবে নিজের শর্তগুলি নিজের সংগে যাচাই করতে থাকুন, নিজের অগ্রাধিকার তালিকা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিজে নিশ্চিত হতে থাকুন। নিজের বিবেচনা শক্তির উপর আস্থা রাখুন।

আপনার বিবেচনা শক্তির উপর আমি আমার পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে আমার কথার সমাপ্তি টানলাম।

১৯৯৩ সালে আপনারা যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের মানুষের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকুন–এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অনেক আশা নিয়ে আপনাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগতঃ জানাচ্ছি।

আপনাদের প্রত্যেকের জীবন সার্থক হোক।

মাননীয় উপাচার্য মহোদয়, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ, নবাগত ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

---

২৫ জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক মিলনায়তনে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুলিশের আধুনিকায়ন

পুলিশ বাহিনীর কোন অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করা হবে আমি ভাবি নি। ছোট বেলা থেকেই আমি পুলিশকে ভয় পাই। পুলিশের কাছ থেকে দূরত্ব রাখাই শ্রেয় মনে করে এসেছি। কিভাবে আমার মনে এই ভয় ঢুকেছে জানি না। তবে সেটার অস্তিত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমি বরাবরই অনুভব করে এসেছি। আমার ধারণা সকলেই আমার মত পুলিশকে ভয় পায়। "পুলিশ সপ্তাহ ১৯৯৩" উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রণ পেয়ে আমার সে-ভয় আরো জোরদার হয়েছে। লিখিতভাবে কিছু বলার হুকুম পেয়েই আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি আমাকে শাস্তি দেয়ার একটা মোক্ষম মওকা আমার পুলিশ বন্ধুরা পেয়ে গেছেন। পুলিশ সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। কোনদিন এটাকে কিসের আলামত হিসেবে কার আদালতে হাজির করা হবে বোঝা মুশকিল।

পুলিশ বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি পুলিশের মহাপরিদর্শক জনাব এ, এস, এম, শাহজাহান এবং অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক জনাব কাজী গোলাম রহমান এর নিকট ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর দৃপ্ত আইনরক্ষাকারী

"বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়নকে" আপনারা এবছরের সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্বাচিত করে যখন আমাকে সেমিনারে

মূল বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তখনই টের পেয়েছি আপনারা আধুনিকতম ইলেকট্রনিক গেজেটসমূহ এবং মার্কিন টেলিভিশনের পুলিশ বিষয়ক চমকপ্রদ সিরিজসমূহে প্রদর্শিত নানারকমের আড়িপাতার যন্ত্রপাতি এবং মারণাস্ত্রের গুণাবলী বর্ণনা করার জন্য আমাকে খুঁজে বের করেন নি। বিশেষ করে "আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের" কথাটি গোড়াতেই জুড়ে দিয়ে আমাকে আমার ভংগীতে বিষয়টি উত্থাপন করার যে সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার আজকের বক্তব্যে আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষ করে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্বন্ধে কিছু না-বলার অর্থ যেন এই মনে করা না—হয় যে পুলিশ বাহিনীকে কার্যকর করার ব্যাপার এই প্রযুক্তির উপর আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। আপেক্ষিক গুরুত্বের বিচারে আমার কাছে যে বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আজ শুধু সেটাই উত্থাপন করলাম।

আমি গভীরভাবে অনুভব করি যে পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়ন প্রয়োজন। বাইরের সাজসজ্জা বা উচ্চ মার্গের প্রযুক্তিতে বলীয়ান আধুনিকতম যন্ত্রপাতির ছড়াছড়ি দিয়ে নয়—বরং মনের দিক থেকে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী অতীতের কোন শাহেনশাহের কোতোয়াল নয়। কোন ঔপনিবেশিক সরকারের লাঠিয়াল বাহিনীও নয়। স্বাধীন সভ্য জনগোষ্ঠীর আইন শৃংখলা রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানকারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে চরম দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা নিতে অংগীকারাবদ্ধ একটি মেধাদীপ্ত জাতীয় সংগঠন।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে অনেক গৌরবের কাহিনী আছে। বাংলাদেশের অন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মত অগৌরবের গাঁথামালাও তাঁদের কম নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে পুলিশের যে ভাবমূর্তি তৈরী হয়ে আছে সেটি আমার ধারণা ঔপনিবেশিক লাঠিয়াল বাহিনীরই কাছাকাছি—স্বাধীন গণতান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর দৃপ্ত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছাকাছি নয়। আমার ধারণা যদি বাস্তবের কাছাকাছি হয় তবে পুলিশ বাহিনীকে আজকের দিনের প্রয়োজনীয় ভূমিকায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া শুধু জরুরী নয়, অতি জরুরী। তার জন্য লাগসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী করতে হবে, কর্ম পদ্ধতিকে নতুন করে দাঁড় করাতে হবে। মানুষের সংগে পুলিশের সম্পর্কের নতুন রূপরেখা দাঁড় করাতে হবে। এই নতুন সম্পর্কের ভিত্তি হবে পরস্পরের প্রতি নিখাদ আস্থা। কারো প্রতি ভীতি থাকবে না। সৎ মানুষকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জীবন্ত আশ্বাসের নামই হবে পুলিশ বাহিনী। সৎ মানুষ হবে পুলিশের বন্ধু। পরস্পরের সংগে থাকবে অন্তরংগতার বন্ধন।

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়ন হবে এই নতুন ভাবমূর্তি অর্জনেরই প্রক্রিয়া। এর জন্য খুব একটা নতুন ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু নতুন উদ্যোগ এবং অনুশীলন লাগবে অফুরন্ত।

সমাজের চেহারা নির্ধারণে পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

পুলিশ বাহিনী তার কর্তব্যের মূল বিষয়টিকে চারটি সুন্দর সবল শব্দে প্রকাশ করে ঃ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। এতে পুলিশের কর্তব্য সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ কারো নেই—না পুলিশ ভাইদের না-বোঝার সুযোগ আছে, না-নাগরিকদের ভুল বোঝার সুযোগ আছে। এই স্পষ্ট ঘোষণার কারণেই সবাই জানে পুলিশ বাহিনী এই কর্তব্য পালনে এপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এটা তাঁরাও জানেন, মানুষও জানে।

কর্তব্য পালনে সফল হওয়াটা সহজে বুঝা যায়। ব্যর্থ হওয়াটা সহজে বুঝা যায় না। ব্যর্থ হওয়ার পরিমাণ নিয়ে একমত হওয়া যায় না। আংশিক ব্যর্থ হওয়া এক জিনিস। পুরো ব্যর্থ হওয়া আরেক জিনিস। একেবারে বিপরীত ভূমিকা পালন করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। যেমন ঃ দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন না-করে শিষ্টের দমন দুষ্টের পালন করা। সম্ভাবনার এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্তের মধ্যে কোন জায়গায় আজকের পুলিশ বাহিনীর অবস্থান এটা খোলাখুলি আলোচিত হওয়া উচিত।

আত্মতৃপ্তি, আত্মপ্রসাদ আমাদের নিজেদেরকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে মোটেই সহায়ক হবে না। একথা বলে পাশ কাটিয়ে গেলেও চলবে না যে সমাজের বর্তমান যা-রূপ পুলিশ বাহিনীর রূপও সমাজের সামগ্রিক রূপের সংগে সাজুষ্যপূর্ণ হবে—এটাই ত স্বাভাবিক। বৃহত্তর সমাজের চাইতে পুলিশ বাহিনী ভালো হবে কিভাবে? আমি বরং উল্টোটা বলবো। পুলিশ বাহিনী যে গুনগত মানের হবে বাকী সমাজের চেহারাও তার আদলে গড়ে উঠবে। পুলিশ বাহিনীর প্রভাব সমাজের চেহারার উপর খুব দ্রুত এবং নিশ্চিতভাবে পতিত হয়। যাঁদের হাতে সৎলোককে রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁরা যদি সৎলোককে রক্ষা করতে না-পারেন তবে সমাজে সৎলোকের সংখ্যা কমবেই। আর যাঁরা সৎলোককে রক্ষা করার দায়িত্বে আছেন তাঁরা যদি সৎলোককে অসৎ করার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন তাহলে সমাজে সৎলোকের অস্তিত্বই থাকবে না।

আমি একটা কথা পরিস্কার করে নিই। মানুষ পুলিশের আশ্রয়ে থাকবে সেটা আমি মোটেই কামনা করি না। মানুষ থাকবে আইনের আশ্রয়ে। পুলিশের দায়িত্ব হবে যারা আইনের আশ্রয়ে থাকবে তাদের জন্য আইনের শক্তি নিশ্ছিদ্রভাবে নিশ্চিত করা। এটার জন্যই জনগণ তাদেরকে নিয়োগ করেছে। জনগণ পুলিশের কাছে করুণাপ্রার্থী নয়। তাদের কাছে পাওনাদার।

বাদশাহী পুলিশ কিংবা ঔপনিবেশিক শক্তির পুলিশ তাদের নিজ নিজ মালিকের স্বার্থে চলে। তাই জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে চলে। এজন্যই সে পুলিশ বাহিনীকে মানুষ ভয় পায়। সেই পুলিশ বাহিনী তার কাজে সাফল্য অর্জন করে মানুষের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে : জনগণ তাকে যত ভয় করবে বাদশার উদ্দেশ্য ততই সফল হবে। জনগণের পুলিশ জনগণের বন্ধু। শুধু আইনভংগকারীরাই পুলিশকে ভয় করবে। সেরকম সম্পর্ক এখনো আমাদের দেশে গড়ে উঠে নি।

আইনের শাসন

স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজের সব চাইতে বড় রক্ষাকবচ হলো আইনের শাসন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটা গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় গেলেই গণতন্ত্র চালু হয়ে যায় না। এতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করার প্রথম শর্ত পালন করা হলো মাত্র। তারপর আরো অনেক শর্ত পালনের পথ বেয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। গণতন্ত্রের সকল শর্তের মধ্যমণি হলো আইনের শাসন।

বাংলাদেশে আমরা এখনো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হবার সংগে সংগে আইনের বাইরে বিচরণকারীদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাবে—এরকম একটা আশা জেগেছিল মানুষের মনে। সে-আশা পূরণ হচ্ছে না। আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে না। পুলিশকে যদি আইনের শাসনের প্রতীক মনে করা যায় তবে বলতে হবে যে তারা এখনো বড় দুর্বল প্রতীক। কারণ পুলিশের ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছাক্রমে পুলিশের ক্ষমতাবলয়ের বাইরে বিরাট এক জগৎ বিরাজ করছে। সে জগতের সংগে সমঝোতা করে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে দিন কাটাতে হয়। এই সমঝোতা শক্তিধরের সংগে দুর্বলের সমঝোতা। একতরফা সমঝোতা। অবমাননামূলক সমঝোতা। নগ্নশক্তির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবার মত অসহায়ত্বের সমঝোতা।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যতটুকু আইন প্রয়োগ করছেন তা-ও আবার ক্রটিযুক্ত। সবার জন্য আইন একরকম নয়। একেকজনের জন্য আইন একেক চেহারায় আসছে। মানুষের চেহারার, তার পরিবারের চেহারার সংগে সংগতিপূর্ণ করার জন্য আইনকে প্রতিনিয়ত টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে। কখনো টেনে লম্বা করা হচ্ছে। কখনো ছেঁটে প্রায় অদৃশ্য করে দেয়া হচ্ছে। তার উপর আইন প্রয়োগকারীদের প্রয়োগ ক্ষমতাকে কখনো নাকচ করে দেয়া হচ্ছে। অলিখিত নিয়মের পাল্লায় পড়ে আইন আর আইন থাকছে না।

মানুষের আস্থার পরিমাণই আইনের নির্ধারক। যে আইনের প্রতি মানুষের আস্থা নেই সে-আইন কোন আইনই নয়–এটা হয় অত্যাচারের, অবিচারের হাতিয়ার। আইনের উপর মানুষের আস্থা আসে যখন মানুষ দেখে আইনের সামনে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র,ক্ষমতাশীল আর ক্ষমতাহীন সবাই এক সমান। আমাদের সমাজে এরকম আইন আর নেই। এখানে রীতিরেওয়াজ অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেছে। এ সমাজে যিনি যত উপরে তিনি তাঁর সামাজিক উচ্চতার পরিচয় দেন কত বড় আইনকে তিনি বুড়ো আংগুল দেখাতে পারেন তা দিয়ে। আইন ভাংগার বীরত্ব দিয়েই মানুষের সামাজিক মর্যাদার পরিমাপ হচ্ছে।

মাস কয়েক আগে একটা ছোট খবর দেখেছিলাম পত্রিকায়। যুক্তরাজ্যের একজন মন্ত্রী বিনাটিকেটে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন বলে ট্রেনের টিকেট—চেকার তাঁর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করেছেন। মন্ত্রী মহোদয় তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে লন্ডনে ফিরছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে তাঁকে নাজেহাল হতে হয়েছিল। ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল তাড়াহুড়ার মধ্যে ট্রেনে উঠতে

গিয়ে টিকেট করার সময় পান নি। কিন্তু যে আইনে জরিমানা করা হয়েছে সে আইনে চেকারের কাছে কোন ব্যাখ্যা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। রেল ভ্রমণের আইনে মন্ত্রী একজন যাত্রী মাত্র–বিনা টিকেটের যাত্রী। চেকার তাঁকে মাফ করার কথা চিন্তা করেন নি। মন্ত্রীও চেকারের চৌদ্দ গোষ্ঠীকে গালিগালাজ করেন নি, কিংবা চৌদ্দ গোষ্ঠীর চাকুরী খাবেন বলে তর্জন-গর্জন করেন নি। এটাই হলো আইনের শাসন।

বাংলাদেশের কোন মন্ত্রী বিনা টিকেটে ট্রেনে ভ্রমণ করলে টিকেট চেকার তাঁকে জরিমানা করবেন কি? এরকম ঘটনা ঘটতে দেবার সুযোগ বাংলাদেশে নেই। মন্ত্রীর সংগে ট্রেন সফরের আমার যা অভিজ্ঞতা সেটা হলো ট্রেনের যাত্রার সময় বিলম্বিত করার অভিজ্ঞতা। ট্রেনকে অপেক্ষা করতে হয়েছে মন্ত্রীর জন্য। ট্রেনের অসংখ্য যাত্রীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে মন্ত্রীর এসে পৌঁছার জন্য।

বাংলাদেশে আমরা বহু লোক বাস করি। কিন্তু দেশটা আয়তনে খুবই ছোট। মানুষ বেশী হওয়ার কারণে হোক, দেশ ছোট হবার কারণে হোক, কিংবা আমরা পেটে কথা রাখতে পারি না বলেই হোক–সবাই সবার হাঁড়ির খবর জেনে ফেলি। বাংলাদেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার একটি অনন্য ক্ষমতা সবার কাছে কিংবদন্তীর মত জানা। সবার সব খবর দ্রুত সংগ্রহ করার ক্ষমতা। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সারারাত ধরে হাজার হাজার রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়, বিভিন্ন জমকালো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ছড়াছড়ি দেখা যায়, পুলিশ ভাবখানা এমন করে যেন তারা গুলির শব্দ শোনে নি, কাউকে দেখে নি, কাউকে তারা চেনে না। গ্রামের মধ্যে একজন খুন হলে পুলিশ একটা তোলপাড় কাণ্ড করে। পুলিশের ভয়ে বহু নিরীহ মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র খুন হলে খুনীকে ধরার কথা যেন পুলিশের মনেই পড়ে না।

বেআইনী হুকুমও কি মানতে হবে ?

সরকারী কর্মকর্তারা প্রায় তাঁদের অপারগতার ব্যাখ্যা হিসেবে বলেন, "আমরা আর কি করতে পারি, আমরা ত হুকুমের গোলাম।" কার হুকুমের গোলাম? কোন হুকুমের গোলাম? সব হুকুমের গোলাম? তাঁরা কি এতই গোলাম? তাঁরা কি মিশরের পিরামিড নির্মাণকারী দাসদের মতই গোলাম?

আমার মনে হয় না তাঁরা যত গোলাম বলে দশজনকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তত গোলাম। তাঁরা জানেন তাঁরা বেআইনী হুকুম, অন্যায় হুকুম পালন করতে বাধ্য নন। সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পর্যন্ত উপরঅলার হুকুম মানার উপর একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। নুরেমবার্গের বিচারে উপরঅলার হুকুম-মানার এই সীমারেখা অতিক্রম করার জন্য সামরিক অফিসারদেরকে যুদ্ধপরাধী হিসেবে বিচার করা হয়েছে, শাস্তি দেয়া হয়েছে।

প্রশাসনে, আইন প্রয়োগে এই সীমারেখা লংঘনের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে রয়েছে। শুধু একটি দৃষ্টান্ত দেবো। অতীতে বিভিন্ন সরকারের অধীনে বিভিন্ন নির্বাচন ও গণভোটের নামে যে প্রহসন করা হয়েছে তা সকল প্রকার

সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতাতেই হয়েছে। একাজে তাঁদের কেউ আপত্তি তুলেছেন বলে শুনি নি। কেউ বলেন নি এটা বেআইনী কাজ, এটা আমরা করতে পারবো না।

আসলে আমরা উপরঅলার হুকুম মানার ব্যাপারে সীমারেখার সন্ধান করি না। কারণ এই সন্ধান করাটা আমাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। আমারে স্বার্থ হচ্ছে পরম উৎসাহে উপরঅলার হুকুম মানার তোড়জোড় করা। আমরা উপরঅলাদের অসন্তুষ্ট করতে চাই না। শুধু উপরঅলা একাই কেন, তাঁর আশেপাশের কাউকে, এমন কি তাঁর বাসার কাজের লোকদেরকে পর্যন্ত অসন্তুষ্ট করতে চাই না। কারণ উপরঅলা অসন্তুষ্ট হলে আমাদের নিজেদের বেআইনী কাজগুলোতে বাধা পড়বে। বাধা পড়ুক আর না—পড়ুক, অন্ততঃ তার দিকে উপরঅলার দৃষ্টি পড়বে। দরকার কি খামোকা ঝামেলা বাড়িয়ে। অথচ উপরঅলার বেআইনী হুকুম বা অনুরোধ মানাটা খুবই সুবিধাজনক। এতে নিজের আইনবহির্ভূত ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে। আর ঐ বেআইনী হুকুম মানতে গিয়ে বেআইনী কাজের আওতাটা বিনা বাধায় বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিয়ে আর্থিক সুবিধারও একটা সুযোগ করে নেয়া যায়। নিশ্চিন্তে থাকা যায় যে এতে উপরঅলার অসম্মতি হবে না।

আমরা উপরঅলার অন্যায় হুকুম আনন্দ সহকারে মানছি। এমনকি উপরঅলার অন্যায় অনুরোধকে তড়িৎ গতিতে হুকুমে পরিণত করে ফেলে তাকে বাস্তবায়িত করছি। তার চাইতে আরো বড় ব্যাপার হলো আমরা সুযোগ পেলেই উপরঅলাকে আইন ভাংগার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাচ্ছি, সাহস যোগাচ্ছি, কায়দাকানুন বাৎলে দিচ্ছি। যেকোন রকম বড় আকারের আইন ভাংগার কাজ যে আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সংগে"ম্যানেজ" করার ব্যাপারে সুদক্ষ সেটা উপরঅলার কাছে প্রমাণ করার জন্য আমি অস্থির হয়ে থাকি। তাঁর কাছে শুধু সুযোগ প্রার্থনা করি।

দেশে সৎ মানুষের অভাব নেই

দেশে সৎ মানুষের অভাব নেই। দক্ষ মানুষের অভাব নেই। দেশপ্রেমিক মানুষের অভাব নেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানে, সরকারের বাইরে সকল পেশায় অফুরন্ত সৎ মানুষ আছে এদেশে। আমাদের মুশকিল হয়েছে যে আমরা সবাই মিলে দেশ চালানোর এমন এক সিস্টেম রচনা করেছি, এমন এক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছি যে এর কবলে পড়ে ভালো মানুষরা হয় খারাপ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে ভরসা পাচ্ছেন না, কিংবা তাঁরা হতাশ হয়ে হাত—পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। এই চরম দারিদ্র্যের দেশে এটা কারো জন্য সুসংবাদ নয়।

দেশের কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের অবমাননা থেকে এবং নিজেদেরকে নপুংসক জাতির পরিচয় থেকে বাঁচাতে হলে এই সিস্টেম পাল্টাতেই হবে। পুলিশের মধ্যে পরিবর্তন এনে এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই রাজারবাগের পুলিশ ব্যারাক

থেকেই ত শুরু হয়েছিল। নতুন পথে যাত্রার জন্য এটাই ত পবিত্র স্থান। এর নামই হোক "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে পুলিশের আধুনিকায়ন"।

পুলিশ সপ্তাহ ১৯৯৩ সফল হোক। একটি আত্মমর্যাদাশীল সভ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে পৃথিবীতে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জনে পুলিশের ভূমিকার গুরুত্ব যেন আমরা সবাই অনুভব করতে পারি। পুলিশ বাহিনী সমাজকে গৌরবের পথে নিয়ে যেতে সহায়ক হোক।

ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

"পুলিশ সপ্তাহ ১৯৯৩" উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারী ১৯৯৩ তারিখে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত।

আগামী দিনের সরকার যেন মাস্তানীর পথে পা বাড়াতে না পারে

আপনাদের হয়তো জানা আছে গ্রামীণ ব্যাংক বিনা জামানতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৮ ভাগ। এই ব্যাংক থেকে এখন ২০,০০০ গ্রামের ৯ লক্ষ গরীব মানুষ ঋণ নিচ্ছে। এই ৯ লক্ষ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ হলেন মহিলা। যাঁরা এই ব্যাংক থেকে ঋণ নেন তাঁরাই আবার এই ব্যাংকের ৭৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক। বাকী ২৫ শতাংশ মালিকানা সরকারের। সে হিসেবে দেখতে গেলে গ্রামীণ ব্যাংক এদেশের গরীব মহিলাদের মালিকানায় পরিচালিত একটি ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদে মোট ১৩ জন সদস্য। তার মধ্যে ৯ জন ঋণগ্রহীতা শেয়ার মালিকরা তাঁদের মধ্য থেকে নির্বাচন করেন। এখন পরিচালনা পরিষদে যে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য আছেন তাঁদের ৯ জনই মহিলা।

মহিলাদের সম্মেলনে এসে একথাটি উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। গরীব মহিলারা যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের সংসারে উন্নতি আনার দায়িত্ব নিতে পারেন, ব্যাংকের ঋণ নিয়ে শতকরা ৯৮ ভাগ হারে ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারেন, ব্যাংকের মালিক হতে পারেন, ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য হয়ে ব্যাংক পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে মহিলাদের যে অংশ এঁদের চাইতে অনেক বেশী ভাগ্যবতী তাঁদের ক্ষমতা নিশ্চয়ই আরো বহুগুণ বেশী। কিন্তু সমাজের এই ভাগ্যবতী মহিলারা তাঁদের সেই ক্ষমতা কি যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করছেন? নাকি ক্ষমতা তাঁদের অজান্তে সুপ্ত অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে–বিকশিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না বলে।

ব্যাংকের মালিকানার কথা থেকে আমরা দেশের মালিকানার কথায় আসি। দেশের মালিক দেশের সকল নাগরিক। সকল নাগরিকই সমান মালিক। এখানে কেউ বড় মালিক নাই, কেউ ছোট মালিক নাই। দেশের অর্ধেক সংখ্যক নাগরিক মহিলা বলে দেশের মালিকানার অর্ধেক মহিলাদের কাছে। কিন্তু দেশের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হবে না এই কথাটি পুরুষদের মনে কখনো উদয় হয়। পুরুষদের দোষ দিয়ে কি লাভ। মহিলাদেরই কি কখনো একথা মনে পড়ে? এ যেন এমন ধরনের মালিকানা যেখানে মালিক গরজ করেন না বলে মালিকানা থাকা সত্ত্বেও তা মালিকের দখলে নেই। বেগরজমহিলা মালিকরা তাঁদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগ নেবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত তাঁদেরই নিতে হবে।

আমি মহিলাদের একজন না-হয়েও প্রসংগটি উত্থাপন করলাম আমারই স্বার্থে। আমার নাগরিক স্বার্থে। মহিলারা তাঁদের ভাগ বুঝে নিতে এগিয়ে আসলে এমন কতকগুলি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি পড়তো যেগুলি এদেশের সকল নাগরিকের মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়ক হতো। যেমন ঃ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

আজ পর্যন্ত আমরা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। পাকিস্তান আমল থেকে এই পর্যন্ত আমরা কখনো কাটিয়েছি 'সম্রাটের' শাসনাধীনে, কখনো 'আমীর ওমরাহদের' শাসনে,কখনো 'মহারাজা'র শাসনে। আইনের শাসনে বসবাস করার সুযোগ আমাদের বড় একটা হয় নি। যিনিই-শাসক–তিনিই–আইন হতে গিয়ে আইনের নানা শ্রেনীবিন্যাস হয়েছে ঃ শাসক নিজের জন্য এক আইন, শাসকের স্ত্রীর জন্য এক আইন, শাসকের সন্তানের জন্য এক আইন, শাসকের আত্মীয়-স্বজনের জন্য এক আইন, শাসকের বন্ধু-বান্ধবের জন্য এক আইন, প্রজাদের জন্য তাদের দূরত্বভেদে ভিন্ন ভিন্ন আইন।

আইনের শাসনের খুঁটি থেকে প্রশাসনের দড়ি একবার ছিঁড়ে গেলে নাগরিকদের আর আশ্রয় নেবার জায়গা থাকে না। আইনের ভিত্তি থেকে উৎপাটিত শাসন দুঃশাসনে পরিণত হতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না বলেই আমাদের জাতীয় জীবনে সন্ত্রাস কেবলই আমাদের পথ আগলে ধরছে। সরকারের সযত্ন লাগনে, সরকারের প্রশ্রয়ে সন্ত্রাসের জন্ম হয়। সরকারী যন্ত্রের মাধ্যমে, সরকারী যন্ত্রের আশ্রয়ে সন্ত্রাস বিকাশ লাভ করে। উপরওয়ালা আইন ভাংগার এক চুল ইশারা করলেই নীচেরওয়ালা দেড় গজ আইন ভেংগে কৃতিত্ব জাহির করেন।

মাস্তানদের উৎপাত নিয়ে আমরা প্রায়ই আলোচনা করি। মাস্তানের যে ছবি আমাদের সামনে তুলে দেয়া হয় সেটি হচ্ছে মোটর সাইকেলে চড়া, কালো চশমা পরা,আলুথালু পোষাক-পরা, ঝাকরা চুলের একটি তরুণ। কিন্তু সরকারী মাস্তানের যে উৎপাত তার যে দোর্দণ্ড প্রতাপ, রাতকে দিন, দিনকে রাত করার তার যে ক্ষমতা, নিরপরাধকে অপরাধী এবং জঘন্য অপরাধীকে সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত করার তার যে নৈপুণ্য, তার সামনে ত এই তরুণের উৎপাত একেবারে নস্যি। সরকারী মাস্তানের ছবি সসম্মানে খবরের কাগজে ছাপা হয়। সমাজে তাঁদের সম্মানের পরিচিতি। তাঁরা সম্মেলনে বাণী দেন। উৎসবের প্রধান অতিথি হন। অনুষ্ঠানের ফিতা কাটেন। মেয়ের বিয়ে, ছেলের বিয়েতে তাঁকে আনতে পারলে আমাদের জন্ম সার্থক মনে হয়। তিনি স্বয়ং যদি আমার সন্তান হন, পিতা

হন, ভাই হন, বন্ধু হন, তাঁর গৌরবে আমি সর্বক্ষণ গৌরবান্বিত বোধ করি। তাঁর সংগে আমার সম্পর্কের কথা যখন তখন সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিই।

মোটর সাইকেলে চড়া মাস্তানের কথা ভেবে একটা সান্তনা পেতাম মনে মনে–যাক বাবা, আমার ছেলে এদের দলে নাই। কিন্তু সরকারী মাস্তানের কথা চিন্তা করে কি এরকম স্বস্তি পাবো? এঁরা কি আমাদের অতি ঘনিষ্ঠদের মধ্যেই কেউ নন? অথবা আমরা নিজেরাই কি এঁদের এক একজন নই? সরকারই যদি দেশের সব চাইতে বড় মাস্তান হয়ে পড়েন তখন সরকারের ভেতরে বাইরে কি আর কারো নিস্তার থাকে?

প্রায় প্রতিদিন নানা উপলক্ষে আমরা জাতীয় সঙ্গীত শুনছি। নিজেরাই গাইছিও অনেক সময়। আজ সম্মেলনের শুরুতেই সকলে মিলে গাইলাম ঃ "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"। কিন্তু আসলে ভালবাসি কি? সকল সাক্ষীপ্রমাণ একত্র করলে কোন দিকের পাল্লা ভারী হবে? ভালবাসার পাল্লা, নাকি ভাল না–বাসার পাল্লা। আমরা প্রত্যেকে নিজের চেহারাকে ভালবাসি। এচেহারার আরো খোলতাই হোক. এটা আরো আকর্ষণীয় হোক তার চেষ্টা করি। নিজের ছেলেমেয়েদের উন্নতি কামনা করি। তাদের প্রতিপত্তি কামনা করি। সম্ভ্রান্ত এলাকায় তাদের জন্য সুদর্শন বাড়ীর ব্যবস্থা করার চেষ্টা করি। এগুলি ভালবাসার চিহ্ন নিশ্চয়ই। কিন্তু একদিকে ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে অন্য দিকে কত নিষ্ঠুর হচ্ছি, দেশের কত কি দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছি. দেশকে কি রকম বিকলাংগ করে দিচ্ছি সেদিকে কি আমরা খেয়াল রাখছি? ভালবাসা দেবার যে–আগ্রহ জন্মে, দানে যে–আনন্দ হয়, দেশকে কিছু দেবার ব্যাপারে আমরা কি এই আনন্দ অনুভব করি? নাকি নেবার ব্যাপারেই খালি আনন্দ।

বাংলাদেশের মানুষ মনের গহীনে বাংলাদেশকে ভালবাসে না এটা আমার বিশ্বাস হয় না। এক অপ্রতিরোধ আকর্ষণের বন্ধনে আমরা এদেশের আকাশ, মেঘ, মাটি, পানি, পাখী, মানুষের সংগে আবদ্ধ। আমাদের সকল অনাচার, অবিচার, দ্বন্দ্ব, সজ্ঞান অবহেলার মধ্যেও এই বন্ধন আমাদের মধ্যে নিজেদের অজান্তে মনের কোণে হঠাৎ ব্যাখ্যাহীন বেদনা জাগায়।

যতদিন আমাদের মধ্যে এই বেদনাবোধ থাকবে ততদিন আমাদের মধ্যে সম্ভাবনা বেঁচে থাকবে। এখনো এ-সম্ভাবনা বেঁচে আছে বলে আমরা আগামী নির্বাচনের দিকে আমাদের পুঞ্জিভূত সকল কামনা নিয়ে তাকিয়ে আছি। আমরা এই ঐতিহাসিক সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে চাই। দেশে প্রথমবারের মত মজবুত ভিতের উপর গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। দেশের আগামী সরকার যাতে মাস্তানীর পথে পা বাড়াতে না-পারে তারজন্য দুর্ভেদ্য ব্যুহ রচনা করতে চাই। মাস্তান সরকারের কাছ থেকে আমরা চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পেতে চাই। আমার বাবা, আমার চাচা, আমার স্বামী, আমার সন্তান, আমার ভাই, আমার বোনকে যেন কোন সরকারের অধীনে আর কোনদিন মাস্তানীর ঘৃণ্য ভুমিকায় নামতে না-হয় তার নিশ্চিত ব্যবস্থা চাই।

জাতীয় নির্বাচন একেবারে দোড় গোড়ায়। এবার যেন আমাদের মালিকানা বুঝে নেবার সুযোগ হাতছাড়া না–হয়। দারিদ্রমুক্ত, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে

তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার সুযোগ থেকে যেন আমরা আর বঞ্চিত না-হই।

নির্বাচন কত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হবে সেটা আমাদের সকলের উপরই নির্ভর করছে। আমরা কি ভেবে দেখেছি আমরা এব্যাপারে কি করবো? দেশের সকল সরকারী–বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, শিক্ষায়তন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুনির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসলে সুনির্বাচন অবশ্যই হবে। নির্বাচনের দিন ভোট দেয়ার পর আমরা ঘরে ফিরে না-গিয়ে ভোটকেন্দ্রে বাইরে সারাদিন অপেক্ষা করে যদি ভোটকেন্দ্র পাহারা দিই তাহলে ভোটকেন্দ্রে গোলযোগ হবার সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে কমে যাবে। আমরা নিজ সম্পত্তি পাহারা দেবার জন্য যত দৃঢ়তা দেখাই যদি একই দৃঢ়তা দেশের উপর আমাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে দেখাই তবে আমাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না- হয়ে যায় না।

আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য এবং গৌরবময় দীর্ঘ জীবন নিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ভূমিকা লাভ করুক এটাই হোক আমাদের সকলের কামনা।

চলুন, আজকের এই সম্মেলনের পক্ষ থেকে, আগামী দিনের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আসন্ন নির্বাচনে যে-দল, বিজয়ী হবে তাদেরকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাদেরকে বলি, দেশের মানুষ প্রথমবারের মত মুক্ত পরিবেশে তাঁদের রায় ঘোষণার মাধ্যমে আপনাদের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন। আপনারা দেশের মানুষের এই আস্থার পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে আপনাদের দায়িত্ব পালন করবেন আমরা এই আশা প্রকাশ করছি। আপনারা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাস্তানীর যন্ত্রে পরিণত করবেন না, আপনাদের কাছ থেকে এই আশ্বাস চাচ্ছি। মেহেরবানী করে আপনাদের কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে আশ্বস্ত করুন। বাংলাদেশের সকল মানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আমরা আপনাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থনের অংগীকার জানাচ্ছি।

এই সংগে আমরা একথাও আপনাদেরকে পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখতে চাই যে আইনের শাসনের পরিবর্তে যদি আপনাদেরকে খেয়ালখুশীর শাসনের দিকে অগ্রসর হতে দেখি, সরকারী মাস্তানীর দিকে এগিয়ে যেতে দেখি তাহলে আমরা সমবেতভাবে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাবো। দেশের মালিকানা এবার আমরা বুঝে নিয়েছি। আমাদেরকে আর বেদখল করতে পারবেন। না।

ইনার হুইল ক্লাব জেলা ৩২৮ আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারীতে সুনির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক এবং নির্বাচনোত্তরকালে আইনের শাসন নিশ্চিত করার কাজে শংকাহীন ভূমিকা পালন করুক এই কামনা করে আমি সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আমাকে আপনাদের সম্মেলনে আমন্ত্রণ করে যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্য আবারো আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জনাব গভর্ণর, মাননীয় সভানেত্রী, সুধীবৃন্দ আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

হোটেল আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-এ অনুষ্ঠিত ইনার হুইল জেলা ৩২৮ সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ তারিখ ১৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

পরবর্তী বিশ বছরের জন্য কি প্রস্তুতি নেবো ?

অনেক উত্তেজনা, আশা, আকাংখা, হতাশা, বিস্ময় তৃপ্তি, অতৃপ্তি মেশানো একটা বছর আমাদের কাছ থেকে সবে বিদায় নিয়ে গেলো। দেশের ভেতর যা ঘটেছে, দেশের বাইরে যা ঘটেছে সব মিলিয়ে সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ১৯৯১ সাল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য সাল হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। পৃথিবীর ইতিহাসেও এবছরটি নিশ্চিতভাবে স্থান পাবে। এ বছরে বহু অবিশ্বাস্য, কল্পনাতীত ঘটনা ঘটে গেলো পৃথিবীতে।

গত বছরটি আমাদের জন্য শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড উৎসাহের মধ্য দিয়ে। জাতির সুপ্ত শক্তির এবং একান্ত কামনার একটি চমৎকার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। আশ্চর্য স্বতঃস্ফূর্ততা এবং নিপেক্ষতার মধ্য দিয়ে একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে একটি নতুন সরকার গঠিত হলো। গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয়ে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে ফিরে গেলাম আমরা। যেরকম বান-ডাকা উৎসাহ নিয়ে বছর শুরু হয়েছিল সেটাকে ধরে রাখতে পারা যে কোন সরকারের জন্যই একটা কঠিন কাজ হতো। কিন্তু ধরে রাখতে পারলে এই উৎসাহের বাতাসে পাল উড়িয়ে জাতি তার দুর্গম পথের অনেকটা পথ অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারতো।

উৎসাহটা ধরে রাখতে পারি নি

আমরা উৎসাহটা ধরে রাখতে পারি নি। বছরের বয়স যতই বেড়েছে আমাদের উৎসাহে ততই টান পড়েছে। নিজেদের ভবিষ্যতের উপর যতটা ভরসা সৃষ্টি হয়েছিল সে ভরসার আয়তন ক্ষীণতর হয়েছে।

আজ আরেকটা নতুন বছরের শুরুতে আমাদের কি রকম মনে হচ্ছে? আমরা কি আমাদের ক্ষীয়মাণ ভরসার সর্বনিম্ন বিন্দু অতিক্রম করে আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে পেরেছি? মনটায় কি প্রফুল্লতাবোধ ফিরে আসছে? নাকি অস্বস্তিবোধটা এখনো চেপে আছে? মনটা হয়তো একটু হাল্কা হয়েছে কিন্তু দুশ্চিন্তাটা কিছুতেই কাটছে না। কার্তিক মাসটা এখন অনেক দিনের পুরনো দুঃস্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে এসেছে স্মৃতিতে। কার্তিক পার হয়েছি। অগ্রহায়ণ পার হয়েছি। পৌষ চলছে। এবারের মরা কার্তিকে "দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে; উহা কত প্রকার ও কি কি; উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া বল" এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে। এই প্রতিযোগিতার কারণে খবরের কাগজের পাতায় বাসন্তীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে আমাদের,সতেরো বছর পরে। বাসন্তীর শরীরে এর মধ্যে বহু সহস্র দিবস ও রজনীর ব্যর্থতার মালা গাঁথা হয়েছে। মনে হয়েছে তার জীবনে কখনো অগ্রহায়ণ আসে নি। পুরো জীবনটাই মরা –কার্তিকের ভেতর ঘুরপাক খেয়েছে।

আমরা কি প্রতিবন্ধী জাতি ?

ওপরে যত রং-জৌলুশই দেখাই না কেন, কোটি টাকা ব্যয়ে যতই ফোয়ারা বানাই, ভিভিআইপি টার্মিনাল বানাই, সড়ক বানাই, পুরো দেশটাই মরা-কার্তিকের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। স্বাধীনতা-উত্তর বিশ বছরে দেশের অর্থনৈতিক আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতির গতিপথের কোন রূপান্তর হয় নি। শুরুতে যদিবা নিজের জোরে পথ চলার কিছুটা শক্তি ছিল, বিশ বছর পরে এখন দুনিয়ার শক্তিমানরা ঠেলে ঠেলে আমাদের না চালালে আমরা আর চলতেই পারছি না। এটা কি আমাদের বার্ধক্যের লক্ষণ? আমরা কি জাতীয় ল্যাথারিসিজমে ভুগছি? নাকি আমরা প্রমাণ করতে চাই যে জাতি হিসেবে আমরা প্রতিবন্ধী জাতি'?

অর্থনীতির বার্ষিক গতিপথে প্রতিবার কার্তিক মাস চৈত্র মাসের এলাকা পার হবার সময় পুরো অর্থনীতিটা কাৎ হয়ে পড়ে যায়। প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। মানুষের আয় বন্ধ হয়ে যায়। কিছু কিনতে পারার সামর্থ্য বিবর্জিত হয় মানুষ। কেউ কিছু কিনতে পারে না বলে কেউ কিছু বেচতেও পারে না। হাটে-বাজারে মানুষ দেখা যায় না। তাঁতীকে একশ বিশ টাকার লুঙ্গি সত্তুর টাকায় বিক্রী করে ঘরের খাবার যোগাড় করতে হয়। মজুরী পোষানো দূরের কথা সূতার পয়সাও উঠে আসে না শাড়ী-লুঙ্গি বিক্রী করে। অর্থনীতি যত বেশী দিন হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে ততই বাড়ীর পুরনো জিনিস বিক্রীর ব্যাপকতা বাড়ে। ঘরের টিন যায়। আসবাবপত্র যায়। থালা-বাসন, হান্ডি-পাতিল যায়। ঘরের খুঁটিগুলিও যায়। শেষমেষ ভিটা যায়। মহাজনদের বড় ব্যস্ত থাকতে হয় এসময়টা। এই একটা ব্যবসা বড় জমজমাট থাকে তখন। অনেক জোতদার আর অবস্থাপন্ন কৃষকরাও নিজেদের পাল্লা ভারী করে নেন সুযোগ পেয়ে। একমণ ধান ধার দিয়ে দু'মাস পরে দেড় থেকে দু'মণ ধান নেবেন তাঁরা। প্রতিদশ টাকা ধারের জন্য তাঁরা এক দিনের কিষাণী দেবার চুক্তি করবেন। অর্থনীতির চলার পথটা খুব একটা বদলায় নি গত বিশ বছরে। শুধু এই ভাঙ্গাচোরা রাস্তায় কার্তিক আর চৈত্র মাসের অংশে গর্তগুলি আরো বড় হয়েছে। প্রতিবার এই পথটা পার হতে বুকের পাঁজর ভেঙ্গে

যায়। আটা গুলে খাওয়া পেটটা বিদ্রোহ করে উঠে। পরনের কাপড়ের অভাবে বহু মহিলা ঘরের ভিতর বন্দী দশায় দিন কাটান।

অর্থনীতির চলার পথের গর্তগুলি আমরা কখন ভরাট করবো? সারা বছর প্রতিদিন দু'বেলা পেটভর খেতে পারার সামর্থ্য কখন অর্জন করবো?

অর্ধেক মানুষের ভাগ্যে ইতর প্রাণীর জীবন

৫৫,০০০ বর্গমাইল আয়তনের একটি ছোট ভূখণ্ডে আমাদের ১১ কোটি লোকের বসবাস। যেন তিল ধারণের ঠাঁই নেই আর এই ছোট্ট ভূখণ্ডে। কেউ কেউ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে সারা দনিয়ায় এখন যত লোক বাস করে তাঁদের সকলকে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে সে-দেশে জনসংখ্যার যে ঘনত্ব দাঁড়াতো বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব তার চাইতেও কিছু বেশী। শুনতেই ভয় লাগে। কিন্তু তার ভেতরেই আছি। নির্ভয়েই আছি। ১১ কোটি থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২২ কোটি হবো শিগগিরই। এতেও যে খুব একটা আতংকিত হই তা নয়।

জনসংখ্যার ঘনত্বের চাইতেও ভয়ংকর যে সত্যটিকে সঙ্গী করে আমরা জীবন কাটাই সেটি হলো আমাদের ১১ কোটি মানুষের মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক মানুষ, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ, ইতর প্রাণীর মত জীবন যাপন করে। সমগ্র পৃথিবীতে এত সীমিত এলাকার মধ্যে এত বেশী মানব সন্তান এরকম চরম দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত নেই। গত বিশ বছরে আমরা নানারকম তত্ত্বের জয়গান গেয়েছি, নানা সাফল্যের জয়গাঁথা রচনা করেছি, কিন্তু দারিদ্রের গভীরতা বেড়েছে বৈ কমে নি।

ষাটের দশকে যখন অনুন্নত দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন এশিয়ার বহু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে দারিদ্র পরিস্থিতি, বাংলাদেশের সঙ্গে একই কাতারে ছিল। ত্রিশ বছর আগে আমরা যারা একই অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম আজ তাদের সকলেই আমাদেরকে বহু পেছনে রেখে চলে গেছে। কিছু কিছু দেশ রূপকথার নায়কের মত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গেছে। যেমন,দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডের সাফল্যের কাহিনীও কম অবিশ্বাস্য নয়। মালয়েশিয়া এখন ঘোষণা করেছে তারা মধ্য আয়ের কাতার ছেড়ে ২০২০ সালে উন্নত দেশের কাতারে গিয়ে দাঁড়াবে। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা সকল রকম বিবেচনায় নিজেকে উন্নয়নের একটি দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে– দেশে একটা ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ চালু থাকা সত্ত্বেও। পাকিস্তান ও ভারত আমাদের চাইতে দ্বিগুণ রাস্তা অতিক্রম করে গেছে একই সময়ের ব্যবধানে। হয়তো অনেকে বলবেন,তাদের জন্য নানারকম সুযোগ এসেছে। কিন্তু তা দিয়ে কি আমাদের অপরাধ ঢাকা যাবে? সুযোগ কি আমাদেরও কম এসেছে? এখনো কি কম আসছে? সুযোগগুলি যখন নিজে থেকেই আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায় আমরা দরজা খুলে ভেতরে এনে আসন দেবার আগ্রহটাও দেখাই না। নানা জেরা করে দরজা থেকে তাড়িয়ে দিই, অথবা নিজেদের ঘরোয়া বাক-বিতণ্ডার ব্যস্ততার মধ্যে দরজা খোলার দিকে মনোযোগ দেবারও ফুরসুৎ পাই না।

গত বিশ বছরে আমরা একে অপরের কাছ থেকে "কেড়ে খাবার" সাধনায় বিশেষ করে, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থ, সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা সীমাহীনভাবে নিজের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ভোগের আওতায় আনার প্রতিযোগিতায় এত ব্যস্ত ছিলাম যে "করে খাবার" কথা চিন্তাতেই আনতে পারি নি। সরকারের প্রাচুর্য থেকে নিজেদের প্রাচুর্য নিশ্চিত করতে ব্যস্ত থেকেছি। কোন রকমে একবার সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের একটি ক্ষীণতম রেখাও যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি তবে আর আমাদেরকে পায় কে? নিজেই একেকজন সরকার হয়ে দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের "সেবা" গ্রহণের আয়োজন করেছি। আর সেই ক্ষীণতম সম্পর্ককে সম্বল করে নিজেদের "প্রতিভাকে" ব্যবহার করে সিন্দাবাদের বৃদ্ধের মত সরকারের কাঁধে এমন জাঁকিয়ে বসেছি যে খোদ সরকারের কাছ থেকেই চিরজীবনের "সেবা" নিশ্চিত করে ছেড়েছি। "কেড়ে খাবার" যে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত সংস্কৃতি আমরা গড়ে তুলেছি তার জায়গায় "করে খাবার" মূল্যবোধ যদি আমরা সৃষ্টি করতে পারতাম তবে আমাদেরকে দুনিয়ার পদতলে আশ্রয় নিতে হতো না। দেশের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষকে ইতর প্রাণীরমত জীবন কাটাতে হতো না।

এদেশের মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার সুনাম আছে। এই সৃজনশীলতাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টির কাজে প্রবাহিত করার টেকসই কোন উদ্যোগ আমরা গত বিশ বছরে নিই নি।

দারিদ্র নিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব বিচলিত বোধও করি না। ট্রাফিক লাইটে গাড়ী দাঁড়ালে যখন অনেকগুলি হাত গাড়ীর দিকে এগিয়ে আসে তখন গাড়ীর কাঁচটা তুলে দিই। মুখ ফিরিয়ে রাখি। হাতের মালিকদের না-দেখার ভান করি। পবিত্র দিবস এবং পবিত্র রজনীগুলিতে খুচরা পয়সা সঙ্গে নিয়ে বের হই। প্রচণ্ড হাঙ্গামা হুজ্জোতের মাঝে হাতে হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে দায়িত্ব সমাপন করি। কোন সময় আমাদের মনে আসে না যে তাঁদের দুর্গতির ব্যাপারে আমাদের কোন ভুমিকা আছে।

আমরা যারা সমাজের নানা স্তরে নেতৃত্বের আসনে আসীন তাঁরাই দারিদ্র তৈরী করি এবং দরিদ্র লালন করি। আমরা এটা করি অত্যন্ত ভদ্রসম্মত উপায়ে। রুচিসম্মতভাবে। সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে। অন্যান্যদেরকে ত নয়ই, আমরা নিজেদেরকেই বুঝতে দিই না যে এব্যাপারে আমাদের কোন ভুমিকা আছে।

বাইশ বিলিয়ন ডলার কোথায় গেলো ?

উন্নত দেশগুলিতে অবস্থিত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেব বড় বড় পণ্ডিতরা এব্যাপারে আমাদের খুব সাহায্য করেছেন। তাঁরা যুক্তি শাস্ত্রের যাবতীয় সৌকর্য দিয়ে মজবুত করে নানা শাস্ত্র গড়েছেন। সেগুলিকে নানা দেশের নানা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত, তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন। এর আড়ালে থেকে আমরা বিবেকের কোন খোঁচা না-খেয়ে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। এদের তৈরী অর্থনীতিশাস্ত্রে সুন্দরভাবে প্রমাণ করে দেয়া হয়েছে যে আসলে দারিদ্র কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয়। এটা নিয়ে পৃথকভাবে কারো কোন মাথা ঘামানোর

প্রয়োজনই নেই। যেটার উপর দৃষ্টি দেবার দরকার তা হলো অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি। এই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারলেই সব রকম সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে তাঁরা "উন্নয়ন" বলে নতুন একটা ধারণারও সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের পরামর্শে আমরা উন্নয়নের পেছনে ধাওয়াও করলাম। উন্নত দেশগুলি আমাদের বাহবা দিয়েছেন। টাকা দিয়েছেন। আমাদের কাছে কলকারখানার যন্ত্রপাতি বিক্রি করেছেন। তাঁদের পণ্ডিতদের মূল্যবান পরামর্শ বিক্রি করেছেন। বাংলাদেশের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত ২২ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য আমরা "উন্নয়নের" কাজে ব্যয় করেছি। আরো ৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু দারিদ্র কমেনি। দেশের অর্থনীতি বরং আরো নাজুক হয়েছে। বিদেশী সাহায্যের যাঁরা হিসেব রাখেন তাঁরা বলছেন বিদেশী সাহায্যের ৭৫ শতাংশ অর্থ এদেশে ব্যয়িত হয় নি। ব্যয়িত হয়েছে দাতা দেশসমূহের বাজারে। যে ২৫ শতাংশ এদেশে ব্যয়িত হয়েছে তার একটা মোটা অংশ গেছে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ঘুষ প্রদান বাবদ। বাকী অংশ পেয়েছেন দেশীয় পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, ঠিকাদার, ইনডেনটাররা। গত বিশ বছরে ২২ বিলিয়ন ডলারের মাধ্যমে বিদেশে এবং দেশে কিছু লোকের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। সেই কিছু লোকের মধ্যে আমরাও আছি। এই ২২ বিলিয়ন ডলারের মাধ্যমে দেশে অসংখ্য প্রকল্প জন্ম নিয়েছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রকল্প মানুষের জন্য কোন উপকার সৃষ্টি না করে নীরবে মৃত্যু বরণ করেছে। দেশটা এখন মৃত প্রকল্পের একটা বিরাট কবরস্থান।

আমরা এবং আমাদের বিদেশী বন্ধুরা, যাঁরা এসব প্রকল্পের সুবিধাগুলি ভোগ করি, তাঁদেরই স্বার্থে প্রকল্প রচিত হয়. সরকারের অনুমোদন পায় এবং তার জন্য বৈদেশিক সাহায্য আসে। যাতে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ না-থাকে সেজন্য সকল প্রকল্পের মাস্তুলে বড় বড় হরফে লেখা থাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

দারিদ্রকে পাশ কাটিয়ে উন্নয়নের এই খেলা বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকতে পারে যদি না দেশের মানুষ জোর করে এটা থামায়। যদি না উন্নয়নের ধারণাটি পাল্টে দেয়া হয়। যদি না উন্নয়নের সংজ্ঞা নতুন করে বানানো হয়।

উন্নয়ন বলতে দেশের নীচের অর্ধেকাংশ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনকেই বুঝাতে হবে– অন্য কিছুকে নয়। তবেই অর্থনৈতিক উদ্যোগের সঙ্গে দারিদ্র নিরসন সরাসরি যুক্ত হবে। উন্নয়নের পুরনো পথ পরিহার করে দারিদ্র নিরসনমুখী,স্বাস্থ্যমুখী, শিক্ষামুখী, ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং দেশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতামুখী উন্নয়নের পথ ধরতে হবে।

উন্নয়নের সংজ্ঞা ও কৌশল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ও ধারণাগত ভিত্তি ও পরিবর্তন করতে হবে।

স্ব-কর্মসংস্থানেই আমাদের মুক্তি

পুরনো চিন্তায় কর্মসংস্থান বলতে শুধু মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থানকেই বুঝানো হয়েছে। বেকার মানুষরা অপেক্ষা করবে বিনিয়োগকারীর আহ্বানের জন্য। সে আহ্বান না আসা পর্যন্ত তাঁরা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করবেন।

বাংলাদেশের মত দেশে ন'মণ ঘি-ও হবে না,রাধাও নাচবে না। এমন বিশালায়তন বিনিয়োগও কোন দিন হবে না, দেশের কোটি কোটি মানুষের সকলের জন্য কর্ম-সংস্থানের আহ্বানও আসবে না।

আমাদের যুক্তি স্ব-কর্ম সংস্থানের পথে। কোটি কোটি মহিলা-পুরুষকে উপার্জন সৃষ্টির কাজে লাগানো সম্ভব হবে, যদি আমরা ব্যাপক আকারে স্বকর্মসংস্থানের নীতিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি।

স্ব-কর্মসংস্থানের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঋণের সহায়তা পেলে সম্পদহীন মানুষ নিজের বুদ্ধি এবং গতর খাটিয়ে উপার্জনের রাস্তাটি ঠিকই বের করে নিতে পারে। এজন্যেই আমি ঋণকে মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেবার জন্য আবেদন জানিয়ে আসছি। এই মৌলিক অধিকারটিকে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে অন্যান্য মৌলিক অধিকার, যেমন ঃ খাদ্যের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, বস্ত্রের অধিকার,স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার এইগুলি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। তা নইলে সকল অধিকার অপূর্ণ থেকে যায়।

অথচ সনাতন অর্থনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে ব্যাংক নামে যে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান দুনিয়া জুড়ে গড়ে উঠেছে তার দুয়ার সম্পদহীন মানুষের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ। যাঁর সম্পদ যত বেশী তিনি তত বেশী ঋণ পাবেন। আরো সম্পদ আহরণের সুযোগ পাবেন। যাঁর কোন সম্পদ নেই তিনি সম্পদ আহরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। শুধু সম্পদশালীদেরকে ঋণ দেবার পেছনে যুক্তি হলো যে তাঁরা জামানত দিতে পারবেন। যেহেতু সম্পদহীনরা তা দিতে পারবেন না তাই সম্পদহীনরা ঋণের উপযুক্ত নন।

এই সনাতন চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করার প্রচেষ্টা হিসেবে ১৯৭৬ সালে গরীব মানুষকে বিনা জামানতে ঋণ দেবার পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলাম। সেটা ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকের অবয়ব লাভ করেছে ১৯৮৩ সালে। গ্রামীণ ব্যাংক নামে পরিচিত এই ব্যাংক এখন দেশের ২৫,০০০ গ্রামে ১০.৫ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারকে বিনা জামানতে ঋণ দিচ্ছে। এর এখন ৯১০ টি শাখা আছে। এর ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৮ ভাগ। এর পাশাপাশি সম্পদশালীদের ঋণ আদায়ের হারের দিকে তাকালে যে-কেউ নির্দ্বিধায় বলবে ঋণ গ্রহণের উপযুক্ততা কার বেশী।

গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন উপার্জনকারী কর্মকাণ্ডের জন্য ভূমিহীন মানুষকে ঋণ দেয়। এর ১০.৫ লক্ষ ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৯২ শতাংশই হচ্ছেন মহিলা। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতারাই গ্রামীণ ব্যাংকের ৮৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক। অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক হচ্ছেন সরকার। বাংলাদেশে গরীব মানুষের বাসস্থানের করুণ অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ ব্যাংক তার ঋণ গ্রহীতাদের

জন্য গৃহ ঋণও প্রবর্তন করেছে ১৯৮৪ সাল থেকে। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজারটি গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ দেয়া হয়েছে। আর সি সি খুঁটি, টিনেরচাল, আর একটি স্যানেটরী ল্যাট্রিন নিয়ে একেকটি ঘর তৈরী হয়। এক একটি ঘর তৈরীর জন্য ঋণের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার টাকা। গৃহ নির্মাণ ঋণের আদায়ের হারও অত্যন্ত চমৎকার। শতকরা ৯৮ ভাগের উপরে।

দেশের সমস্যা সমাধানে সনাতন অর্থনৈতিক চিন্তা আমাদেরকে বেশী সাহায্য করতে পারে নি। তার বাইরে এসে আমাদেরকে পথ খুঁজতে হবে। এব্যাপারে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে একটা মস্ত বড় শিক্ষা দিয়েছে বিগত বছরটি। প্রচণ্ড এক সাহস যুগিয়েছে। কোন তত্ত্বই শেষ তত্ত্ব নয়। সত্যের উপর একক কারো নিরংকুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত নেই। বাঙ্গালী কবির কথাটি এখন আরো সোচ্চার হয়ে কানে বাজে ঃ "সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই।" পুঁজিবাদী অর্থনীতির তাত্ত্বিকদের এখন একথাটা বেশী করে মনে রাখা দরকার।

গণতন্ত্র রাখবো কিভাবে ?

দেশের আপামর জনসাধারণ যে-কথাই বলুক, যে-মতেই বিশ্বাসী হোক, প্রায় সকলেই নতুন সরকারের সাফল্য কামনা করে। এই সরকার যেন ভুল না-করে,এই সরকার যেন কারো রক্ত-চক্ষু কিংবা শঠতার সামনে নতজানু হয়ে না-পড়ে এই জন্যে মনে মনে দোয়া করে।

কিন্তু এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বর্তমান পরিস্থিতি সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে চলতে পারছে না। আগেও এরকম হয়েছে। কিন্তু মানুষের এখনকার আশাবাদ ভিন্ন। আশাবাদের সঙ্গে পরিস্থিতি মিলছে না। তাই মানুষ শংকিত বোধ করছে। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে কেন নতুন গণতান্ত্রিক পরিবেশে বাইরের স্বার্থ এখনো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছে? আভ্যন্তরীণ শক্তিকে অকেজো দেখি কেন? বাইরের শক্তি অস্ত্রের বলে, সন্ত্রাসের ব্যাকরণে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন কিভাবে দখল করে রাখে? অস্ত্র সোচ্চার হলে আইনের কণ্ঠ নিস্তব্ধ হয়ে যায় কেন?

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ভেজাল গণতন্ত্রই হচ্ছে সব চাইতে বড় রক্ষাকবচ। গণতন্ত্র চলে সংখ্যার জোরে। বাংলাদেশে গরীব মানুষের সব চাইতে বড় জোর হলো তার সংখ্যার জোর। নিখাদ গণতন্ত্র প্রচলিত থাকলে গরীব মানুষের খোঁজ পড়বেই। গণতন্ত্রকে বিপদগ্রস্ত হতে দেখলে গরীব মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেখলে দেশে গণতন্ত্রকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার মত মনের জোর পাওয়া যায় না।

জাতীয় জীবনের যতিহীন প্রবাহে প্রতি নিয়ত সমাজের সকল ক্ষেত্রের নেতৃত্বের জন্য নতুন উপাদান সরবরাহ করার দায়িত্ব পালন করে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ। এমন যদি হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে উপাদান বের হয়ে আসছে তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, এমন কি পুরো ছাত্রজীবনে, গণতন্ত্রের প্রশিক্ষণ নেবারই সুযোগ পেলো না, বরং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতন্ত্র হননের অভিজ্ঞতাই শুধু পেয়ে গেলো, তখন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি খুব একটা ভরসা করা যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন নির্বাচনই করা যায় না, তখন দেশের নির্বাচন নিয়েই মনে

সন্দেহ আসে। গণতন্ত্রের পাঠ নেবার জায়গা না-থাকলে দেশে গণতন্ত্র রাখবো কি করে? রাখবো কার হাতে?

গণতন্ত্রকে স্থায়ী করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলি মজবুত করতে হবে। গণতন্ত্রের রীতি-রেওয়াজগুলিকে সমাজের পরতে পরতে, সকল প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের ভাঁজে ভাঁজে এমন ভাবে ইস্তিরী করে দিতে হবে যাতে যতরকম কচলাকচলিই করি আর গড়াগড়িই খাই গণতন্ত্রের প্রতিটি ভাঁজ নিখুঁত এবং অবিকৃত থেকে যাবে।

যদি শিক্ষাঙ্গনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়-তবে বর্তমান সরকারের উপ মানুষের আস্থা বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মানষ আশাবাদী হয়ে উঠবে।

আইনের শাসন

মানুষ নতুন সরকারের পদক্ষেপগুলি অনেক আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছে। তাঁদের অনেক প্রত্যাশা এই সরকারের কাছে। সরকারের কাছ থেকে কোন উদ্যোগ না-দেখলে তাঁরা হতাশাগ্রস্ত হন। বালাদেশের মানুষ অনেক দেখেছে। অনেক শিখেছে। সকল রকম পরিস্থিতিতে গা-বাঁচিয়ে বেঁচে বর্তে থাকার ব্যাপারে তাঁরা এক-একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন। তাঁকে অন্যায়ের সঙ্গে এতো জায়গায় এতো রকমের সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছে যে ন্যায়-অন্যায়ের সীমান্ত বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। মানুষ এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চায়। সৎভাবে জীবন কাটাবার অধিকার চায়।

নাগরিকের সঙ্গে সরকারের যত জায়গায় সম্পর্কের ব্যাপার আছে, সে-সম্পর্ক সম্বন্ধে যত রকম নীতিমালা আছে তার কোনটাই আর পালিত হয় না। কখন যে পালিত হতো সেটাই আর স্মরণে পড়ে না। সুন্দর সুন্দর নীতিমালা সুন্দর ভাষায় রচিত আছে। এর চাইতে সুন্দর কাঠামো,সুন্দর চিন্তা, সুন্দর শব্দ আপনি শত চেষ্টা করলেও বের করতে পারবেন না। কিন্তু সেই নীতিমালা লিখিত আছে মৃত ভাষায়। কারো কোন কাজে আসে না।

বাস্তবে সরকার আর নাগরিকের পারস্পরিক লেনদেন বোঝাপড়া চলে অলিখিত শব্দে এবং বাক্যে। এই অলিখিত বাক্যের ভাষা অতি পরিষ্কার, সতেজ এবং প্রাণবন্ত। অত্যন্ত কার্যকর। সরকার আর নাগরিকের সম্পর্ক নির্ধারণকারী লিখিত নীতিমালাকে গুম করে দিয়ে তার স্থান দখল করে নিয়েছে এই অলিখিত "দুর্নীতিমালা"। এর মাধ্যমে সরকারের আইন এবং সুযোগ সুবিধা পরিণত হয়েছে বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতই আরো একটি পণ্যে কিংবা লাঠির ঘায়ে দখলের অপেক্ষায় কিছু চরে। এটা হয় অর্থের বিনিময়ে বেচাকেনা হয়। কিংবা শক্তির বিনিময়ে দখলে আসে। যার টাকার জোর যত বেশী, কিংবা শক্তির জোর যত বেশী সরকারের আইন এবং সুযোগ-সুবিধা তারই মনের মত সাজে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হচ্ছে সরকারের নীতিমালার মৃত ভাষায় আবার প্রাণ সঞ্চার করা। কাগজে যে-যেভাবে লেখা আছে সে ভাবে সরকারের কাজকর্ম চলা। অস্ত্রের জোরে, গায়ের জোরে, কিংবা অর্থের জোরে কোন বাক্যকে বা কোন শব্দকে কারা ডিঙ্গিয়ে যেতে না পারা।

গ্রাম সরকার

স্থানীয় সরকার গরীবের জন্য একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান। সরকারের অবস্থান যত বেশী উঁচুতে হবে ততই তা গরীবের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। ততই কালোবাজারে সরকারী নিয়ম-নীতির বেচাকেনার ব্যবসা জমে উঠবে। যত ছোট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে জনগণের স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে ততই সিদ্ধান্ত গ্রহণে গরীব মানুষের অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা বাড়বে, নির্বাচনে গরীব মানুষের পছন্দ-অপছন্দ পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হবে।

আমাদের দেশে মানুষ ধরে নেয় সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। সরকার নিজেও বিশ্বাস করে যে সকল সমস্যা সমাধান করে দেয়ার দায়িত্ব তার। ধারণাটা অনেকটি এরকম–সরকার পরিবারের কর্তা। তার দায়িত্ব হচ্ছে পরিবারের সকলকে খাওয়ানো, পরানো, সকল রকম আবদার রক্ষা করা, আনন্দে-উৎসবে উপহার দেয়া ইত্যাদি। এ ধরনের ধারণা থেকে উভয় পক্ষ যত তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসতে পারি জাতির জন্য ততই মঙ্গল।

কোন সরকারের পক্ষেই সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়া সম্ভব নয়। সমষ্টিগতভাবে সমাজের দায়িত্ব হলো সমাজের সকল মানুষের জন্য এমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা যাতে করে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নানা পর্যায়ে তাদের উদ্যোগ ও মেধাকে ব্যবহার করে ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর সমস্যাবলী সমাধানের পথে অগ্রসর হতে পারে।

এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হবে গণতান্ত্রিক রীতি-রেওয়াজের ভিত্তিতে শক্তিশালী এবং কার্যকর স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে তোলা। বাংলাদেশের যত ক'টা বৃহৎ সমস্যাই আছে তার সব ক'টিই স্থানীয় সমস্যার সাদামাটা যোগফল মাত্র। সাদামাটা যোগফল বললাম এইজন্য যে এই যোগ ক্রিয়ার মাধ্যমে এর মধ্যে বিন্দুমাত্র গুণগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না। শুধু ছোট ছোট সংখ্যাগুলি একত্র হয়ে এক একটি বিকটাকার মহাজাগতিক সংখ্যায় পরিণত হয় মাত্র।

জনসংখ্যার সমস্যা, খাদ্য ঘাটতির সমস্যা, উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের সমস্যা, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সমস্যা,স্বাস্থ্য সমস্যা, দারিদ্রের সমস্যা–যে কোন সমস্যার কথাই ধরুন না কেন যখন জাতীয় পর্যায়ে সেটাকে বিশ্লেষণ করতে বসি, সমাধানের পথ খুঁজি, তখন তার আয়তন দেখে তাকে সাধ্যের বাইরের সমস্যা বলে মনে হয়। সেই একই সমস্যাটা যদি একটা পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে বিবেচনা করে দেখি তখন মনে হবে একটু চেষ্টা করলে এর সমাধান করা যাবে। একটা গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে চিন্তা করে দেখলে তখনও একে সামাল দেয়া যাবে এরকম মনে হবে। বিশ্লেষণের গণ্ডী যতই প্রসারিত হতে থাকবে সমস্যাটা ততই অস্পষ্ট হতে থাকবে। এই অস্পষ্টতার কারণে তাকে জটিল মনে হতে আরম্ভ করবে। তখন মনে হতে আরম্ভ করবে এটা বুঝতে পারা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

একটি সমস্যার ছবি যদি স্পষ্টভাবে মনের মধ্যে ধারণ করতে পারা না যায় তবে কিছুতেই সে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পারা সম্ভব নয়। সমাধানের নামে অন্ধকারে হাতড়ানো হবে–সমাধান হবে না। গত বিশ বছর ধরে আমরা

তাই করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের যে শক্তি নেই, তা আছে মনে করে নিজেকে এবং অন্যদেরকে ঠকানোর মধ্যে কোন মঙ্গল নেই।

গ্রামের মানুষকে গ্রামের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দিলে তাঁরা একাজে কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। গ্রাম মানুষের নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে। কোন প্রশাসকের হুকুমে সৃষ্টি হয় নি। গ্রামের একটা পরিচিতি আছে। একটা ইতিহাস আছে। একটা যৌথ জীবন আছে। গ্রামকে ভিত্তি করে একটা গণতান্ত্রিক স্বশাসন কাঠামো দাঁড় করানো যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় মনে করে আমি ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম অর্থনীতি সমিতির সম্মেলনে গ্রাম পর্যায়ে সর্বনিম্ন স্থানীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব করেছিলাম। এর নাম দিয়েছিলাম "গ্রাম সরকার"। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সরকার যখন "স্বনির্ভর বাংলাদেশ" নামে একটি কর্মসূচী চালু করার উদ্যোগ নেয় তখন এক প্রবন্ধে গ্রাম সরকার গঠনের মাধ্যমে স্বনির্ভর গ্রাম গঠনের উদ্যোগ নেবার সুপারিশ করি। ১৯৭৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মেলনে "Institutional Framework for Swanirvor Bangladesh" এই শিরোনামের এক প্রবন্ধে "গ্রাম সরকার" কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরি।

পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান "গ্রাম সরকার" বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। দীর্ঘদিন নিবিড় আলোচনার পর তিনি "গ্রাম সরকার" পদ্ধতি চালু করেন।

তাঁকে বারবার একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। রাতারাতি যেন সারাদেশে গ্রাম সরকার চালু করার কোন উদ্যোগ নেয়া না হয়। সরকারী নির্দেশ বলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাম সরকার গঠন করা হলে সেগুলি যে কাগুজে প্রতিষ্ঠান হবে তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করি। মানুষের সত্যিকার আগ্রহের মাধ্যমে গ্রাম সরকার গঠন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতি সতর্কতার সঙ্গে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার জন্য অনুরোধ করি। তিনি সেভাবে অগ্রসর হন নি। তিনি এক সঙ্গে সারা দেশে গ্রাম সরকার সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল ধাপে ধাপে করতে গেলে রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে সম্পূর্ণ প্রয়াসটা এক পর্যায়ে থেমে যাবে।

নতুন সরকার গ্রাম সরকার গঠনকে তাদের নির্বাচনী ওয়াদার অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এক সময়ে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সিদ্ধান্ত নেবার আগে আবারো ধীরে চলার নীতিটি গ্রহণ করার সুপারিশ করে রাখছি। গ্রাম সরকার গঠনের কাজটি এভাবে করা যেতে পারেঃ সমাজের নানা গোষ্ঠী থেকে গ্রামের ব্যাপারে উদ্যোগী এবং সংগঠন সৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটা "গ্রাম সরকার বাস্তবায়ন কমিশন" গঠন করা যেতে পারে। এই কমিশন ধাপে ধাপে গ্রাম সরকার গঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রথম বছর ১০০টি গ্রামে গ্রাম সরকার গঠন করা হবে। তার অভিজ্ঞতা নিয়ে পরের বছর ১০০০ টি গ্রাম সরকার হবে। তারপর ক্রমে ক্রমে ৫০০০টি, ১০,০০০টি–এভাবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কমিশন অগ্রসর হবে।

গ্রাম সরকার গঠনের কাজটিকে আমি রীতিমত কঠিন করার পক্ষপাতী। নীতি হিসেবে আমার প্রস্তাব হলো যে একটি গ্রাম গ্রাম সরকার গঠনের অনুমতি

পাবার আগে তাকে নানাভাবে প্রমাণ করতে হবে যে সে-গ্রাম গ্রাম সরকার গঠন ও পরিচালনার যোগ্যতা রাখে। এই যোগ্যতার পরিচয় হিসেবে তাকে কয়েকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ঐ গ্রামকে গ্রামের সমস্ত ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক,ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে একটি "গ্রাম বই" রচনা করতে হবে। (পরবর্তীতে এই "গ্রাম বই" -কে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।) ঐ গ্রামের গ্রাম পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। গ্রামের রাস্তাঘাট, খাল, সেতু মেরামত করে তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে হবে। বিদ্যালয়গমনযোগ্য সকল ছেলে-মেয়েকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের সকল বাড়ীতে গর্ত করে পায়খানা তৈরী এবং ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখাতে হবে। প্রধান রাস্তার দুধারে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ কাজের মারফৎ তাদেরকে গ্রাম সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করতে হবে। রিলিফের মালের মতো এটাকে সবার হাতে গুঁজে দিলে এটা অর্থহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের মানুষ নিজ জেলা নিয়ে গর্ব করে, নিজ উপজেলা নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু সব চাইতে বেশী আপন মনে করে নিজের গ্রামকে। হৃদয়ে বেশী ঢেউ তোলে নিজের গ্রাম। বাংলাদেশের মানুষের কাছে "দেশ" এবং "গ্রাম" প্রায় সমার্থক। গ্রাম সরকার গঠনের মাধ্যমে মানুষের এই অনুভূতি এবং ভালবাসাকে সকলের মঙ্গলের জন্য অনায়াসে কাজে লাগানো যায়।

আমি একটা উদাহরণ দিই। আপনি একজন ব্যস্ত মানুষ। বহু দিন ধরে নিজের গ্রামে যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ গ্রাম থেকে কয়েকজন পরিচিত লোক এসে উপস্থিত। তারা খবর নিয়ে এসেছে আপনার পাশের গ্রামের লোকেরা তাদের গ্রামে শিক্ষার হার এবছর শতকরা ৫০ ভাগে তুলে ফেলেছে। আপনার গ্রামে এখনো শতকরা ২৫। আপনার গ্রামের সকলের মুখ কালো হয়ে গেছে। এ খবর শোনার পর সারারাত আর আপনারও ঘুম হলো না। এটা হতেই পারে না। তিন বছর আগেও আপনার পাশের গ্রামের শিক্ষার হার আপনার গ্রামের শিক্ষার হার সমান ছিল। এখন তারা অনেক এগিয়ে গেছে। আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছে এ সংবাদটি। আপনি পরদিনই গ্রামের পথে রওনা হবেন। কি করে পাশের গ্রামকে ডিঙ্গিয়ে শিক্ষার হার ৭০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া যায় এটাই হঠাৎ করে আপনার ব্রত হয়ে গেছে–আপনি টেরই করতে পারেননি। আপনি অবাক হবেন দেখে যে আপনি এর মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে জরিয়ে পড়েছেন। নিজের গ্রামের মান-ইজ্জত নিজের পরিবারের মান-ইজ্জতের থেকে কম নয় আমাদের কাছে।

গ্রামের মানুষকে যদি কর্মচঞ্চল করতে চান তাহলে প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিন গ্রামে গ্রামে। শিক্ষার প্রতিযোগিতা। দারিদ্র নিরসনের প্রতিযোগিতা। উৎপাদনের প্রতিযোগিতা। প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রতিযোগিতা। নারীমুক্তির প্রতিযোগিতা। স্বাস্থ্যের প্রতিযোগিতা। খেলাধুলার প্রতিযোগিতা। নাটক আর গানের প্রতিযোগিতা। দেখুন আমরা দেশটাকে এক হেঁচকায় কোথায় নিয়ে যেতে পারি। সরকারী কর্মচারী দিয়ে উন্নয়ন আসে না। চাকুরীর টানে দেশ পাল্টানো যায় না। মনের টানে পারা যায়।

উপজেলা

গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে আরেকটি স্থানীয় সরকারের কথা উল্লেখ না-করে পারছি না। উপজেলার কথা।

সরকার কিছু একটা চিন্তা করে উপজেলা পরিষদ বাতিল করে দিয়েছে। আমরা কেবলই প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গছি। কখনো আইন করে ভাঙ্গছি। কখনো আইন অক্ষুণ্ন রেখে প্রতিষ্ঠানের হৃদপিণ্ড উপরে ফেলছি। যেমনঃ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, সমবায়, বিশ্ববিদ্যালয়। সকল প্রতিষ্ঠানকে নতুন ভঙ্গীতে গড়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু আগে ভেঙ্গে দিয়ে পরে ভাবনা-চিন্তার জন্য বসা কি ঠিক হচ্ছে? আগে বিকল্প প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা তৈরী করে নিয়ে তারপর পুরানোটা ভাঙ্গি। জনগণকে বলে–কয়ে, জানান দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা কোথায় ?

আমার বিবেচনায় উপজেলা পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। বর্তমান অধ্যাদেশে ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা যেতো। চেয়ারম্যান নির্বাচনে কারচুপি হয়ে থাকলে নতুন করে নির্বাচন করার উদ্যোগ নেয়া যেতো।

যাই হোক, এখন উপজেলা অধ্যাদেশ বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো সেটা যেন দীর্ঘস্থায়ী হতে না-পারে সেব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উপজেলার জন্য নতুন স্থানীয় রূপরেখা যেভাবেই চিন্তা-ভাবনা করা হোক না কেন তার মধ্যে যে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই উপস্থিত থাকা প্রয়োজন সেগুলি হবে ঃ

১.০ উপজেলার চেয়ারম্যানকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২.০ চেয়ারম্যানের মেয়াদ তিন বছরে সীমাবদ্ধ রাখলে ভাল হবে।

৩.০ উপজেলার চেয়ারম্যানকে নির্বাহী আদেশ বলে যাতে অপসারণ করা না-যায় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.০ উপজেলাস্থ সকল সরকারী কর্মচারীর সার্ভিস উপজেলা পরিষদের নিকট ন্যস্ত করতে হবে।

৫.০ উপজেলা পরিষদের হাতে সম্পদ আহরণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষমতা দিতে হবে।

৬.০ সকল অর্থে উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হিসেবে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

-

গ্রাম সরকারকে অর্থবহ এবং কার্যকর করতে হলে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার গ্রাম সরকারকে শক্তি সাহস এবং প্রশাসনিক সমর্থন নিশ্চিত করবে।

জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহকে স্থানীয় সরকার হিসেবে আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। জনগণের সরাসরি ভোটে জেলা পরিষদ এবং পৌরসভার প্রধান নির্বাহী নির্বাচিত না-হওয়া পর্যন্ত এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না। জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হলে দেশের মন্ত্রী হোন তাতে কারো আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু সংসদে নির্বাচিত হলেই একজন সংসদ সদস্য উপজেলা পরিষদ, কিংবা জেলা পরিষদ, কিংবা পৌরসভার প্রধান নির্বাহী পদের জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেন এটা ধরে নেওয়া গণতন্ত্রের মূলনীতির পরিপন্থী ধারণা হবে। আমরা যত তাড়াতাড়ি এধরনের রেওয়াজ থেকে নিজেদের মুক্ত করে সরাসরি এবং নিয়মিতভাবে নির্বাচনে যেতে পারি তত তাড়াতাড়ি গণতন্ত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি ?

গত বিশ বছরের অভিজ্ঞতাকে একত্র করলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে হতাশাব্যঞ্জক বলেই মনে হয়। আমরা অতি মূল্যবান বিশটি বছরকে আমাদের মঙ্গলের জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি নি। স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল তাকে সৃজনশীল কাজে লাগাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। এই বিশ বছরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং চিন্তার দিক থেকে আমরা পরনির্ভরশীলতার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছেছি।

সব কিছু সত্ত্বেও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে আমার কাছে মোটেই মেঘাচ্ছন্ন মনে হয় না। বরং আমি এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী। তার প্রধান কারণ আমি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী। আমি মানুষের শক্তিতে বিশ্বাসী। সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষেরই ক্ষমতা আছে নিজের সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করার। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে নিজেকে নিজের প্রয়োজনানুসারে, খেয়ালানুসারে প্রতিনিয়ত নবতর রূপে সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের গণ্ডী নির্দিষ্ট নয়। তার পরিচয় যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশানের মত স্থির নয়। আমার কাছে একেকজন মানুষ একেকটি মহা-সম্ভাবনার আধার। এই সম্ভাবনা উন্মোচনের জন্য শুধু সঠিক পরিবেশ সৃষ্টির অপেক্ষা। সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি হলে সম্ভাবনাসমূহ উন্মোচিত হয়ে আমাদেরকে বিস্মিত করবে। এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে যে-দেশ তার বুকে স্থান দিয়েছে সে দেশের সম্মিলিত সম্ভাবনাটিও অতি প্রকাণ্ড।

আমরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাদের জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত মেধা এবং সৃজনশীল ক্ষমতাকে অব্যবহৃত রেখে বিরতিহীনভাবে অপচয় করে যাচ্ছি। একদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য আর অফুরন্ত করণীয় কাজ, আরেকদিকে অসংখ্য মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতার অব্যবহার এবং অপব্যবহার। এ-ই আমাদের সমস্যার মূল ছবি। কাজ করার মেধার সঙ্গে করণীয় কাজের সংযোগ ঘটাতে পারছি না। এ-যে প্রযুক্তির অভাবে করা যাচ্ছে না তা নয়। পারা যাচ্ছে না কারণ আমরা ও-ব্যাপারে মনোযোগ দিচ্ছি না। আমাদের সময় নেই ওসব চিন্তা করার। আমাদের কারো সময় নেই। আমরা আমাদের দৈনন্দিন সমস্যার জট ছাড়াতে

এত হিমসিম খাচ্ছি যে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবার ফুরসুৎই পাচ্ছি না। কিংবা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত এজেন্ডা নিয়েই পুরোপুরিভাবে ব্যস্ত আছি। জাতির সামনে জ্বলজ্বলকরা সমস্যাগুলি না-দেখার ভান করছি। কথার পাহাড় বানিয়ে সমস্যাগুলিকে ঢেলে রাখছি। নিজের বানানো রূপকথায় নিজেই বিশ্বাস স্থাপন করে বসে থাকছি। অসংখ্য মানুষের রূঢ় বাস্তবতাকে অনায়াসে অনুভূতির সীমানা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখছি।

গত বিশটি বছর আমরা যেভাবে কাটিয়ে এসেছি আগামী বিশটি বছর নিশ্চয়ই আমরা সেভাবে কাটাতে চাই না। সেভাবে কাটনোর উপায়ও আমাদের নেই। পরবর্তী বিশ বছরের জন্য আমাদের কি প্রস্তুতি নিতে হবে?

গত বিশ বছরের বিপুল নৈরাশ্যের ভেতরেও মাঝে মাঝে আশার ঝিলিক দেখা গেছে। ব্যর্থতার মরুভূমির মধ্যে সাফল্যের চমৎকার মরূদ্যান রচিত হয়েছে। আমাদের আগামী যাত্রায় এসব অভিজ্ঞতা আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেবে। সাহস যোগাবে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় যেটা দরকার সেটা হলো কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা। দৈনন্দিন জীবন থেকে অস্পষ্টতা এবং অনিশ্চয়তাকে দূর করতে পারা। নির্দিষ্ট দিনে পূর্ব নির্দিষ্ট কাজ হবেই এই বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা। বছরের নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন হবে, জাতীয় সংসদের বৈঠক হবে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে, শেষ হবে, পরীক্ষার ফলাফল বের হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ধ শুরু হবে, শেষ হবে। নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের মেয়াদ শেষে নব নির্বাচিতদের হাতে নির্দিষ্ট দিনে দায়িত্ব অর্পণ করে বিদায় নেবেন। মেয়াদ শেষ হবার আগে তাঁদেরকে কারো গায়ের জোরে বিদায় নিতে হবে না। মেয়াদ শেষে তাঁরা একঘন্টাও বেশী থাকবেন না। সাপ্তাহিক কাজের দিনগুলিতে স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত হাট-বাজার সব কিছু নিশ্চিতভাবে খোলা থাকবে। কাউকে ঘুম থেকে উঠে কান খাড়া করে শুনতে হবে না গাড়ীঘোড়া চলাচলের আওয়াজ শোনা যায়, কি যায় না। হরতাল হচ্ছে, কি হচ্ছে না। সরকারী অফিস থেকে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট নিয়মে সিদ্ধান্ত নিয়ে চিঠি আসবে। এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হলেই মানুষ সৃজনশীল হবে। নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করবে।

আমাদের বিস্তীর্ণ জমি নেই। আমাদের জমির নীচে তেলের সাগর নেই। সকল মানুষের কর্মক্ষমতার উন্মোচন করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। সকল মানুষের শক্তির মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। সকল মানুষের মেধার মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। কোন মানুষকে যেন সমস্যার সামনে অসহায় জড় পদার্থের মত বসে থাকতে না-হয়।

এগুলি কি কঠিন কাজ? এক হিসেবে কঠিন। এক হিসেবে খুবই সোজা। কঠিন, যদি আমরা আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে একমত হতে না পারি, সচেতন হতে না-পারি। একমত হতে পারলে একাজ খুবই সোজা কাজ। এটা হবে আনন্দের কাজ।

পরবর্তী বিশ বছরের যাত্রার প্রারম্ভে এখন আমাদের সবচাইতে বড় প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্য। সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে, সকল গোষ্ঠীর মধ্যে সুদৃঢ় রাজনৈতিক সমঝোতা। এখন দরকার আগামী বিশ বছরে জাতিকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌছে দেবার লক্ষ্যে একটি কঠিন রাজনৈতিক সংকল্প। আমরা যদি

সমঝোতার রাজনীতিকে তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত করতে না-পারি তবে আমাদের কপালে আরো বহু দুঃখ আছে।

পরবর্তী বিশ বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শুরুতে জাতির শুভযাত্রা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

দীর্ঘক্ষণ ধরে আমার কথাগুলি শোনার জন্য আপনাদের ধৈর্যের প্রশংসা করছি। আমাকে আপনাদের সম্মেলনে আমন্ত্রণ করে আমার প্রতি যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অশেষ ধন্যবাদ।

জানুয়ারী ২-৮, ১৯৯২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্সের বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত "সোবা" বক্তৃতা

আমরা কি চেহারা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করবো ?

আমরা যদি সবাই নিজ নিজ জগতে অবরুদ্ধ হয়ে থাকি তবে সমাজটাকে সেঁটে ধরার বন্ধনগুলি সৃষ্টি হবে কিভাবে? সামগ্রিকভাবে, সামাজিকভাবে, জাতিগতভাবে সমস্যা মোকাবেলার শক্তি আসবে কোথা থেকে? একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাবার, একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হবে কিভাবে?

জাতির এই মহান মুক্তি লগ্নে সকল রকম অবরুদ্ধ অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে একে অপরের সন্ধান দিতে হবে। একে· অপরের দুঃখ জানতে হবে। বুঝার চেষ্টা করতে হবে। তা নইলে স্বৈরাচার থেকে মুক্তির এই যে আনন্দ, এই আনন্দ অতি ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণিত হবে। রাজনৈতিক স্বৈরাচার, প্রশাসনিক স্বৈরাচার, সামাজিক স্বৈরাচার, অর্থনৈতিক স্বৈরাচার, চিন্তার রাজ্যে স্বৈরাচার– কেউ কারো চাইতে কম নয়। কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একজাতের স্বৈরাচারকে ঘায়েল করেই সন্তুষ্ট হয়ে ঘরে ফিরে গেলে ভুল করা হবে। ঘায়েল করা স্বৈরাচার অক্ষত অন্যান্য স্বৈরাচারগুলির ঘাড়ে চেপে শিগগিরই ফিরে আসবে।

সামনে নির্বাচন। রাজনীতি চর্চা এখন সকল স্তরে সকল সময়ের শীর্ষে। এরকম সুযোগ জাতির জীবনে কখনো আসে নি। সংবিধানে বিশেষ ধরনের শর্ত সংযোগ না-করলে ভবিষ্যতে আবার কবে এসুযোগ আসবে তা অনিশ্চিত। জাতি হিসেবে এই অপূর্ব সুযোগের যেন আমরা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারি।

জাতির ইতিহাসে যেন নিরপেক্ষ নির্বাচনের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে জাতিকে প্রেরণা যোগাতে পারে। সমাজের সকল অংশ থেকে যেন আমরা এই নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ, সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠান করতে পারি তার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই আরাম করে লেপের সুমিষ্ট উষ্ণতা সর্বাঙ্গে মেখে ঘুমোবো আর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের ঠেকা পড়েছে তিনি অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচনের রসের হাঁড়িটি আপনার আমার বাড়ী বয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন–সেটা হবার নয়। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য আপনি কি করেছেন। আপনার সংগঠন বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান এব্যাপারে কি উদ্যোগ নিয়েছে। কি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। নাকি আমরা সবাই অপেক্ষা করছি নির্বাচন ভণ্ডুল হবার পর রাজনীতিবিদদের উপর সব দোষ চাপিয়ে একটা সরেস বিশ্লেষণ ফাঁদার জন্য।

নির্বাচনের উত্তেজনার ভেতর, শ্লোগান, মিছিল, বক্তৃতা, পোস্টারের ভিড়ের মধ্যে আমরা যেন নিজেদের একটা প্রশ্ন করতে কখনো ভুলে না যাইঃ রাজনীতি কিসের জন্য? ব্যক্তি হিসেবে সমাজকে কিভাবে আমি গড়ে উঠতে দেখতে চাই? জাতিকে কি চেহারায় দেখার জন্য আমি আমার শ্রম ও মেধা দিতে কুণ্ঠা বোধ করবো না।

বিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ পথ প্রায় শেষ হয়ে এলো। পরের স্টেশনেই একবিংশ শতাব্দী সুরু হবে। আমরা কি নিজেদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি কখনো কি চেহারা নিয়ে জাতি হিসেবে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে চাই? কখনো কি চিৎকার করে নিজের কাছে, দশের কাছে, বলতে পেরেছি—ভিখারীর পরিচয় নিয়ে আমরা নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করতে চাই না। সারা দুনিয়ার মেহেরবানীর উপর আমি আমার জাতির ভবিষ্যৎকে ছেড়ে দিতে নারাজ।

আমার রাজনীতিকে কি আমি সে–ইচ্ছার রঙে রাঙাতে পেরেছি? আমার রাজনীতি কি আমার মনের রঙে আমার জাতিকে রাঙানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে?

ক'দিন ধরে জোর শীত পড়েছে। অনেকে আমরা খুশী হয়েছি। আমাদের ইচ্ছার পূরণ হয়েছে। বহু টাকা দিয়ে সখ করে কেনা গরম কাপড়গুলি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এবার সুযোগ এসে গেলো। এই কাপড় গায়ে চাপিয়ে এখন প্রয়োজন না-থাকলেও বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়—স্বজনের বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছি। সভা সমিতিতে বেশী করে হাজিরা দিচ্ছি।

কিন্তু আমার আপনার কি কখনো মনে পড়ছে এদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ পাটখড়ির ঘরে নোংরা চট কিংবা ছেঁড়া কাঁথা মুড়ে নিজে এবং নিজের সন্তানদের শীত নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে? ঠাণ্ডা শরীর আর ঠাণ্ডা কাঁথা কেউ কারো কোন উপকারে আসছে না? আগুনে শরীরটাকে গরম করার জন্য পাতা, খড়, কিংবা খড়িও বিশেষ একটা যোগাড় করা যাচ্ছে না।

আমরা ত মৌলিক মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য সকলেই সোচ্চার। কোন বড়লোকের গায়ে আচমকা আইনের একটি আঁচড় লাগুক দেখি। খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উপচে পড়বে মৌলিক অধিকার লংঘনের অভিযোগ এনে সকল মহলের বক্তৃতা-বিবৃতি ছাপতে। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের

মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। উপার্জনের অধিকার, খাদ্যের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার। সমাজের পুরো অর্ধেক মানুষের জীবনে এর কোন একটি অধিকারের একটা ভাঙ্গা টুকরাও যে প্রতিষ্ঠিত করার কোন উদ্যোগ নাই এই বিবেচনায় সংবিধান লংঘনের অভিযোগ আনার চিন্তা কি আমরা কেউ কখনো করেছি?

আমাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মেনিফেস্টোতে মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি কি? যেখানে আমাদের সবার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মেনিফেস্টো হবে একরকম আর দেশের সংবিধান হবে আরেক রকম, সেখানে, সংবিধানের কোন মূল্য নেই। এটা একটা দন্ত নখরবিহীন জড় পদার্থ।

সমাজের সকল ক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয়রা আজ এই সমাবেশে উপস্থিত আছেন। আপনাদের চিন্তাই সমাজের চিন্তা। আমাদের এই চিন্তায় যেন আমরা শতাব্দীর এই শেষ দশকের জন্য একটা কঠিন শপথকে স্থান দিই। আমাদের অঙ্গীকার হোক আমাদের এই প্রজন্মের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে একটা দারিদ্র্যমুক্ত, স্বনির্ভর, গণতান্ত্রিক, আত্মমর্যাদাশীল জাতিতে রূপান্তরিত করে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবো। আমাদের অঙ্গীকার হোক বিদেশ থেকে এনে আদা, রসুন, পেঁয়াজ, ডাল, লবণ খাবার অবমাননা থেকে জাতিকে রক্ষা করবো। গত অর্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপী স্বশাসনের আমলে সাক্ষরতার হার শতকরা ২৫ জনেও তুলতে না—পারার গ্লানি থেকে জাতিকে মুক্ত করবো। সাধারণ শিক্ষার জন্য আমাদের কিশোর-কিশোরীদের এবং সাধারণ চিকিৎসার জন্য আমাদের জনসাধারণকে যেন ভিন দেশে পাড়ি জমাতে না-হয় তা নিশ্চিত করবো। বিলাসিতার অশ্লীলতাকে ঘৃণা করতে শিখবো। রাস্তার প্রতিজন ভিখারীনী এবং প্রতিজন ভিখারীর পা ছুঁয়ে মাফ চাইবোঃ "মা, আমি তোমার অযোগ্য সন্তান,বাবা, আমি তোমার অকেজো সন্তান, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাকে এখনো মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নি। তোমার মৌলিক অধিকার এখনো আমারই কারণে অলীক কল্পনা হয়েই রয়ে গেলো। জীবন্ত বাস্তব হতে পারলো না।" বিশেষভাবে ক্ষমা চাইবো তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে ব্যক্তিগত আনন্দের সন্ধানে মেতে রয়েছি বলে।

এদেশের মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে। এদেশের তরুণরা অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সমাজের যাঁরা মাথা এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলার সোনার কাঠি—রূপোর কাঠি তাঁদেরই দখলে। অবজ্ঞায় অবহেলায় তাঁরা সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি রেখে এই-রাজা ঐ-রাজার রাজত্বে উচ্ছিষ্টের সন্ধানে ব্যস্ত। আমরাই ত সমাজের সে-মাথা। আমাদের জ্ঞান কখন ফিরবে?

আপনাদের এই সম্মেলন আমাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করুক এই কামনা নিয়ে আমি সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করলাম।

জনাব গভর্ণর, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আপনাদের সামনে আমার কিছু অভিমানের কথা, কিছু ক্ষোভের কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ।

হোটেল সোনারগাঁ- এ অনুষ্ঠিত রোটারী আন্তর্জাতিক জেলা সম্মেলন ১৯৯১ উপলক্ষে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ। তারিখ ঃ ১৭, জানুয়ারী , ১৯৯১

স্বনির্ভরতা কোন পথে ?

স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তার কথা নতুন করে আবার বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। পরনির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ, পরনির্ভরতায় অন্যের পছন্দ অপছন্দে জাতির জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, পরনির্ভরতায় জাতির নিজস্ব সৃজনশীলতা প্রকাশ করার সুযোগ আসে না, পরনির্ভরতায় পরের স্বার্থেই কাজ হয়–নিজেদের সকল স্বার্থ উপেক্ষিত হয়, পরনির্ভরতায় জাতি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, পরনির্ভরতায় জাতির রাজনৈতিক কাঠামোয় পরসেবীরা প্রাধান্য পায়–যারা জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা ক্রমে রাজনৈতিক প্রধান ধারা থেকে দূরে ছিটকে পরে–স্বনির্ভরতার পক্ষে এবং পরনির্ভরতার বিপক্ষের যুক্তি হিসেবে এগুলি এবং আরো বহু অনুরূপ যুক্তি বহুবার আলোচিত হয়েছে।

পরনির্ভরতা ত্যাজ্য, স্বনির্ভরতা কাম্য–এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই।

কিন্তু প্রশ্ন, তাই যদি হবে তাহলে আমরা স্বনির্ভরতার গান গাইতে গাইতে পরনির্ভরতার পথ ধরে পরমানন্দে এগিয়ে চলছি কেন? আর মাসখানেক পর প্যারিসে নির্ধারণ করা হবে আমরা পরবর্তী অর্থ বছরে দুনিয়ার বিত্তবান জাতিসমূহ থেকে কত ঋণ এবং অনুদান পাবো। এই মিটিং-এ যাবার সময় আমাদের অর্থ মন্ত্রী একটি নির্দিষ্ট অংকের ডলারের কথা উল্লেখ করে সাংবাদিকদের কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করবেন, আমরা এই পরিমাণ সাহায্য পাবোই।

প্যারিস মিটিং শেষে ঢাকা পৌঁছামাত্রই আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করা হবে আমরা কি রকম সাফল্য অর্জন করেছি এবারকার সভায়।

আমরা যা চেয়েছিলাম তা-ই পেয়েছি। পরদিন খবরের কাগজে এটা প্রধান খবর হয়ে প্রতিটি কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হবে। সারা দেশে ধন্য ধন্য রব পড়ে যাবে।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসে স্বনির্ভরতা অর্জনের কি হলো? অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেয়া হবে যে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার। তার জন্যই সাহায্য দরকার। এই সাহায্য সংগ্রহে আমাদের সাফল্যের মাধ্যমে আমরা স্বনির্ভরতাকে ক্রমে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে যাচ্ছি।

এসব কথা শোনার পর কোনটা স্বনির্ভরতা কোনটা পরনির্ভরতা সবার কাছে তা তালগোল পাকিয়ে যাবে।

আমি বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের বিরোধী নই। কিন্তু আমি পরনির্ভরতার ঘোরতর বিরোধী। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য বাছাই করতে না-জানলে এই সাহায্য পরনির্ভরতার মজবুত বাহনে পরিণত হবেই।

আমাদের কাছে বৈদেশিক সাহায্যের অংকটা বড় কথা নয়। কিন্তু এই অংকটাকেই ফলাও করে দেখানো হচ্ছে হরহামেশা। তাতে মানুষ মনে করছে ওই অংকটা যত বড় হবে ততই বুঝি আমাদের মঙ্গল বেশী বেশী হবে।

বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নয়, গুণগত মানই হচ্ছে আসল বিষয়। পরিমাণে ছোট হয়েও বৈদেশিক সাহায্য আমাদেরকে পরনির্ভরতার মোটা শেকলে শক্ত করে বেঁধে ফেলতে পারে, পরিমাণে বড় হয়েও আমাদেরকে স্বনির্ভরতার পথে বেশ খানিকটা নিয়ে যেতে পারে। প্যারিস থেকে ফিরে আসা অর্থমন্ত্রীকে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি আপনি যত বড় অংকের ঋণ/অনুদানের পাকা কথাই নিয়ে আসুন না কেন এখন আমাদের বলুন এর ফলে এ বছরের উন্নয়ন বাজেটের কত অংশ আমরা নিজস্ব সম্পদ থেকে বহন করতে পারবো এবং আগামী বছর কত অংশ বহন করতে পারবো। তিনি এই প্রশ্নের যে জবাব দেবেন সেটাই হওয়া উচিত পরদিনের খবরের কাগজের হেড লাইন। অতীতের দিকে তাকালে দেখবেন প্রতি বছর আমরা বেশী বেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসার খবর দিয়েছি – আর প্রতি বছরই আমাদের উন্নয়ন বাজেটে নিজেদের সম্পদ যোগানোর পরিমাণ কমে গিয়েছে। এখন তা শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে।

কয়েকমাস আগে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর বি,বি,সি টেলিভিশানের এক প্রতিবেদনে প্রফেসর রেহমান সোবহান বলেছেন যে আমরা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে একটা নেশাখোর জাতিতে পরিণত হয়েছি। সাহায্যের গন্ধ পেলেই বিলাপ জুরে দিই–আমরাই দুনিয়ার দরিদ্রতম জাতি; বাবা-রা,মা-রা কিছু দিয়ে যান। সাহায্য নেবার দরকার আছে কিনা তা বাছবিচার করার তর সইবার কোন সময় নেই। যে-ই সাহায্য দেবে বলে মনে করছি তারই পিছু নিচ্ছি। সাহায্য দেবার জন্য যে যা শর্ত দিচ্ছে তা অকাতরে মেনে নিচ্ছি। জমা-খরচ মিলিয়ে দেখার প্রয়োজনও মনে করছি না।

এরকম এলোপাথারি সাহায্য নিয়ে এখন এমন অবস্থা হয়েছে আমাদের মাথার উপর কাঁঠাল ভেঙ্গে দাতাগোষ্ঠী তাঁদের মালামাল বিক্রি করে যাচ্ছেন, তাঁদের দেশের পরামর্শকদের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং সেবা চড়া মূল্যে

আমাদের কাছে বিক্রি করার ব্যবস্থা করছেন। না এসব যন্ত্রপাতি মালামাল আমাদের খুব একটা কাজে লাগছে, না তাঁদের পরামর্শক আর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বা সেবা আমাদের উপকার করছে। অনেক সময় অপকারই করছে বেশী। এই সব পরামর্শকদের তৈরী এবং পরিচালিত প্রকল্পগুলি দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে যে কোন ভূমিকা রাখতে পারে নি সেটা বুঝতে কারো কোন কষ্ট হয় না। সারা দেশ এখন তাদের 'সাহায্যের' স্মৃতি চিহ্নসমূহ ধারণ করে ব্যর্থ প্রকল্পমালার একটি প্রকাণ্ড কবরস্থানে পরিণত হয়েছে।

এই পর্যন্ত বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে যে গত বিশ বছরে যে বাইশ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে এদেশে এসেছে তার শতকরা ৭৫ ভাগ মালামালের মূল্য এবং পরামর্শক-বিশেষজ্ঞদের বেতন-ভাতা বাবদ দাতাদেশগুলিতে ফিরে গেছে।

আমাদের অর্থমন্ত্রী যখন প্যারিস মিটিং থেকে ফিরে আসবেন তাঁকে কি সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি, যে-কয়েকশত কোটি ডলার সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে এসেছেন তার কতভাগ আবার দাতাদেশগুলিতে ফিরে যাবে'?

বহু ক'টা উন্নয়ন প্রকল্প মিলিয়ে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী হয়। প্রকল্পগুলি বাছাই করার ব্যাপারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা। কিন্তু সাহয্যের নেশাগ্রস্ত জাতি সেটা করার সময় পাবে কখন'? কেউ টাকা দিতে চাইলেই প্রকল্পের সাত খুন মাফ। যুক্তি হচ্ছে ঃ তারা যদি টাকা দিতে চায় তোমার বাপু তাতে আপত্তি কেন'? আপত্তি তুলতে চাইলে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তারা তখন নানা রকম দেশদ্রোহীতার অভিযোগ উত্থাপন করে বসে।

দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তি, মহিলাদের উন্নতি, পরিবেশের উপর প্রভাব, রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নানা বিবেচনা ছাড়াও যেকোন একটি প্রকল্প গ্রহণ করার আগে যাচাই করে দেখা উচিত স্বনির্ভরতা অর্জনে তার ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক ভূমিকা কি হবে। যদি দেখা যায় আমাদের গৃহীত প্রত্যেকটি প্রকল্প আমাদের পরনির্ভরশীলতাকেই আরো পাকাপোক্ত করে তুলছে তবে বলাই বাহুল্য বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের যুক্তিটা ভাওতা দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়–এটাই প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমরা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে অতিমাত্রায় আগ্রহী বলে আমাদের গৃহীত প্রায় প্রতিটি প্রকল্প আমাদেরকে আরো গভীরভাবে পরনির্ভরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যেমন ধরুন গভীর নলকূপ প্রকল্প। যখন কোন দাতা দেশ বা সংস্থা দেশে আরো পাঁচ হাজার গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে আমরা খুশীতে বাগবাগ হয়ে যাই। তারা যদি পাঁচ হাজার গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য অনুদান বা ঋণ দিতে চায়–তুমি বাবা কে বাগড়া দেবার'? তারা দিক বসিয়ে আরো পাঁচ হাজার গভীর নলকূপ। গভীর নলকূপ বসানোটা লাগসই প্রযুক্তি কিনা সে প্রশ্ন তোলার দরকার কি? যে জেলায় তিন হাত খুঁড়লেই পানি সেখানে গভীর নলকূপ বসানো ঠিক হচ্ছে কিনা– এসব প্রশ্ন কেন'? কোন ধরনের জমিতে গভীর নলকূপ বসানো উচিত বা অনূচিত– এসব অবান্তর প্রশ্ন। তারা অনুদান দিচ্ছে, ঋণ দিচ্ছে,

আমরা নিচ্ছি। কোন দেশের ইঞ্জিন হলে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য হাঙ্গামা হুজ্জত কম হবে সে প্রশ্ন তুলে কি লাভ। ধান চাষ করে কৃষকরা গভীর নলকূপের পরিচালনা ব্যয় বহন করতে পারবে কিনা–এরকম কোন প্রশ্নের দরকার নেই। টাকা দিচ্ছে, বসাও। ঠিকাদাররা খুশী। ইন্ডেনটাররা খুশী। সরকারের যে এজেন্সীর মাধ্যমে কাজটা হলো তার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা খুশী। যারা যন্ত্রপাতি বিক্রি করেছে তারা খুশী। যে পরামর্শকরা হিসেব করে দেখিয়েছেন পাঁচ হাজার গভীর নলকূপ বসালে বোরো মৌসুমে তিন লক্ষ একর জমিতে অতিরিক্ত একটা ফসল হবে, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে জাতি আরো একটা বড় ধাপ এগিয়ে যাবে,তারা খুশী। কৃষি মন্ত্রী খুশী–তাঁর মন্ত্রণালয়ের জন্য একটা বিরাট প্রকল্প পাওয়া গেলো।

যখন ৫ হাজার গভীর নলকূপ বসলো সেগুলি চললো কিনা, ফসল হলো কিনা এর খবর নেয়ার আর দরকার কি? যদি না চলে থাকে দাতা সংস্থার লোকজন অনায়াসে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাবে বাংলাদেশ সরকারের অযোগতার প্রমাণ। অনুদানে দেওয়া গভীর নলকূপগুলি চালানোর ক্ষমতাও এ সরকারের নেই–তারা বলে বেড়াবে।

এই অচল পাঁচ হাজার নতুন গভীর নলকূপ কি আমাদেরকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে দিয়ে গেলো? যদি না-দিয়ে থাকে কাকে দোষ দেবো? দাতা সংস্থাকে? আমাদের নিজেদের অযোগ্যতাকে? আমাদের সীমাহীন লোভকে?

আমাদের নেশামুক্তি দরকার। বিনা পয়সায় বিষ পেলে বিষ খাবো এই দর্শন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেকটা প্রকল্প আমরা নিজেরা রচনা করবো–এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রকল্প তৈরী করার আগে টাকা পাওয়া গেলে সে টাকা আমরা নেবো না–এরকম একটা সংকল্প থাকতে হবে। আমাদের প্রকল্পে, আমাদের শর্তে টাকা গ্রহণ করবো। আমরা ঠিক করবো কোন প্রকল্প আগে হবে, কোন প্রকল্প পরে হবে। আমরা ঠিক করবো কোন প্রকল্পে কতটুকু বিদেশী সাহায্য না–নিলে নয়।

বাস্তবে আমরা উল্টো কাজ করে যাচ্ছি। এখন প্রকল্পের আগ-পর বিচার করার অবকাশ আমাদের হাতে নেই। দাতা গোষ্ঠীই ঠিক করেন আমাদের কি কি দরকার,কতটা দরকার, কখন দরকার, কি ধরনের দরকার। আমরা শুধু সায় দিয়ে যাই। তাঁদের পরামর্শকরা প্রকল্পের কাঠামো, আয়তন থেকে শুরু করে যাবতীয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিবরণ স্থির করে দেন। আমরা তাতে মোটেই কুণ্ঠিত হই না। আমাদের নজর শুধু টাকার অংকটার প্রতি। টাকাটা পাওয়া গেলেই হলো। টাকা নিতে যাতে বিবেকের খোঁচা না–খাই সেজন্য একটা মোক্ষম যুক্তিও খাঁড়া করে নিয়েছি– অতীতে তোমরা আমাদের শোষণ করেছো, দাও এখন, ছাড়ো কড়ি। তুমি পানি ঘোলা না-করে থাকলে তোমার বাবা পানি ঘোলা করেছে।

স্বনির্ভরতার ব্যাপারে আমরা যদি সিরিয়াস হতে চাই–সেটা প্রথম স্তর থেকেই শুরু করতে হবে। প্রকল্প রচনাতে আমরা স্বনির্ভর হতে পারলে তবে অর্থনীতিতে স্বনির্ভর হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কলম যার হাতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন

সেই রচনা করে। বিদেশীর কলম দিয়ে আমাদের স্বপ্ন রচিত হতে দিলে শুধু দুঃস্বপ্নই রচিত হবে।

স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হলে আরেকটা কাজ করতে হবে। পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে"কেড়ে খাওয়ার" অভ্যাসটা ছাড়তে হবে। এটা এখন আমাদের জাতিগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। দাবী করে, গোলযোগ সৃষ্টি করে, জনজীবন অচল রেখে, মারাত্মক একটা ক্ষতির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে আমরা নিজের এবং নিজেদের অল্প কিছু লোকের জন্য সুবিধা আদায় করে নিয়ে নিই। একাজে কেউ কারো থেকে কম নন। কর্মচারী, শিক্ষক, শ্রমিক, পেশাজীবিবৃন্দ–কেউ বাদ পড়েন না। বাড়তি সুবিধা দিতে গেলে কোথাও না কোথাও একই পরিমাণের আয়ের সৃষ্টি করতে হবে একথা আমরা মনে রাখার প্রয়োজনবোধ করছি না। প্রতিষ্ঠান লোকসানে চলে চলুক, আমাদের বোনাস দিতে হবে। বেতন বাড়াতে হবে। শিল্প কারখানায় মোট চলতি ব্যয়ের অর্ধেকও উপার্জন জমা হয় না–কিন্তু বেতন বৃদ্ধির দাবী মানতে হবে। এরকমভাবে অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দিয়ে দেশকে স্বনির্ভর করার কথা বলা হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র।

স্বনির্ভরের পথ হলো–উৎপাদন বাড়লে, উদ্বৃত্ত হলে, মুনাফা হলে আমাদের বেতন বাড়বে, এই নীতি সর্বস্তরে মান্য করা। সেখানেও আবার মনে রাখতে হবে, যতটুকু উদ্বৃত্ত হবে,মুনাফা বাড়বে,ততটুকু পুরো খেয়ে ফেললে তাহলে প্রবৃদ্ধি হবে না, উৎপাদনের ভিৎ প্রশস্ততর করার সুযোগ থাকবে না। কাজেই সবটা উদ্বৃত্ত/মুনাফাও খাওয়া যাবে না। আগামীদিনের জন্য তাকে খাটাতে হবে। স্বনির্ভরতার পথে পাড়ি দিতে হলে সংযম, শৃংখলা এবং কঠিন পরিশ্রমকে মেনে নিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

আমরা বিপুল বেকার জনগোষ্ঠীর কর্ম-সংস্থানের কথা বলি শুধু আলোচনা জমাবার জন্য। কর্ম-সংস্থানের জন্য আমার যা করণীয় সেটা করতে আমি মোটেই উৎসুক নই। এটা রেলগাড়ীতে চড়ার মত ব্যাপার। একবার ঠেলাঠেলি করে গাড়ীর কামরায় ঢুকতে পারলেই হলো--তখন শোবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অন্যরা যারা কামরায় ঢুকতে পারি নি তাদের ঠেকাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাই। নিজের কর্ম–সংস্থান একবার করতে পারলেই হলো–তারপর নিজেকে ছড়িয়ে খোলাসা করে আরামের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করে নিতে চাই। আমার আরাম–আয়েশ নিশ্চিত করার সঙ্গে অন্যের কর্ম–সংস্থানের যদি কোন সংঘাত হয় সেটা আমি বিবেচনায় আনতে মোটেই প্রস্তুত নই। আমরা যখন একবার গাছের পরিচর্যায় দায়িত্ব পাই, পরিচর্যার কথা ভুলে গিয়ে সবাই মিলে প্রথমে কাড়াকাড়ি করে গাছের কাঁচাপাকা ফলগুলি খেয়ে শেষ করি। তারপর পাতা খাই। তারপর শাখা-প্রশাখা খাই। কাণ্ড না–খাওয়া পর্যন্ত আমাদের যেন বিরাম নেই। গাছকে যদি আরো ফলন্ত করার প্রয়াসে আমাদের মেধাকে কাজে লাগাতাম তবে নিজেরাও খেতাম, অন্যদেরও খাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারতাম। কাউকে খাওয়াবার জন্য ধারকর্জ কিংবা ভিক্ষা করতে হতো না।

চাকুরী নেবো, আরাম আয়েশ চিরস্থায়ী করবো, কিন্তু যেকাজটার জন্য আমার চাকুরী, আমার বেতন নেওয়া, সেটা অতি দক্ষতার সংগে এড়িয়ে চলবো

এটাই আমাদের নীতি। আমরা সবাই মিলে এই নীতি পালন করি, তোষণ করি এবং অন্যদেরকে পালন করতে উৎসাহিত করি। স্বনির্ভরতা যদি চাই তবে বেতন গ্রহণ করলে যেকাজের জন্য বেতন নিলাম সেটা ষোল আনা পালন করতে আমাদেরকে বাধ্য থাকতে হবে। এটা যদি নিশ্চিত করতে পারি দেশ স্বনির্ভরতার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

চাকুরীর মেয়াদকালে কেউ যদি কোন অপরাধ করে তার শাস্তি দেওয়াটাই এখন অপরাধের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না। শাস্তি দিতে গেলে তদবির, সুপারিশ, হুমকি, আক্রমণ সব কিছুই হতে পারে। অন্যায়কারী শাস্তি পাবেই এরকম পরিবেশ আমরা সবাই চাইবো অথচ আমি আর আমার ভাগ্নেদেরকে এই নীতির বাইরে রাখবো তাহলে ত আর চলে না।

সরকার বারবার বলছে হাজার কোটি টাকা ভর্তুকী দিয়ে তাকে কয়েকটি বিশেষ শিল্প কারখানা চালাতে হচ্ছে। কার পকেটের হাজার কোটি টাকা এনে সরকার এই কারখানার বিরাট গর্তের মধ্যে প্রতি বছর ঢেলে দিচ্ছে–আমরা যদি একবার জিজ্ঞেসও না-করি তাহলে স্বনির্ভর হওয়ার পরিবর্তে পরনির্ভরতার তুংগে পৌঁছা ছাড়া ত আমাদের গত্যন্তর নেই। হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর গর্তের ভেতর না-ঢেলে সেটাকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা ত করা যেতে পারে। কারখানা বন্ধ করে দিয়ে ঐসব কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ঐ হাজার কোটি টাকা বন্টন করে দিয়ে দেয়া যেতে পারে। তাঁরা কারখানা ছেড়ে দিয়ে তাঁদের বরাদ্দের টাকা নিয়ে গ্রামে গিয়ে জমি কিনে ছেলেমেয়ে নিয়ে গৃহস্থী করে খাবে। গঞ্জে দোকান দেবে। নতুন ব্যবসা শুরু করবে। কিংবা ব্যাংকে জমা রেখে সুদের পয়সায় সংসার চালাবে।

এটা কেমনতরো কথা? প্রতিবছর এরকম গর্ত ভরানোর জন্য মাটির দলা ফেলতেও কষ্ট লাগার কথা, টাকা ফেলা ত দূরের কথা। অথচ আমরা মোটেই কষ্ট পাচ্ছি না। নিজের আয়ে চলার কোন সম্ভাবনা না-থাকলে শিল্প-কারখানাকে ত দেউলিয়া ঘোষণা করার কথা। দেউলিয়া আইন প্রয়োগ করার সময় অনেক আগেই হয় গেছে। অথচ আমরা কাউকে দেউলিয়া বলে চিহ্নিত করতে সাহস পাচ্ছি না। স্বনির্ভরতা কঠিন পথ। রেশমকোমল নীতি (বা নীতিহীনতা) দিয়ে স্বনির্ভরতা ঘরে আনা যায় না।

আমরা চট করে সরকারকে দোষ দিচ্ছি স্বনির্ভরতার পথ না-ধরার জন্য। সরকার কি সাধে পরনির্ভরতার পথ ধরেছে? আমরা সবাই মিলে সরকারকে বাধ্য করছি পরনির্ভর হতে। কেউ কিছু করবো না, কেউ কোন আইন মানবো না, নীতিমালা মানবো না, উৎপাদন করবো না–অথচ সরকারকে সব কিছু ঘরে এনে দিতে হবে (মায় সাংসদদের জন্য পেনশন এবং ডিউটি–ফ্রি গাড়ী পর্যন্ত)। এ অবস্থায় সরকারকে বড় লোক মুরব্বী ধরা ছাড়া আর গত্যন্তর কি? রাজনৈতিক দলের নেত্রী যখন বলেন, "সরকার টাকা কোথা থেকে যোগাড় করবে সেটা সরকার জানবে" তখন স্বনির্ভরতা অর্জনের ব্যাপারে মনে আর আশার সঞ্চার হয় না।

অস্থায়ী সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তাঁদের কাছে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। প্রস্তাবটি হচ্ছে তাঁদের আমলে তাঁরা কোনরূপ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করবেন না– যা কিছু ব্যয় করবেন সবটা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করবেন। বৈদেশিক সাহায্য পরবর্তীতে কত নেয়া হবে, নেয়া হবে কি হবে-

না সেটা নির্বাচিত সরকার এসে স্থির করবে। আমার এপ্রস্তাবকে অনেক অর্থনীতিবিদ ঠাট্টামস্করা মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে এ প্রস্তাব করেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম যে এরকম একটা স্বল্পস্থায়ী সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘস্থায়ী একটা দৃষ্টান্ত দেশের সামনে তুলে ধরতে পারে।

আমাকে অনেকে বুঝালেন বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ হলে দেশে হৈ চৈ পড়ে যাবে। দেশ অচল হয়ে যাবে। আমি বল্লাম, দেশে হৈ চৈ পড়বে আমি মানি। কারণ যাঁদের রসের হাঁড়ি ভেংগে যাবে তাঁরা গোস্বা ত করবেনই। গোস্বা করলে হৈ চৈ হবেই। কিন্তু দেশের জন্য একটা সুবিধা হবে। কারা কারা গোস্বা করছেন সেটা পরিষ্কার দেখা যাবে। গরীব মানুষ মোটেও গোস্বা করবে না। হৈ চৈও করবে না। তিন মাস বৈদেশিক সাহায্য না-নিলে দেশ অচল হতো না সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

বৈদেশিক সাহায্য না-নেয়াকে উপলক্ষ্য করে দেশের মানুষের মনে একটা কর্ম উদ্দীপনা সৃষ্টি করারও সুযোগ পাওয়া যেতে পারতো। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে বাধ্য করা যেতো বৈদেশিক সাহায্য, স্বনির্ভরতা ইত্যাদি ব্যাপারে পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করার ব্যাপারে।

পরনির্ভরতা আমাদেরকে দায়িত্বহীন জাতিতে পরিণত করেছে। বড়লোকের বাড়ীতে গরীব আত্মীয়, যার কোন কিছু করার দায়িত্ব থাকে না অথচ দিব্যি খায়দায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়–আমাদের অবস্থাও তেমনটি। আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত করে নিয়েছি। রাস্তা বানাতে হয় বিদেশী বন্ধুরা এসে বানিয়ে দেবেন। সেতু বানাতে হয় তাঁরা এসে বানিয়ে দেবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁরা বানাবেন। পুকুর সংস্কার তাঁরা করে দেবেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁরা গড়ে দেবেন। প্রশিক্ষণ লাগে তাঁরা দেবেন। গাড়ী লাগে, বাস লাগে,ট্রেন লাগে তাঁরা দেবেন। বন্যা হলে তাঁরা আছেন। জলোচ্ছ্বাস হলে তাঁরা দেখবেন। আমরা শুধু আরো বেশী সাহায্য/ভিক্ষা পাবার কাজে আমাদের বুদ্ধি খাটাবো। আর বুদ্ধি খাটাবো যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে তার কতটুকু কে দখলে নেবো। চর দখলের মত দখল। সৃজনশীলতার, কৃচ্ছ্রতা সাধনের, নবতর উৎপাদনের আর কোন গুরুত্ব নেই। সকল গুরুত্ব এখন কাড়াকাড়ির।

স্বনির্ভরতা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফাইলে লেখা একটা সিদ্ধান্তমাত্র নয়। এটাকে হতে হবে জাতির একটি প্রচণ্ড কামনা। দৃঢ় অঙ্গীকার। তার আয়োজনকে হতে হবে সামগ্রিক। আমাদের রাজনৈতিকদলগুলির প্রতি একান্ত আবেদন তাঁরা স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে করণীয় সকল বিষয়ে দৃঢ় ঐক্য প্রদর্শন করুন। সরকারকে অনুরোধ করবো যদি স্বনির্ভরতা সত্যি প্রতিষ্ঠিত করতে চান–তাহলে মনকে শক্ত করুন। কঠিন সিদ্ধান্তগুলি নিতে থাকুন। দেশের মানুষ আপনাদেরকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেবে।

---

২৬ মার্চ, ১৯৯২ তারিখে 'দৈনিক বাংলা'র স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য করণীয় কাজগুলি

"উন্নয়ন" বলতে আমরা কি বলতে চাচ্ছি তার সম্বন্ধে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা স্থির করা উচিত। জাতি হিসেবে আমাদের নিজস্ব একটা "উন্নয়ন" দর্শন থাকা দরকার। আমরা সবাই উন্নয়নের কথা বলছি—কিন্তু অন্ধের হাতি দর্শনের মত এ ব্যাপারে একেক জনের মনে একেক ছবি অংকিত আছে। সবার মনে একই ছবি কিংবা মোটামুটি একই ছবি থাকলে কাজ সহজ হবে।

আমার কাছে উন্নয়নের সংজ্ঞাটি হচ্ছে—নীচের অর্ধেকাংশ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। অর্থাৎ যে সমস্ত অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং কর্মকাণ্ড নীচের অর্ধেকাংশ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয় সেগুলিকে আমি উন্নয়ন কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করতে চাই না।

"প্রবৃদ্ধি" সম্বন্ধেও আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য-বিমোচন ত্বরান্বিত করে আমরা কেবলমাত্র সেই প্রবৃদ্ধিকে গ্রহণ করবো, তার জন্য শ্রম, মেধা ও সম্পদ বিনিয়োগ করবো। যে প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য-বিমোচনে সহায়ক নয়, এমনকি দারিদ্র্য-বিমোচন না-করে দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে সে প্রবৃদ্ধি থেকে আমরা সকল উপায়ে দূরত্ব বজায় রাখবো। প্রবৃদ্ধির ধূয়া তুলে সে যেন আমাদের কর্মকাণ্ডের তালিকায় ঢুকে পড়তে না-পারে সেজন্য চারদিকে আমরা সতর্ক প্রহরা বসাবো।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী রচনার আগে প্রথম যে জিনিসটি বিবেচ্য সেটি হচ্ছে কত আন্তরিকভাবে আমরা দারিদ্র্যের অবসান চাই।

কতটুকু অবসান চাই। দারিদ্র্য আমাদের কাছে কত অগ্রহণযোগ্য। একজন মানুষ হিসেবে অন্য আরেকজন মানুষকে ইতর প্রাণীর মত বাঁচতে দেখাটা আমাদের কাছে কতটুকু অসহনীয়। একজন মানুষের সকল সৃজনশীলতাকে, উৎপাদনশীলতাকে অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে উপার্জন সৃষ্টি করতে আমরা কতটুকু আগ্রহী।

শুরুতেই স্থির করতে হবে এক বছরে আমরা কতটুকু দারিদ্র্য কমাতে চাই। ব্যাপকতার দিক থেকে কত কমাবো। গভীরতার দিক থেকে কত কমাবো। আগামী পাঁচ বছরে কত কমাবো। আমাদের সবটুকু দারিদ্র্যের অবসান কত বছরে করতে চাই।

দারিদ্র্য-অবসান ছাড়াও উন্নয়নের অন্য কোন লক্ষ্য থাকলে সেগুলি কি কি— তা তালিকাভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। দারিদ্র্য বিমোচনে মোট কত সম্পদ ব্যয় করতে চাই তা আগেই স্থির করে ফেলতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনকে অন্য দশটি উন্নয়ন লক্ষ্যের ভিতর হারিয়ে ফেলা থেকে বাঁচানো প্রয়োজন। এটা নিশ্চিত করার জন্য ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে পৃথক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন।

দারিদ্র্য নিরসনের জন্য অর্থ সম্পদের চাইতে বেশী জরুরী যেটা সেটা হলো সংকল্পের দৃঢ়তা। তারপর প্রয়োজন এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন।

মনে রাখতে হবে দারিদ্র্য দারিদ্র্যের দ্বারা সৃষ্টি হয় নি। এর সৃষ্টি হয়েছে অদরিদ্র্যের দ্বারা। ক্ষমতাবানরা যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রচনা করেছেন, যে সব নীতি রচনা করেছেন তার মাধ্যমেই দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছে। দরিদ্র্যদের দরিদ্র্য করে রাখার জন্য তাদের চারদিকে বহু প্রাতিষ্ঠানিক দেয়াল তৈরী করা হয়েছে। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের অবস্থান থেকে বের করে আনতে হলে এই প্রাতিষ্ঠানিক দেয়ালগুলি ভাঙ্গতে হবে।

দরিদ্র্য বলতে আমরা কাকে বুঝাবো সে সম্বন্ধে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দরিদ্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্বচ্ছ। সুবিধা মত আমরা একেক জনকে একেক সময় দরিদ্র্য বলে চালিয়ে দিই। আমি দেশের নীচের অর্ধেকাংশ মানুষকে দরিদ্র্য বলে অভিহিত করি। সকল পণ্ডিত একমত হয়ে যদি নীচের ৬০ শতাংশ কিংবা ৬৫ শতাংশ মানুষকে দরিদ্র বলে ঘোষণা দেন তাতে আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে এই বিভক্তি রেখাকে মেনে চলতে হবে। তবে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দেশের নীচের অর্ধেকাংশ মানুষকে গরীব বলে চিহ্নিত করলেই কাজটা সহজ ও সুনির্দিষ্ট হবে।

নীচের অর্ধেকাংশ মানুষের জীবন থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের নীতি গ্রহণ করার সংগে সংগে এঁদের মধ্যে আবার একটি অগ্রাধিকার স্থির করে নিতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি যে, যিনি অন্যের তুলনায় যত বেশী নীচে তিনি তত বেশী অগ্রাধিকার পাবেন। যেমন সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ মানুষ সব চাইতে বেশী অগ্রাধিকার পাবেন। জাতির দায়িত্ব হবে সবার আগে তাঁদেরকে দারিদ্র্য দশা

থেকে মুক্ত করা। তারপর পরবর্তী ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ১০ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁদের দিকে নজর দিতে হবে। অগ্রাধিকার সম্বন্ধে সচেতন না—হয়ে আমরা যদি আমাদের সমস্ত উদ্যোগ শুধু নীচের অর্ধেকাংশ মানুষের দিকে নিবদ্ধ করি তাহলে এমন হতে পারে যে আমরা এঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান তাঁদের দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছি বেশী। সেজন্য অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্র মহিলাদের প্রতি অধিকতর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটা যেমন উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন তেমনি তাঁদের দুর্বলতার কারণেও প্রয়োজন। শিশুদেরকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। কারণ শিশুরাই ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলবে। বর্তমান প্রজন্মকে দিয়ে যেটা সম্ভব হয়ে উঠবে না সেটা অনায়াসে শিশুদের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দিয়ে সম্ভব হবে।

প্রায় সময় অজুহাত দেয়া হয় দারিদ্র্য নিরসনের জন্য উপযুক্ত প্রকল্প পাওয়া যায় না। এর চাইতে ভোঁতা অজুহাত আর হয় না। শুধু এক বিশেষ শ্রেণীর প্রকল্পকে নবরূপে রূপান্তরিত করলেই কাতারে কাতারে প্রকল্প পাওয়া যাবে। সেগুলি হচ্ছে "সকলের জন্য অমুক", "সকলের জন্য তমুক" জাতীয় প্রকল্পগুলি।

যেখানেই কোন প্রকল্পে লেখা থাকে এটা "সকলের জন্য"—তবে নিশ্চিত বুঝতে হবে এটা "কেবলমাত্র ক্ষমতাবানদের জন্য"। সকলের জন্য হলেই সেটা সহজে ক্ষমতাবানদের এখতিয়ারে চলে যাবে, এটা জানা কথা। কারণ সেভাবেই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলা হয়ে থাকে। সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য বাসস্থান, সকলের জন্য পরিবেশ ইত্যাদি কর্মসূচীগুলি ক্ষমতাবানদের সেবায় নিয়োজিত করার জন্যই আসলে তৈরী করা হয়ে থাকে।

এগুলিকে যদি গরীবের জন্য করতে হয় তাহলে সেগুলি এভাবে রচনা করতে হবে ঃ দরিদ্রের জন্য স্বাস্থ্য, দরিদ্রের জন্য শিক্ষা, দরিদ্রের জন্য বাসস্থান, দরিদ্রের জন্য পরিবেশ ইত্যাদি।

এবার ভেবে দেখুন প্রকল্পের অভাব হবে কি করে। এদ্দিন প্রকল্পের অভাব হচ্ছিল কারণ গরীবের ভাগটা "সকলের জন্য" মার্কা দিয়ে অবস্থাপন্নদের বাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলে।

আরেক শ্রেণীর প্রকল্প হবে নতুন নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। গরীবের জন্য ঋণ দেবার প্রতিষ্ঠান, গরীবের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রকল্প ইত্যাদি। যেমন নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে তেমনি পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি দারিদ্র্য নিরসন ত করেই না বরং দারিদ্র বৃদ্ধি করে সেগুলি সংশোধন করতে হবে, বাতিল করতে হবে, স্থগিত করতে হবে। এই নিয়েও প্রকল্প রচিত হতে পারে।

গ্রাম পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার গড়ে তোলা দারিদ্র্য নিরসনের একটা আবশ্যিক শর্ত। স্থানীয় সরকার কাঠামো যত নীচের দিকে শক্তিশালী করা হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গরীব মানুষের অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা

ততই বাড়বে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যত বেশী অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে ততই সিদ্ধান্তগুলি গরীবের স্বপক্ষে যাবে।

এজন্য নির্ভেজাল গণতন্ত্র দারিদ্র্য নিরসনের জন্য এত বেশী প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে গরীব মানুষের সবচাইতে বড় শক্তি হলো তার সংখ্যা। গণতন্ত্র চলে সংখ্যার জোরে। গণতন্ত্রকে যদি নির্ভেজাল রাখা যায় তবে গরীব মানুষের স্বার্থ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিফলিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠী সকল প্রকার মৌলিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে পারলে গরীব মানুষের পক্ষে সরকারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যম মৌলিক মানবিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ বাড়বে। ঋণ প্রাপ্তিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ঋণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা গেলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠা করার কাজ সম্ভব হবে এবং সহজতর হবে। প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তির (মহিলা, পুরুষ, কিশোর,কিশোরী) জন্য ঋণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন সৃষ্টি করার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

সরকারের কর নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। পরোক্ষ করগুলি ঘুরে ফিরে গরীবের কাঁধে গিয়ে চাপে। বেচারা টেরই পায় না বহু অযোগ্যতা, অদক্ষতা এবং দুর্নীতির জন্য তাকে বিপুল পরিমাণে খেসারত দিতে হচ্ছে।

পরোক্ষ করের অংশ কমিয়ে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তাতে গরীবের উপর বোঝা ত কমবেই সরকারকেও আরো সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে।

ভর্তুকী, কর রেয়াত পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। যে ভুর্তকী, কর রেয়াত শুধু বিত্তবানদের নিকটেই সকল সুবিধা পুঞ্জিভূত করছে সেগুলি বাতিল করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সরাসরি ভর্তুকী,কর রেয়াত দেবার কাঠামো রচনা করতে হবে। যেখানে যেখানে সম্ভব গরীবের নামে অন্যকে সুবিধা না-দিয়ে সকল সুবিধা গরীব জনগোষ্ঠীকে সরাসরিভাবে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পনা কমিশন ও বি আই ডি এস-এর যৌথ উদ্যোগে জানুয়ারী ১৪-১৫, '৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশের দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচীসমূহের মূল্যায়ন" শীর্ষক সেমিনারে পঠিত

গ্রামোন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

আপনারা, যাঁদের সামনে আজ আমাকে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁরা সবাই সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি। আপনাদের সকলেই নিজ নিজ পেশায় ত বটেই,সাধারণভাবেও এদেশে নিজেদের অবস্থান ও অবদানের জন্য সুপরিচিত। আপনাদের সামনে কোন বিষয়ে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করা আমার পক্ষে ঔদ্ধত্যের ব্যাপার হবে। নতুন কোন কথা আপনাদের কাছে উত্থাপন করতে পারার যোগ্যতা আমার নেই। যেহেতু আমাকে আপনারা মেহেরবাণী করে কিছু কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাই আমি আমার সীমাবদ্ধতার কথা নিবেদন করে আপনাদের অতিপরিচিত দু'একটি পুরানো বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। এতে যদি আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করি তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

সফলতার শ্রেণী বিন্যাস থাকা দরকার

সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বড় ব্যস্ত মানুষ। উপরে ওঠার পথে তাঁদেরকে এই ব্যস্ততার অভ্যেসটা আয়ত্ব করতে হয়। ব্যস্ততার এমন এক গতি, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবার পরেও তার থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না।

সাফল্যের সাধনা অবশ্যই সকলের সাধুবাদ পাবে। কিন্তু এই সাধনা ভীতিপ্রদ বিষয় হয়ে দাঁড়াতে বেশীক্ষণ সময়ও লাগে না। সাফল্যের সাধনা যদি অন্যকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে নিজের জন্য আরাম করে শোবার জায়গা করে নেবার সাধনা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তবে আতঙ্কিত

হতে হয় বৈ কি। যাঁরা ব্যক্তিগত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে মানুষের প্রতি মানুষের ন্যূনতম দায়িত্ববোধ, সাধারণতম নীতিবোধ, সমাজবদ্ধ জীবন ব্যবস্থাকে সমর্থন যোগানোর জন্য ক্ষীণতম মূল্যবোধটিও হারিয়ে ফেলেন তাঁদের সফলতা কেবল সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়েই আসতে পারে। ব্যক্তি জীবনে সফলতাকামী সকল মানুষের নিয়ত একটি প্রশ্নের জবাব নিজের কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে ঃ আমি কি ধ্বংসের বিনিময়ে নিজের সফলতা আনতে যাচ্ছি?

সফলতা বড় নেশাদার জিনিস। বিনাশর্তে আমরা যেভাবে সকল সফলতাকে অকৃপণ সাধুবাদ জানাই তাতে এই নেশা আরো জমজমাট হতে বাধ্য। সমাজে যদি আমরা প্রতিনিয়ত সফলতাকে প্রশ্ন না-করি, সফলতার শ্রেণী বিন্যাস না-করি, তবে সমাজে আর সব সফলতাকে হটিয়ে দিয়ে অবশেষে শুধু একশ্রেণীর সফলতাই টিকে থাকবে। তা হবে দুর্বৃত্তের সফলতা। আমি আপনাদের সামনে বিষয়টি তুলে ধরলাম এজন্যে যে, আমার মনে হচ্ছে সফলতাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ—বর্জনের প্রবৃত্তি আমাদের সমাজ হারিয়ে ফেলতে বসেছে। এভাবে অগ্রসর হতে থাকলে ক্রমে ক্রমে আমরা দুর্জন নিয়ন্ত্রিত সমাজের অংশ হয়ে একটি মাত্র সফলতাকেই চিনবো এবং তাকেই সোৎসাহে সাধুবাদ দিয়ে যাবো। সফলতার গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা না গেলে আমাদের শেষ পরিণতি দেখতে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

আজ যেহেতু একটি সুপরিচিত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সমাবেশে কথা বলতে দাঁড়িয়েছি আমার মনে হয় আমার বক্তব্য সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বিষয়ক হলে প্রাসংগিক হবে।

এদেশে বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান আছে। তার মধ্যে বেশীর ভাগ দীর্ঘকাল ব্যাপী নিষ্ক্রিয় থাকে। মাঝে মধ্যে বিশেষ উপলক্ষে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান চাংগা হয়ে উঠে। এদেশের ভয়াবহ দুর্যোগগুলি এরকম উপলক্ষের সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে। যে সমস্ত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কর্মসূচী পরিচালনা করে তাঁদের অনেকেই ভাবনা চিন্তা করে কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য সময় করতে পারেন না, অথবা খুব বেশী ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।

কমবেশী সব সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এদেশের ব্যাপক দারিদ্র্যের মোকাবেলায় সাধ্যানুসারে ভূমিকা রাখতে চায়। কিন্তু নানা রকম শব্দ এবং ধারণার মারপ্যাচে পড়ে যে সমস্ত কর্মসূচী নিয়ে তারা এগিয়ে যায় তার দ্বারা গরীবের বিশেষ কোন উপকার হয় না। বরং অনেকক্ষেত্রে উল্টোটাই হয়ে যায়। গরীব মানুষকে আরো গরীব করার জন্য যারা দায়ী তারাই এসমস্ত কর্মসূচী থেকে ফায়দা পেয়ে যায়।

একটা সাধারণ ভুল সর্বপর্যায়ে বহুদিন ধরে চলে আসছেঃ দারিদ্র এবং কৃষি কাজ সমার্থক ধরে নেওয়া। এটার কোন মানেই হয় না। কৃষক মাত্রেই দরিদ্র নহেন। দরিদ্র মাত্রেই কৃষক নহেন। কিন্তু আমরা কেন জানি ধরে নিয়েছি যে কৃষির জন্য কিছু একটা করতে পারলে গরীব লোকের উপকার হবে। দরিদ্র আর কৃষক এক করে দেখার ফলে আমরা আরো একটা ভুল করে যাচ্ছি। বাংলাদেশে

কৃষক বলতে পুরুষ মানুষের ছবি মনে ভেসে উঠে। কৃষকের উপকার করতে গিয়ে শুধু যে গরীব মানুষকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি তা নয়, পুরো মহিলা জনগোষ্ঠীকে চিন্তার বাইরে রেখে চলে যাচ্ছি।

কৃষির উপকার হলে গরীব লোক উপকৃত হবে--- এ ধারণাটি অন্য আরেকটি বিবেচনা থেকে আসতে পারে। আমরা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত ধরে নিই যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে দারিদ্র্যের অবসান হবে। কিন্তু সেটা কি সত্যি? কর্ম—সংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ীও করে রাখা যায়। একজন মানুষকে আমি এমন একটি মজুরী নির্দিষ্ট করে দিতে পারি তাতে তিনি কোন রকম পেটে-ভাতে বেঁচে থাকতে পারেন মাত্র,তার বেশী যেন তিনি না পান। সারা জীবন উদয়াস্ত পরিশ্রম করলেও তিনি দারিদ্র থেকে মুক্তি পাবেন না।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে হলে এমন এক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে হবে যার মাধ্যমে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত আয় ও সম্পদ বাড়িয়ে যেতে পারে। তা না-হলে দারিদ্র থেকে মুক্তি আসবে না।

গরীব মানুষকে পেশার নাম ধরে খোঁজার দরকার নাই। মানুষের বিত্তের খোঁজ নিলেই চিনা যাবে লোকটি গরীব কি গরীব নয়। তিনি যে পেশাতেই নিয়োজিত থাকুন না কেন তাঁর আয় বৃদ্ধির আর সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমেই দারিদ্র কমতে পারে। এটাকে এভাবে সোজাসোজি দেখা ভালো। ঘুরপ্যাঁচের মধ্যে গেলেই সব কর্মসূচী বিত্তশালীদের হাতে চলে যায়।

অনেক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ গ্রামকে 'দত্তক' হিসেবে গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দের সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদার প্রভাব খাটিয়ে তাঁরা ঐ গ্রামটির জন্য সরকারী সুযোগ সুবিধাগুলি সংগ্রহ করে এনে দেবার চেষ্টা করেন। তার উপর প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত অর্থ দিয়েও জনসেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন এই গ্রামের জন্য।

প্রথম দৃষ্টিতে এতে কোথাও কোন গলদ আছে বলে মনে হয় না। সদস্যবৃন্দ উৎসাহ সহকারে গ্রামটির উন্নয়ন করার চেষ্টা করে যান। কিন্তু "গ্রামোন্নয়ন" বলতে আমরা কি বুঝাতে চাচ্ছি সেটা পরিষ্কার করে বুঝে নেবার সময় কারো হয়ে উঠে না। গ্রামের মুরুব্বীরা যদি আমাদের বুঝিয়ে দেন যে এই গ্রামে রাস্তার বড় অভাব, একটা রাস্তা হলে লোকের খুব উপকার হবে--- আমরা তথাস্তু বলে লেগে যাই একাজে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারী দফতরে আমাদের যত বন্ধুবান্ধব আছে তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলি আমলাতন্ত্রের সকল বাধাবিপত্তি ডিংগিয়ে আমাদের দত্তক গ্রামে একটা মজবুত রাস্তা বানিয়ে দিতে।

মুরুব্বীরা যদি বলেন, গ্রামের স্কুলটার সরকারী অনুদান পাওয়া দরকার, প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণ করা দরকার, একটা গভীর নলকূপ দরকার, একটা খাল কেটে দেয়া দরকার--- আমরা একই পদ্ধতিতে সেটা সমাধা করে দেবার চেষ্টা করি। গ্রামবাসীরাও অনেক দামী দামী "মামা" পেয়ে নিত্য নতুন জিনিস পাবার জন্য তালিকা বানাতে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক একটা কাজ সমাধা করার পর ধুম ধাম করে সেটা উদ্বোধন করা হয় এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে ছাপানোর জন্য একটা উপযুক্ত ছবি তুলে রাখা হয়।

আসলে "গ্রামোন্নয়ন" মানে কি? গ্রামোন্নয়ন মানে কি রাস্তাঘাটের উন্নয়ন? সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন? কৃষির উন্নয়ন?

আমার মনে হয় "উন্নয়ন" বিষয়টাকে গরীব মানুষের সংগে সম্পর্কিত করে দেখলে এটা সঠিক ভাবে দেখা হবে। আমার কাছে গরীব মানুষের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার নামই হলো উন্নয়ন। একটা কাজের ফলে যদি গরীব মানুষের আয় এবং/অথবা সম্পদের বৃদ্ধি না ঘটে তাহলে আমি সেটাকে উন্নয়নমূলক কাজ বলে গণ্য করব না। একই পরিমাণ বিনিয়োগের মাধ্যমে যত রকমের কাজ সম্পাদন করা যায় তার মধ্যে ঐটিই উন্নয়নমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে যেটির ফলে গরীবের আয়/সম্পদ বৃদ্ধি অধিকতর হবে। এ-ই হবে উন্নয়নমূলক কাজ বাছাই করার একমাত্র মাপকাঠি।

গ্রামের জন্য রাস্তা বানালে গরীব লোকের আয়/সম্পদ বৃদ্ধি হতেও পারে, না-ও হতে পারে। যদি না—হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সে রাস্তা নির্মাণ উন্নয়নমূলক কাজ হিসেবে গণ্য হবে না। যদি রাস্তা বানানোর ফলে গরীবের আয় কমে যায়, সম্পদ বিনষ্ট হয়,তবে রাস্তা বানানোটা উন্নয়ন বিরোধী কাজ হবে।

অনেক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান আছে সমাজসেবা যাদের মূল লক্ষ্য না-হলে ও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। তাদের নানাবিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা সমাজ সেবার কাজে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধন করতে পারে না। অনেক সময় তার বড় কারণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দের মধ্যে অল্প কয়েকজনের উপর দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে অন্যরা কর্তব্য সমাধা হয়েছে বলে ধরে নেন। এটা সত্যি কথা যে সবাইকে দিয়ে সকল কাজ হয় না। এতে আমি আপত্তিরও কিছু দেখি না। আমার আপত্তি হচ্ছে যে অল্প কয়েক জনের উপর চণ্ডীপাঠ থেকে জুতাসেলাই করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া নিয়ে।

যদি সমাজসেবাকে সংগঠন গুরুত্ব দিয়ে থাকে তবে তার জন্য আনুষংগিক প্রস্তুতি নেয়াই আমি সংগত মনে করি। সমাজসেবার পিছনে অনেক অর্থ এমনিতেই ব্যয় করতে হয়। এই ব্যয়ের একটি অংশ দিয়ে যদি এই দায়িত্ব পালনের জন্য সার্বক্ষণিক লোক নিয়োগ করা হয় তাহলে কাজটা নিসন্দেহে সুসম্পাদিত হবে। হিসাবপত্র রাখা, লোকজনের সংগে যোগাযোগ রক্ষাকরা, চিঠিপত্র আদান প্রদান, জিনিসপত্র যোগাড়, সর্বোপরি কর্মসূচী বাস্তবায়ন যথেষ্ট শ্রম ও সময়ের ব্যাপার। একাজ গুলির জন্য সার্বক্ষণিক লোক রাখতে অসুবিধা কোথায়?

এদেশের দারিদ্র্যের সমাধান সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মারফত এসে যাবে এটা কেউ আশা করে না। কিন্তু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন রকমের কঠিন কাজ ছোটখাট গণ্ডীর মধ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সংগে সমাধা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন অবশ্যই করতে পারে।

জীবনের প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই কিছু না কিছু কাজ বের করা যাবে যেটা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান বেশ সুন্দরভাবে সমাধা করতে পারে। আয় বৃদ্ধি (ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ), সম্পদ বৃদ্ধি (নতুন প্রযুক্তি, যৌথ উদ্যোগে বৃহত্তর কর্মকাণ্ড), শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, কৃষি, শিল্প, পরিবার পরিকল্পনা, পানীয় জল,

মৎস্যচাষ ইত্যাদি বহুরকম কাজে হাত দেয়া যায়। প্রতিষ্ঠানকে অনেক চিন্তা ভাবনা করে নিজ কর্মক্ষেত্র এমনভাবে বাছাই করতে হবে যাতে কেউ বলতে না— পারে তারা একটা হুজুগে কাজের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। কাজটা ছোট হোক আপত্তি নাই, কিন্তু উপকারের স্থায়ী প্রক্রিয়া যেন সৃষ্টি করে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। গরীবকে সরাসরি লক্ষ্য করে কাজটি করতে হবে।

কিছু উদাহরণ দিলে বোধ হয় আমার কথাটি বুঝাতে সহজ হবে। উদাহরণের খাতিরে আমি এখন কয়েকটি ছোট ছোট কাজের কথা উল্লেখ করছি। আপনারা নিশ্চয়ই এর চাইতে আরো বড় এবং ব্যাপক কাজে হাত দিয়ে ইতিমধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

ফিটকিরি

আমার উদাহরণগুলি মোটামুটি স্বাস্থ্যের খাত থেকেই দিলাম। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম বহু কাজ মনোযোগের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হিসেবে নলকূপ স্থাপনের কথা আমরা বহুদিন ধরে শুনে আসছি। ইউনিসেফের কল্যাণে বাংলাদেশ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও সাধন করেছে। কিন্তু এই অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের বহু গ্রামে নলকূপ পৌঁছে নি। অনেক গ্রামে নলকূপ বসানো বিপুল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। যেমন পটুয়াখালী অঞ্চলে। অনেক মহিলা দুই মাইল গিয়ে পানি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এমন জায়গাও আছে। আবর্জনা মিশ্রিত খালের পানি, ইঁদারার দূষিত পানি,মজা পুকুরের পানি খেয়ে জীবন কাটে এরকম বহু পরিবার আছে বাংলাদেশে। তা ছাড়া বর্ষার মৌসুমে বাছবিচার করে খুব কম লোকে পানি খেতে পারেন।

আমাদের একটা অতি পরিচিত সমাধান কিন্তু ছিল। হালে তার কথা সবাই ভুলে গেছি। ফিটকিরির গুণাগুণ নিয়ে এখন কেউ কথা বলে না। অথচ পানি সিদ্ধ করে খাওয়ার চাইতে ফিটকিরি দিয়ে খাওয়া অনেক বেশী নিরাপদ। এক কলসী পানিতে এক চিমটি ফিটকিরি দিলেই হয়। এটা যে কোন ধরনের পানিকে মানুষের জন্য নিরাপদ করে দেয়। একটি পরিবারের এক মাসের প্রয়োজনীয় পানি বিশুদ্ধ করতে তিন টাকার ফিটকিরিই যথেষ্ট। সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি তাদের নিজ নিজ এলাকায় এক টাকার প্যাকেটে ফিটকিরি বিক্রি করার ব্যবস্থা করে তাহলে বহু লোক উদরাময় এবং অনুরূপ রোগ থেকে বেঁচে যায়।

গলাফোলা রোগ

মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি আমাদের যে কি পরিমাণ সংবেদনশীলতার অভাব গলাফোলা রোগের প্রাচুর্য এটা তার মস্ত বড় প্রমাণ। সবাই এত ব্যস্ত যে এব্যাপারে কিছু করার কথা আমাদের চিন্তার মধ্যেই আসে না। বাংলাদেশের বেশ কিছু এলাকায় এই রোগটি বহু মানুষের আজীবন যাতনার কারণ রয়েছে। এতে মহিলারা বিশেষভাবে কষ্ট পায়। এ-রোগে আক্রান্ত মেয়েদের বিয়ে হওয়াটা যেমন কঠিন হয়ে যায়, তেমনি বিয়ে হলেও সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ হবার সম্ভাবনা

বেড়ে যায়। অথচ সমান্য একটি আয়োজনে এই রোগের স্থায়ী প্রতিকার করা যায়। আয়োডিন যুক্ত লবণ দিয়ে দৈনন্দিন রান্না বান্নার কাজ করলেই এই রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

যে কোন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান একটি সীমিত এলাকায় আয়োডিনযুক্ত লবণ বিক্রির একটি স্থায়ী কর্মসূচী নিতে পারে। না—লাভ, না-লোকসান ভিত্তিতে এই ব্যবসায় পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় দক্ষতার কি কোথাও অভাব আছে?

চারা ও বীজ সরবরাহ

বার বার বলতে বলতে নাকি একটা ডাহা মিথ্যা কথাও সত্যের মর্যাদা পেয়ে যায়। বাংলাদেশের মানুষের কাছেও এরকম একটা মিথ্যা কথাকে সত্যের মর্যাদায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বারংবার বলা হচ্ছে গাছপালা প্রতিপালনের দিকে বাংলাদেশের মানুষের কোন আকর্ষণ নাই। তাই বৃক্ষরোপণ পক্ষের মত এত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীটি কোন সফলতা বয়ে আনতে পারে নাই। আমরা বরাবরই ধরে নিই যে একটা কর্মসূচী সফল না হলে তার জন্য দায়ী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কর্মসূচীর কোন দোষ কখনও থাকতে পারে না!

চারা লাগানোর মৌসুমে সরকারী নার্সারীর চারা বাইরে কালোবাজারে বিক্রি হয়---এটা কি কারো কাছে কোন নতুন সংবাদ? যেদেশে গাছের চারা কালোবাজারে বিক্রী হয় সে দেশের মানুষকে গাছপালা প্রতিপালনে উদাসীন এই অভিযোগে অভিযুক্ত করে সুবিধা করা যাবে না।

পেটের দায়ে গাছ বিক্রীর সময় সারা পরিবারের কান্না এবং শোক যারা কোনদিন দেখে নি তারাই শুধু এসব অলীক কাহিনী রচনা করতে পারে এবং তাদের কাছে পরিবেশন করতে পারে যাদের সংগে দেশের মাটির কোন সম্পর্ক নাই।

চারা লাগানোর মৌসুমে যদি আমরা হাটে হাটে চারা বিক্রীর ব্যবস্থা নিতে পারতাম তাহলে দেখা যেতো বাংলাদেশে প্রতি বছর কত চারার প্রকৃত চাহিদা আছে।

তেমনি আরেকটি বিষয় হচ্ছে সব্জী বীজ। এক টাকা দামের প্যাকেট করে যদি সব ধরনের সব্জী বীজ আমরা গ্রামে গঞ্জের প্রতিটি পানের দোকানে মৌসুমের আগে আগে সাজিয়ে দিতে পারতাম, এদেশে সব্জীর ঢল নামতে পারতো। গরীবের পুষ্টি নিয়ে আমাদের চিন্তাটাও কমতো। মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়তো।

যেকোন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এ দু'টি কাজ অতি সহজে একটি সীমিত এলাকায় দক্ষতার সংগে চালিয়ে যেতে পারে।

যৌতুক

সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ এলাকায় অন্য সব কর্মসূচীর মাধ্যমে আরো একটি কাজ করে ফেলতে পারে। যৌতুকের অভিশাপ থেকে এলাকাকে মুক্ত করা। গরীব মানুষের জীবনকে কিভাবে যৌতুক নৃশংসভাবে ধ্বংস করে দেয়

সেটা সবিস্তারে বলার অপেক্ষা রাখে না। সবার আস্থা আছে এরকম কোন প্রতিষ্ঠান শক্তভাবে দাঁড়ালে সানন্দে সকলে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চাইবে। বহু বিবাহও এরকম সংসারধ্বংসী একটা প্রচলন। এটাকেও একইভাবে বিলুপ্ত করা যায়।

স্যানিটারী পায়খানা

আরেকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

আমরা একটি কথা সবাই মিলে ভুলে থাকতে চাই। এবং এতে প্রায় সফলও হয়েছি বলা চলে।

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেকাংশ মানুষ--- নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকলে --- খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত স্থানে প্রতিদিন পায়খানা করে। শীত, বর্ষা, গরম সকল মৌসুমেই একই পদ্ধতি। কোন সময় আমরা প্রাকৃতিক কোন আড়াল খুঁজে পাই, কোন সময় পাই না। আজ আমরা ক'জন শহরে এসে প্রায় লক্ষ টাকার বাথরুমে বসে সেই প্রাগৈতিহাসিক দিনগুলির কথা ভুলে যাবার ভান করলেও সেটা বাস্তব থেকে মুছে যায় নি।

গ্রামের গরীব মানুষের সংগে কাজ করতে গিয়ে আবার আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে এই সনাতন নিয়মটির সংগে। আমরা একটা সমাধান পেতে চাইলাম এই সমস্যার। যুৎসই কিছু বের করতে না—পেরে সবাইকে পরামর্শ দিলাম গর্ত করে পায়খানা করার জন্য। লোকজন আমাদের নির্বুদ্ধিতায় হতবাক হলো। তারা আপত্তি জানালো। তারা বল্লোঃ এতে খামাকা দুর্গন্ধ হবে। তারা বলতে চাইলোঃ পুরানো পায়খানার উপর নতুন পায়খানা করতে বসা, এর চাইতে অধিকতর বর্বর কাজ আর কি হতে পারে! অনেকে জানালেনঃ গর্তের উপর বসে পায়খানা করতে ভীষণ ভয় করে। যদি পা পিছলে পড়ে যাই গর্তের মধ্যে। বিশেষ করে বয়স্ক, বয়স্কা এবং বাচ্চাদের নিয়ে চিন্তা'র অন্ত থাকে না। আরো অনেক ঠাট্টা মশকরার কথা শুনলাম। আমরা সমানে উৎসাহ দিয়ে গেলাম গর্ত-পায়খানা বানানোর জন্য।

ক্রমে ক্রমে ঠাট্টা মশকরা কমে আসলো। লোকজন সত্যি সত্যি কায়দা মাফিক গর্ত করতে আরম্ভ করলেন। আমরা ঘিরাবেড়ার কথা কিছুই বলি নি। তাঁরা তার আয়োজন করলেন। কোথাও কলাপাতার ঘেরা কোথাও পাটখড়ির ঘেরা। অভিযোগ অনুযোগ ক্রমেই মিলিয়ে গেলো। এটাতে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে আসলেন।

এরপর আমরা স্যানিটারী পায়খানার কথা বল্লাম। দেড়শ' টাকায় উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে এরকম আশ্বাসও দিলাম। দেড়শ' টাকা একত্র করে অনেকে চল্লেন উপজেলার দিকে। কিন্তু দেখা গেলো দুনিয়াবী কাম এত সহজ নয়। দেড়শ' টাকায় স্যানিটারী পায়খানা পেতে হলে তার সংগে আরো তেলনুন খরচ যোগাতে হয়। অনেকে সেলামী-নজরানা দিয়েও স্যানিটারী পায়খানা নিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু সরকারী সূত্রে যে পরিমাণ স্যানিটারী পায়খানা পাওয়া গেলো সেটা হলো সমুদ্রে বিন্দুবৎ।

একদিন রংপুরের এক গ্রামে গর্ত করে পায়খানা করার কাজ লোকজন কি পরিমাণ গ্রহণ করেছে সেটা দেখে বেড়াচ্ছিলাম। এক বৃদ্ধা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বল্লেন ঃ বাবা, তুমি বেটি ছাওয়ালকে (মেয়ে মানুষকে) কবর আজাব থেকে নাজাত দিছো। ঘটনার আকস্মিকতায় বৃদ্ধার বক্তব্য বুঝে উঠতে আমার কিছু সময় লাগলো। কিন্তু যখন বুঝলাম তখন আমার মনে আরেক বিস্ময়ের ঘোর জেগেছে। বৃদ্ধা বোঝালেন, এদ্দিন মেয়ে মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। তার প্রয়োজন যত আশু এবং যত অপ্রতিরোধ্যই হোক না কেন রাতের অন্ধকার ঘনীভূত না-হওয়া পর্যন্ত তার পায়খানায় যাওয়া স্থগিত রাখতে হতো। পেটের অসুখ থাকুক আর যা-ই থাকুক। তার সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হতো রাত নামার জন্য। এখন গর্ত করে পায়খানা আর তার চারধারে পাতার ঘেরা থাকার ফলে রাতের অন্ধকার নামার জন্য কোন মেয়ে মানুষকে আর অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। এ-এক বিরাট মুক্তি মেয়ে মানুষের জীবনে।

খোলা জায়গায় পায়খানা করার বিরুদ্ধে বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি শুনেছি। কিন্তু এমন সহজ সরল মর্মঘাতী মানবিক যুক্তির কাছে সব কিছু হার মানে।

সরকার থেকে যে স্যানিটারী পায়খানা ১৫০ টাকায় পাওয়া যাবার কথা সেটা তৈরী করতে চারশ' টাকার উপরে খরচ পড়ে। চারশ' টাকা খরচ করা গরীব লোকের জন্য সহজ নয়। এই ডিজাইনটি পরিবর্তন করে এর অর্ধেক বা তার কাছাকাছি দামে এটা বানানো সম্ভব। এ—দামে যদি স্থানীয়ভাবে বাড়ীর কাছে এটা কিনতে পাওয়া যায় আমার ধারণা আমাদের দেশ যেমন পেটের অসুখ থেকে রেহাই পাবে, তেমনি আমাদের মা-বোনেরা "কবর আজাব" থেকেও মুক্তি পাবে।

সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থানীয়ভাবে স্যানিটারী পায়খানা তৈরী করার দায়িত্ব নেওয়া মোটেই কঠিন কিছু নয়। না-লাভ, না- লোকসান ভিত্তিতে এটাকেও সহজে চালানো যেতে পারে।

আমার আটপৌরে কথাবার্তা শুনে আপনারা নিশ্চয়ই খুবই নিরাশ হয়েছেন। একজন আমন্ত্রিত বক্তার কাছ থেকে হয়তো আপনারা অনেক মূল্যবান কথা শুনতে চেয়েছিলেন। আমার সীমাবদ্ধতার জন্য আমি আবারও আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এই মহতী সমাবেশে কথা বলার সুযোগ দিয়ে আমার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

জনাব সভাপতি সাহেব এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী. আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

হোটেল আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম– এ অনুষ্ঠিত রোটারী জেলা সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে প্রদত্ত বক্তৃতা তারিখ ঃ ১০-১১, জানুয়ারী ১৯৮৬

দুর্যোগ ঃ দুর্যোগ প্রতিরোধ
ও
অন্যান্য করণীয়

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। বাংলাদেশ অগনতি মানুষের জন্মভূমি। বাংলাদেশ অগনতি মানুষের অকারণ মৃত্যুর কারণ। অগনতি মানুষের অশেষ দুঃখের কারণ।

আমরা প্রায়ই ইতিহাস খুঁজে সাক্ষীপ্রমাণ টেনে নিয়ে এসে প্রমাণ করতে চাই বাংলাদেশ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমার্থক। মানব সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' শব্দ দু'টি দিয়ে আগের মত মানুষের সেই অসহায়ত্ব তুলে ধরা যায় না। আজকের দিনে প্রকৃতির কাছে মানুষ অসহায় থাকার কথা নয়। প্রকৃতি এখন আর মানুষকে আগের মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এখন বরং মানুষই প্রকৃতিকে নিজের কাজে খাটিয়ে নিচ্ছে।

প্রযুক্তির বর্তমান পর্যায়ে "প্রাকৃতিক দুর্যোগ" শব্দ দু'টির একটিই অর্থ হতে পারে ঃ আমরা সভ্যতার ক্রম বিবর্তনে পিছিয়ে আছি। এখনো আমরা প্রকৃতির কাছে অসহায়। আমাদের প্রযুক্তি নাই। আমাদের সম্পদ নাই। আমাদের সাংগঠনিক কাঠামো নাই। আমাদের সমষ্টিগত সংকল্প নাই। দুর্যোগের পর হা-হুতাশ নিয়ে মেতে উঠাই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কর্মে মেতে উঠার কথা আমরা ভাবি না। হা-হুতাশ-শেষে আমরা আবার আমাদের "দুর্যোগমুক্ত" গণ্ডীবদ্ধ জীবনে ফিরে যাই। পরবর্তী দুর্যোগ এসে না-পড়া পর্যন্ত তার কথা স্মরণ করতে চাই না।

"প্রাকৃতিক দুর্যোগ" কথাটি দিয়ে অনেক সময় দায়িত্ব এড়ানোর প্রচেষ্টা এসে পড়ে। দুর্যোগের একমাত্র কারণ সব সময় প্রকৃতি

মোটেই নয়। প্রায় সময় মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে দুর্যোগ সৃষ্টি হয়। তখন একা প্রকৃতির উপর পুরো দোষটা চাপিয়ে দেবার জন্যই যেন "প্রাকৃতিক দুর্যোগ" কথাটি রচনা করা হয়েছে। ঘুর্ণিবাত্যা হয় প্রাকৃতিক কারণে। কিন্তু ঘুর্ণিবাত্যা দুর্যোগে পরিণত হয় মানুষের কারণে। মানুষের প্রস্তুতির অভাবের কারণে। মানুষের সংগঠনের অভাবে। মানুষের সমমর্মীতার অভাবের কারণে।

প্রকৃতিকে বশে আনতে হলে সব সময় অঢেল টাকা লাগবে, বিরাট বিরাট যন্ত্র লাগবে, অনেক কারুকার্যমণ্ডিত প্রযুক্তি লাগবে, এমন চিন্তা করার কারণ নাই। অসংখ্য মানুষের শুধু মনের জোর আর হাতের জোরেই প্রকৃতিকে বেশ খানিকটা কাবু করা যায়। নানাদেশে এমন উদাহরণও প্রচুর রয়েছে।

বাংলাদেশে আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হবে ঃ ১. প্রকৃতি কোন প্রকার নিরাপত্তা সীমা লংঘন করলেই তাকে আমরা দুর্যোগে পরিণত হতে দেবো না। ২. আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হবে ঃ প্রকৃতি যেসব দিক থেকে নিরাপত্তা সীমা লংঘন করার প্রবণতা দেখায় সে সব দিকে আমাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো মজবুত করবো। ৩. আমাদের তৃতীয় সিদ্ধান্ত হবে ঃ দুর্যোগ চলাকালেই আমরা দুর্যোগ প্রতিরোধের কর্মসূচী শুরু করবো এবং পরবর্তী দুর্যোগ না-আসা পর্যন্ত সে কর্মসূচী অব্যাহত রাখবো।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি

দুর্যোগের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির দিকে আমাদের খুব একটা মন নাই। বাংলাদেশ আর দুর্যোগ সমার্থক প্রমাণ করার ব্যাপারে আমরা যতটা আগ্রহ দেখাই তার সংগে সংগতিপূর্ণ কোন উৎসাহ আমরা প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনে দেখাই না। যেদেশে দুর্যোগ নিয়মিত মেহমান সে-দেশে দুর্যোগ আর দুর্যোগের চেহারাতেই থাকার কথা নয়। কারণ দুর্যোগের প্রথম শর্তই হচ্ছে আকস্মিকতা, অপ্রস্তুতি, অস্বাভাবিকতা।

যে ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে তার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতিও মানুষ বুদ্ধিমান জীব হিসেবে এবং সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। যেখানে আজন্ম তুষারপাত হয় সেখানে বরফ খণ্ড দিয়েই মানুষ ঘর বানিয়ে নেয়, তার ভেতরই বসবাস করতে শেখে, বরফের উপর বিনাচাকায় চলতে শেখে।

প্রস্তুতির জন্য ঘটনাকে সকল দিক থেকে বুঝতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে। পূর্ববর্তী দুর্যোগগুলি তন্ন তন্ন করে পর্যালোচনা করতে হবে। কোথায় মানুষের শক্তি, কোথায় প্রকৃতির দুর্বলতা, কোথায় মানুষের দুর্বলতা আর প্রকৃতির শক্তি, সেটা চিহ্নিত করতে হবে। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের বশে আনার কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। মানুষের শক্তিকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে।

যে প্রাকৃতিক ঘটনা দুর্যোগের সূত্রপাত করে তাকে যদি "বহিঃশত্রু" হিসেবে আখ্যায়িত করি তাহলে করণীয়গুলি আমাদের পরিচিত শব্দে প্রকাশ করা চলে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে সম্ভাব্য শত্রুর উপর সার্বক্ষণিক আমাদের নজর রাখতে হয়। যখনই তার আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয় সংগে সংগে তাকে প্রতিহত করার, প্রতিরোধ করার যাবতীয় আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক

ব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে হয়। আক্রমণের সম্ভাবনার গুরুত্ব নির্দেশ করার জন্য সাংকেতিক ভাষা আগে থেকেই সকলের কাছে পরিচিত করে রাখতে হয়।

সাম্প্রতিককালে "শত্রুর" আক্রমণের সময় আমরা কোথায় কোথায় ভুল করেছি, কি কি ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলাম, কোথায় কিভাবে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে, জানমালের ক্ষতি হয়েছে সেগুলি সযত্নে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়। পরবর্তী করণীয়গুলি স্থির করে নিতে হয়। দুর্যোগের বেলাতেও একই কর্মসূচী অনুসরণ করতে হবে। এই কাজগুলি গুরুত্ব সহকারে সকল পর্যায়ে হওয়া উচিত। গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, এবং জাতীয় পর্যায়ের প্রত্যেক স্তরে নিজ নিজ এলাকার সাফল্য ও ব্যর্থতার জরীপ ও বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। তার ভিত্তিতে নতুন সিদ্ধান্ত এবং নতুন প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য নতুনভাবে সকল পর্যায়ের জন্য নীতিমালা প্রস্তুত করে রাখতে হবে---- যাতে পরবর্তী দুর্যোগের শুরুতেই এই নীতিমালা হাতের কাছে পাওয়া যায় এবং সকলেই নতুন কোন বিতর্ক সৃষ্টি না-করে নতুন কোন সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় না-থেকে এই নীতিমালা অনুসরণ করে দুর্যোগ মোকাবেলার কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

দুর্যোগ প্রস্তুতির কয়েকটি দিক আছে ঃ

ক. প্রাতিষ্ঠানিক দিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক দিক।
খ. আর্থিক দিক, বস্তুগত দিক, মানসিক দিক।
গ. তাৎক্ষণিক দিক, আসন্ন দিক, মধ্য মেয়াদী দিক, দীর্ঘমেয়াদী দিক।
ঘ. আইন শৃংখলার দিক, প্রশাসনিক দিক, জীবন ও সম্পদ রক্ষার দিক।
ঙ. মানবিক দিক, সমমর্মীতার দিক, ত্যাগের দিক, স্বার্থপরতা দিক।
চ. পারস্পরিক সংযোগ রক্ষার দিক, মনোবল রক্ষার দিক, সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষার দিক।
ছ. স্থানীয় দিক, রাষ্ট্রীয় দিক, আন্তর্জাতিক দিক।
জ. সরকারী দিক, বেসরকারী দিক।

দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতিমালায় উপরোক্ত সকল দিকের প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত এবং করণীয় তুলে ধরতে হবে।

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ কর্মসূচীর স্থানীয়করণ

দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ কর্মসূচীকে কার্যকর করতে হলে তাকে মূলতঃ স্থানীয় কর্মসূচী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গ্রাম, ইউনিয়ন এবং উপজেলাকে এই কর্মসূচীতে সব চাইতে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। স্থানীয় পর্যায়গুলিকে অবহেলা করে উচ্চতর পর্যায়গুলির মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা করার চেষ্টা করা হলে সে চেষ্টা কখনো ফলপ্রসূ হবে না। উপর থেকে কিংবা দূর থেকে সাহায্য সহায়তা এবং সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষায় বসে না-থেকে স্থানীয় জনসাধারণকেই সুশৃংখলভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে হবে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনায় এই মৌলিক নীতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে।

স্থানীয় সরকারসমূহের মধ্যে যেহেতু উপজেলা পরিষদ সকলের চাইতে অধিক সংগঠিত তার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট করতে হবে। সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য নিজ নিজ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, একে অপরের সংগে সমন্বয়ের ব্যবস্থা নির্ধারণ করবে, স্থানীয় সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, প্রতি বছর স্থানীয় এবং বাইরের সম্পদ আহরণের মাধ্যমে নিজস্ব স্থায়ী দুর্যোগকালীন তহবিল গঠন করবে। স্থানীয় সরকারসমূহ দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থানীয় তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলবে, নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় পূর্বাভাস ব্যবস্থা স্থাপন করবে, দুর্যোগকালীন সময়ে সুশৃংখল ভাবে দুর্বলকে (নারী, শিশু, বৃদ্ধ) অগ্রাধিকার দিয়ে সকলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করবে, স্বল্প নোটিসে স্থানীয় কিশোর, তরুণ যুবকদের (মহিলা ও পুরুষ) স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করবে, নিজস্ব জরুরী খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলবে, যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখবে।

স্থানীয় সরকারসমূহের সংগে সংযুক্ত সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের করণীয় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সকল স্বাস্থ্য কর্মী স্বাস্থ্য রক্ষার জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ করবে, সকল আইন রক্ষাকারী বাহিনী শান্তি রক্ষার জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ করবে। স্থানীয় সরকার দুর্যোগাবস্থা ঘোষণা করার পর স্থানীয় সরকারের অধীন সকল বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজ নিজ নিয়মিত কাজকর্মের বাইরে দুর্যোগ মোকাবেলার কাজে দায়িত্ব অর্পণের ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের উপর বর্তাবে।

দুর্যোগ মহড়া

দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি পর্যায়ে প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাপকভাবে দুর্যোগ মহড়ার মারফৎ ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনের অনুশীলন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

দুর্যোগের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি

দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর দিতে হবে। দুর্যোগের সময় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেসমস্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে সেগুলির উপর ভিত্তি করে আরো পরিশীলিত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যেতে পারে। বন্যার সময় ঘরবাড়ী ব্যাপকভাবে নষ্ট হয়, খাবার পানির অভাব হয়, ফসল মারা যায়, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। খরার সময় খাবার পানির অভাব হয়, ডায়রিয়া ইত্যাদি পেটের অসুখ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়, খাদ্যাভাব দেখা দেয়, ফসল মারা যায়, বীজতলা করা যায় না, শিশু মৃত্যু বেড়ে যায়। ঘূর্ণিবাত্যায় আকস্মিকভাবে অনেক ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়, বহু মানুষ হতাহত হয়, মৃত দেহ ছড়িয়ে থাকে, মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের অবস্থা করুণ হয়ে পড়ে। এরকম প্রত্যেক পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি সমস্যা মোকাবেলার জন্য সহায়ক হবে। আগে

থেকে এব্যাপারে লেগে না-থাকলে প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এজন্য সকল প্রকার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পিতভাবে সারা বছর ধরে দুর্যোগমুক্ত পরিবেশে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

আয় সৃষ্টির ব্যবস্থা

ব্যাপক দারিদ্র্য এদেশের সব চাইতে বড় এবং স্থায়ী দুর্যোগ। এই দুর্যোগের দ্বারা আমরা সার্বক্ষণিকভাবে বেষ্টিত আছি বলে এটা আর আমাদের চোখে পড়ে না। এই দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হলে অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলা করা সহজ হয়ে যাবে। দারিদ্র্যের এই দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব যদি সমগ্র জাতি এই দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। দারিদ্র্য নিরসনের বিষয়টি সম্পদ প্রাপ্তির বিষয় নয়----মূলতঃ এটা জাতির রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়, প্রত্যয়ের বিষয়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের দিন থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর ২ বিলিয়ন ডলার করে মোট যে বৈদেশিক সাহায্য এদেশে এসেছে তারপর অন্য যেকোন অজুহাতই তোলা যাক না কেন সম্পদের অপ্রতুলতার অজুহাত তোলা যায় না। তাছাড়া এদেশের নিজস্ব সম্পদ ত রয়েছেই।

প্রতি বছর কার্তিক এবং চৈত্র মাসে দেশে কাজকর্মের অভাব দেখা দেয়। চৈত্র মাসে খরা দেখা দিলে এবং তা দীর্ঘায়িত হলে গরীব মানুষ শেষ সম্বল বিক্রী করে, বন্ধক দিয়ে, অগ্রীম শ্রম বিক্রী করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

আমাদের অর্থনীতিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাৎসরিক উত্থান পতনের গতানুগতিক চক্রে আবদ্ধ না-থাকে। মন্দার মাসগুলি নতুন কর্মকাণ্ডে ভরিয়ে দেবার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ আবহাওয়া—নির্ভরতা থেকে বের করে এনে মানুষের সময়ের প্রাপ্যতা-নির্ভর করে তুলতে হবে। কৃষিকে অর্থনীতির বলবান স্রোতে পরিণত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সংগে সংগে সমান্তরাল এবং শক্তিশালী অকৃষির স্রোত সৃষ্টি করতে হবে। সকল মানুষের (মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের) জন্য সকল সময়ে আয়ের পথ সৃষ্টি করতে হবে। স্বকর্ম সংস্থানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে---- যেন যে কেউ ইচ্ছা করলেই আয় সৃষ্টির কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। আয় সৃষ্টির ব্যবস্থা পাকাপাকি করে গড়ে তুলতে না-পারলে শিল্পের উদ্যোগ ব্যাহত হতে থাকবে। শিল্প নিজস্ব গতিতে তরতর করে অগ্রসর হতে পারে তখন যখন তার পালে প্রবল চাহিদার হাওয়া লাগে। শিল্পের ভিত্তি মজবুত এবং ব্যাপক হয় যখন দেশের অভ্যন্তরে অগনতি মানুষের ব্যাপক চাহিদা মেটাবার সুযোগ সে পায়।

দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়

প্রস্তুতি যত সুশৃংখল হবে দুর্যোগকালীন সময়ে তার মোকাবেলা তত সুশৃংখল হবে। দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক আয়োজনটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এবং এই আয়োজন দুর্যোগের ভবিষ্যৎ মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুর্যোগ ধীর গতিতে চরম সীমার দিকে অগ্রসর হয়। প্রাথমিক

পর্যায় থেকে যেন একে অবহেলা করা না-হয় তার জন্য সচেতন থাকতে হবে। মোকাবেলার আয়োজন মোটেই না-করার চাইতে অতিরিক্ত আয়োজন করা অনেক ভালো। এতে দুর্যোগের ভয়াবহতা পরিহার করা নিশ্চিত করা যায়।

কিছু দুর্যোগ আছে মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত ক্ষতি সাধন করে দিয়ে চলে যায়। যেমন ঃ ঘূর্ণিবাত্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

ঘটনার আকস্মিকতায় মানুষ হতবাক হয়ে যায়। করণীয় সম্বন্ধে মাথায় কিছু যেন আসতে চায় না। এধরনের পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সকলকেই সজাগ করে দিতে হবে। প্রাণরক্ষা, সম্পদরক্ষা, শৃংখলা রক্ষা এই তিনটি কাজে যেন সকলেই নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রসর হতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এধরনের দুর্যোগে সব চাইতে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টি হচ্ছে দেশের সকল মানুষ মুহূর্তে একযোগে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে চায়, সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়---- কিন্তু সেই প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগানোর কোন আয়োজন থাকে না। বরং অনেক রকম ইতস্ততঃতা, সিদ্ধান্তহীনতা, নেতৃত্বহীনতা একত্র হয়ে দুর্যোগের মাত্রাকে সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়।

দুর্যোগ এবং দুর্ভোগ ঘনীভূত হয় অব্যবস্থার মাধ্যমে, অনিশ্চয়তার মাধ্যমে, হতাশার মাধ্যমে। প্রথম থেকেই এব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ে সর্বপ্রথম দরকার শৃংখলা, মনোবল এবং সাংগঠনিক কাঠামো। তারপর লাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, খাদ্য এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা। এর কোন একটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে পরিস্থিতি বিশৃংখলা এবং স্বার্থপরতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। যেকোন একটি জিনিসের সরবরাহের অপ্রতুলতায় মানুষ ভয় পায় না যদি জানে যা পাওয়া যাচ্ছে তা নীতিসম্মতভাবে সকলের মাঝে বন্টন করার ব্যবস্থা আছে। নীতি এবং শৃংখলার অভাব হলেই প্রত্যেকে অস্বাভাবিক রকম স্বার্থপর হতে আরম্ভ করে।

দুর্যোগকালীন আশ্রয় শিবির কোন বন্দীশালা নয় কিংবা এটা পঙ্গু হাসপাতালও নয়। আশ্রয় শিবিরে বহু পরিবারের নানা বয়েসের অনেক মহিলা ও পুরুষ মানুষ একত্রে বসবাস করেন। সুযোগ দিলে তাঁরা নিজেদের জন্য সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন এবং দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। যেমন প্রত্যেক আশ্রয় শিবির নিজস্ব শিক্ষা, আইন শৃংখলা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, প্রশাসনিক কর্মসূচী চালু করতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই কর্মসূচী পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াও আশ্রয় শিবিরের আশ্রয় গ্রহণকারীরা বাইরের মানুষকে সহায়তাদানেরও কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণতঃ আশ্রয় শিবিরে বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ করা হয়। বিনিময়ে আশ্রয় গ্রহণকারীদের বিভিন্ন পুনর্বাসন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

হিসাব রক্ষণ

দুর্যোগকালীন সময়ে টাকাপয়সা, অষুধপত্র, অন্যান্য সামগ্রী ব্যবহারের পূর্ণ হিসাবরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য এটা অত্যন্ত

জরুরী। কারো মনে যেন এমন কোন ধারণার সৃষ্টি হতে না-পারে যে দুর্যোগের সুযোগে কেউ অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করেছে।

দুর্যোগোত্তর করণীয়

দুর্যোগ কেটে যাবার সংগে সংগে প্রথম কাজ হবে সমস্ত হিসাবপত্র সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা। এ দায়িত্বটা সকল পর্যায়ে কঠোরভাবে পালন করতে হবে। গ্রাম থেকে সুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক প্রশাসনিক স্তরকে হিসাবপত্র সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করতে হবে। আমাদের দেশে হিসাবপত্র প্রকাশের রেওয়াজ সুরু হয় নি। ফলে আজগুবী সব গুজব ভেসে বেড়ানোর সুযোগ পায়। এসব গুজব মানুষের উদ্দীপনা ধ্বংস করে দেয়।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সকল পর্যায়ে দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির জরীপ কাজ সম্পন্ন করা। সংগে সংগে ক্ষয়ক্ষতির শ্রেণীবিন্যাসও করে ফেলা দরকার। কোন ক্ষতি পূরণে কি পরিমাণ সময় এবং অর্থ লাগবে তার প্রাথমিক হিসেব করে নেয়া যায়। এর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে নানা মেয়াদী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। কোন কোন ক্ষতি স্থানীয় সম্পদে এবং স্থানীয় উদ্যোগে পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়া যাবে। কোন কোন ক্ষতি পূরণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজন হবে।

দুর্যোগ যেমন ধ্বংস আনে, দুর্যোগের মাধ্যমে নতুন সৃষ্টির সুযোগও আসে। সৃষ্টির এই সুযোগকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে হবে।

প্রত্যেক দুর্যোগ যেন পরবর্তী দুর্যোগের ভয়াবহতাকে বিপুল পরিমাণে কমিয়ে আনতে সহায়ক হয়। দুর্যোগের অভিজ্ঞতা থেকেই দুর্যোগ প্রতিরোধের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যে জাতি নিজের অভিজ্ঞতাকে নিজের জীবন গঠনে কাজে লাগতে জানে না তার জন্য শুধু সীমাহীন দুর্ভোগই অপেক্ষা করতে থাকবে।

দুর্যোগ পরবর্তীকালে সকল নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, ও পুনর্বাসনকে দুর্যোগপূর্ব ছক ধরে অগ্রসর হতে হবে এমন কোন কারণ নাই। নতুন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন জ্ঞান ও নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে নতুন জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

দুর্যোগ মোকাবেলা একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়--- যে ব্যক্তি যত পণ্ডিত হোন, বা যত ক্ষমতাবান হোন। দুর্যোগ মোকাবেলা সমষ্টিগত দায়িত্ব। এই গোষ্ঠীবদ্ধ দায়িত্ব পালনে জাতি যত শৃংখলা ও মেধার পরিচয় দিতে পারবে ততই তার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ পাবে। সংকট মাত্রেই জাতির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। সুযোগ আসে তার সর্বোত্তম মেধার পরিচয় দেবার, সর্বোত্তম সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেবার, তার সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের ক্ষমতা প্রদর্শনের, তার মহত্তম গুণাবলী পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে মানবজাতির জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করার।

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা পরবর্তীকালে
গঠিত জাতীয় দুর্যোগ কমিটিতে উপস্থাপিত প্রতিবেদন, জানুয়ারী ১২,১৯৯০।

গ্রামীণ ব্যাংক
প্রথম দশক ঃ ১৯৭৬-১৯৮৬

কিভাবে গ্রামীণ ব্যাংক সুরু হলো

১৯৮৬—তে দশ বছর পূর্ণ হলো গ্রামীণ ব্যাংকের। দশ বছর আগে জোবরা গ্রামে যখন ভূমিহীনদের ঋণ দেবার চেষ্টা সুরু করি তখন ধারণাই ছিল না যে এ-চেষ্টা কয়েক বছর পর একটা ব্যাংকের অবয়ব নেবে। ছোট একটা স্থানীয় উদ্যোগ হিসেবেই সুরু করেছিলাম : ব্যাংকের কাছে গিয়েছিলাম একটা সমস্যার সমাধান খোঁজার জন্য। ব্যাংকের কাছে গিয়ে প্রথম বুঝতে পারলাম আমার সমস্যাটি স্থানীয় মোটেই নয়। আমার সমস্যাটির সমাধান করতে হলে পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে উল্টো করে সাজাতে হবে।

জোবরা গ্রামের সংগে আমার পরিচয় হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হলেই জোবরা গ্রামের মাঝখান দিয়ে যেতে হয়। গ্রামের রাস্তা বেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে পৌঁছতে হয় বলেই গ্রামের সংগে পরিচয় হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আজও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ জন ছাত্র-শিক্ষকের সংগে জোবরা গ্রামের কোন সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে উঠে নি। মাঝে মাঝে কোন উত্তেজনাকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় আর গ্রামকে মুখোমুখি হতে দেখি। কিন্তু দু'টো এক হয়ে কোন কাজে এগিয়ে এসেছে এমন ঘটনা ঘটে নি।

১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে আমি জনতা ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় গিয়েছিলাম জোবরার কয়েকজন ভূমিহীন ব্যক্তির জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে। সে ঋণের ব্যবস্থা সংগে সংগে হয় নি। বহুদিন দরবার করার পর আমি ব্যক্তিগতভাবে জামীনদার হয়ে সে ঋণের

ব্যবস্থা করেছিলাম। এই প্রথম অভিজ্ঞতা হলো ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণ দেয়না। ফলে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর পক্ষে ব্যাংকের ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। ক্রমে অভিজ্ঞতা হলো শুধু ভূমিহীন নয়, ব্যাংকের নিয়মকানুনের ফলে যাঁরা লেখাপড়া জানেন না তাঁরাও ব্যাংকের সংগে কাজ-কারবার করতে পারেন না। মহিলাদের সংগেও ব্যাংকের দূরত্ব প্রচুর। অথচ বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখলাম জামানত দিয়ে যে—সব ঋণ দেয়া হচ্ছে তার পরিশোধের ইতিহাস মোটেই সুখের নয়। যাঁরা ঋণ পান তাঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যাঁরা নিম্নবিত্তের তাঁদের ঋণ পরিশোধ করার প্রবণতা অন্যদের চাইতে ভালো।

আমি চেষ্টা করলাম যে—ভূমিহীনদেরকে ব্যাংক থেকে ঋণ সংগ্রহ করে দিলাম তাঁদের ঋণ পরিশোধের রেকর্ড যেন ক্রুটিহীন করে চালানো যায়। ফলে জামানতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সহজেই একটা প্রশ্ন তোলা যাবে। কিন্তু গরীব লোকের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায় করার উপায় কি?

প্রথম বুদ্ধি আসলো যে ছোট ছোট ঘন ঘন কিস্তির মাধ্যমে টাকা আদায় করতে হবে। দৈনিক কিস্তির ব্যবস্থা করলাম। রাস্তার মোড়ে একটা পানের দোকানে দৈনিক কিস্তি জমা নেবার ব্যবস্থা করলাম। তারপর বুদ্ধি আসলো তাদেরকে সব সময় চোখের কাছে রাখতে হবে। চোখের আড়াল হতে দিলেই টাকা ভাংচুর হবার সম্ভাবনা। সমবায় সমিতির মত করে সাপ্তাহিক সভার ব্যবস্থা করলাম। সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার ব্যবস্থা করলাম। তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক তদারকীর জন্য প্রাথমিক কাঠামো হিসেবে ঋণ ভিত্তিক গ্রুপ এবং তার ভেতর আরো ঘনিষ্ট তদারকীর জন্য "মিউচুয়াল এইড সেল" করলাম। এগুলি বেশীদিন টিকে নি। পরবর্তীতে এগুলি ভেংগে সমমনাদের গ্রুপ (৫ থেকে ১০ জন নিয়ে) বানালাম। দৈনিক কিস্তির স্থলে সাপ্তাহিক কিস্তিতে শোধ করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করলাম।

নিয়মনীতি যতই নিত্যনতুন করতে থাকি না কেন, পরিশোধ সঠিকভাবে চলতে লাগলো। আমিও নতুন নতুন ঋণ নিয়ে ভূমিহীনদের দিতে লাগলাম। ব্যাংক আপত্তি তুলতে পারলো না---- যেহেতু পরিশোধের ব্যাপারে কোন অনিয়ম নাই। কিন্তু ঋণ পাশ করানো একটা ঝামেলার ব্যাপার ছিল। এক একটা ঋণ প্রস্তাব পাশ করাতে চার মাস, ছ'মাস সময় লেগে যেতো। ঢাকায় জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে পাশ করিয়ে আনতে হতো।

এ-ব্যবস্থার থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। ঢাকায় একদিন কৃষি ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনিসুজ্জামানের সংগে আলাপ হচ্ছিলো। তিনি অভিযোগ করলেন একাডেমিসিয়ানরা শুধু বক্তৃতা দেয়, আসল কাজে তাঁদের পাওয়া যায় না। যেমন ঃ কৃষি ব্যাংকের এত সব জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য তিনি কারো কোন পরামর্শ পাচ্ছেন না। আমি প্রস্তাব দিলাম এত জঞ্জাল যেহেতু আমাকে দিয়ে পরিষ্কার করানো যাবে না--- আমাকে বরং একটা শাখা তিনি বানিয়ে দিক জোবরায় (যেখানে আমি নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো)। যেমন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনা জামানতে ঋণ দেয়া, কৃষি ছাড়াও অন্যান্য অকৃষি খাতে ঋণ দেওয়া ইত্যাদি। আমি বল্লাম যে কৃষি

ব্যাংকের নামকরণটাই ঠিক হয়নি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শুধু কৃষি কাজই হয় এই ধারণা নিয়েই কৃষি ব্যাংক করা হয়েছে। অথচ কৃষি ছাড়াও বহু ধরনের অকৃষিজাত কাজ গ্রামে সংগঠিত হয়। তার জন্য কৃষি ব্যাংক ঋণ দিতে প্রস্তুত নয়। আমি বল্লাম আপনারা এর নাম পাল্টে দিয়ে "গ্রামীণ ব্যাংক" করুন। তাহলে এটা দেশের বহু উপকারে আসবে।

আমার প্রথম প্রস্তাবে, অর্থাৎ জোবরায় একটা শাখা বানিয়ে সেটা সম্পূর্ণরূপে এক বছরের জন্য আমার হাতে ছেড়ে দিতে তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

এই আলোচনার সূত্র ধরে জোবরায় কৃষি ব্যাংকের একটা সাব অফিস খোলা হলো। শাখা খুলতে তিনি সক্ষম হলেন না--- তাঁর সহকর্মীদের আপত্তির কারণে। আমি সে সাব—অফিসের নাম দিলাম "পরীক্ষামূলক গ্রামীণ শাখা"। এর নিয়মকানুন নির্দ্ধারণ, লোক নিয়োগ, ঋণ অনুমোদন সব কিছুর দায়িত্ব পেয়ে গেলাম আমি। ১৯৭৮ সালের মার্চ মাস থেকে এটা চালু হয়ে গেলো।

ব্যাংকারদের সংগে আমার বিতর্ক চলতে রইলো। আমি যতই দাবী করি যে বিনা জামানতে গরীবদের ঋণ দেয়া যায়, ব্যাংকাররা ততই বল্লেন যে বিনা জামানতে ব্যাংকিং করা যায় না। আমি যতই বলি, দেখুন জোবরা গ্রামে কি রকম সুন্দরভাবে বিনা জামানতেরই ব্যাংকিং চলছে---- তাঁরা ততই বলেন একটি মাত্র গ্রামে একজন অধ্যাপকের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এরকম অস্বাভাবিক কাজ হলেও হতে পারে, কিন্তু সারা দেশে এটা চলবে না।

এই বিতর্ক যখন তুংগে উঠলো তখন আমাকে চ্যালেঞ্জের মত করে বলা হলো---- যদি আপনি নিশ্চিত হন যে এটা চলবে তবে একটা পুরো জেলায় সেটা করে দেখাতে হবে।

১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন ডেপুটি গভর্ণর জনাব এ, কে, গংগোপাধ্যায় একটি মিটিং ডাকলেন বিষয়টি বিবেচনার জন্য। রাষ্ট্রীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের এই সভায় ডাকলেন। সেখানে স্থির হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকল্প হিসেবে একটি জেলায় জোবরার অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত করা হবে। আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে এই প্রকল্প পরিচালনা করবো।

১৯৭৯ সনের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে টাংগাইল চলে গেলাম। ঐ জেলাতেই এই প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সুন্দরভাবে প্রকল্প এগিয়ে গেলো। আদায়ের হার শতকরা ৯৮/৯৯—এর মধ্যেই থাকলো। কিন্তু যেরকম উৎসাহ সহযোগী ব্যাংকগুলি থেকে আশা করেছিলাম সেরকম উৎসাহ দেখা গেলো না। তাঁরা বল্লেন খরচ বেশী পড়ে। ইফাদ থেকে একটা ঋণের ব্যবস্থা করলাম খরচ কমানোর জন্য। এর সংগে ঢাকা, রংপুর, পটুয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রকল্প সম্প্রসারণেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সবাই বল্লেন আমার ব্যক্তিগত নিবিড় তদারকী না- থাকলে প্রকল্প চলবে না। দূরের জেলায় প্রকল্প সম্প্রসারিত করে দেখতে চাইলাম কথাটি সত্য কিনা। দূরের জেলায় প্রকল্প যদি ঠিকমত চলে তাহলে আমার নিবিড় তদারকীর ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না।

আমার সংগে কথা ছিল প্রকল্প সঠিকভাবে চললে সব ব্যাংক এটা তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করবেন। প্রকল্প ঠিকমত চলতে থাকলো কিন্তু কোন ব্যাংকের পক্ষ থেকে এটা নিজস্ব কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করার কোন প্রস্তুতি দেখা গেলো না। আমার এখন ভয় হলো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবা মাত্রই পুরো জিনিটা গুটিয়ে ফেলা হবে, কিংবা বিকৃত করে ফেলা হবে।

আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রস্তাব দিলাম গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেবার জন্য। এর মালিক থাকবেন এই ব্যাংকেরই ভূমিহীন ঋণ গ্রহীতাগণ। প্রথমে তাঁরা এটাতে বেশী গুরুত্ব দিলেন না। পরে আমার আগ্রহের কারণে সেটা ব্যাংকার্স মিটিং-এ পেশ করা হলো। সবাই একবাক্যে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

অর্থমন্ত্রী জনাব মুহিতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি ব্যাংকার্স মিটিং—এ আমি প্রস্তাবটি আবার পেশ করার ব্যবস্থা করলাম। সকল ব্যাংক বল্লেন আরো একটি ব্যাংক বানানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। আমরা এই প্রকল্পকে সমস্ত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে আরো দেবো। কিন্তু পৃথক ব্যাংক করার কোন কারণ নাই।

কিছুদিন পর ভিন্ন ভংগীতে, অর্থাৎ পুরোপুরি ভূমিহীনদের মালিকানায় এই ব্যাংক না করে সরকারের সংগে মিলে এই ব্যাংক করার একটা প্রস্তাব অর্থমন্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলাম। মালিকানা প্রস্তাব করেছিলাম ৪০ ভাগ সরকারের, ৬০ ভাগ ভূমিহীনদের। অর্থমন্ত্রী মুহিত সাহেব সহানুভূতি দেখালেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে বল্লেন। তাই করলাম।

১৯৮৩-র সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ জারী হলো। কিন্তু মালিকানা পাল্টে গেলো। ৬০ ভাগ রইলো সরকারেরর হাতে, ৪০ ভাগ রইলো ভূমিহীনদের কাছে। আমি বল্লাম, ভবিষ্যতে যখন সুযোগ হবে তখন সরকারের শেয়ার ভূমিহীনদের নিকট বিক্রি করার জন্য আমরা আবেদন জানাবো। সরকার পক্ষ থেকে বল্লেন যে সেটা পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

প্রকল্প থেকে ব্যাংকে রূপ নিলো ৮৩-র অক্টোবর ২ তারিখে।

'৮৬-র জুলাইতে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশে এক সংশোধনীর ফলে ব্যাংকের মালিকানা বিন্যাসে মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। এই সংশোধনীর ফলে ব্যাংকের ৭৫ শতাংশ মালিকানা আসলো ভূমিহীনদের হাতে, বাকী ২৫ শতাংশ মালিকানা থাকবে সরকারের হাতে। এখন গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীনদেরই মালিকানায় ভূমিহীনদের কল্যাণে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। এর পরিচালকমণ্ডলীর ১৩ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন থাকবেন ভূমিহীন সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধি।

'৮৬ সালের সমাপ্তিতে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা দাঁড়িয়েছে ২৯৫-তে। পাঁচ হাজারেরও বেশী গ্রামে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে সর্বমোট ১৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগই মহিলা। ঋণগ্রহীতাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৪ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধের হার এখনো শতকরা ৯৮।

গ্রামীণ ব্যাংক কেন?

ধরে নেয়া হয় গরীব মানুষ তার আয় বাড়াতে অক্ষম যেহেতু উপার্জন করার মত কোন কাজে তার দক্ষতা নাই। তিনি শুধু তাঁর দৈহিক শ্রম ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না। তাঁকে উপার্জনক্ষম করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে একটা কিছু দক্ষতা লাভের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়ার। এই প্রশিক্ষণ ব্যতীত একজন গরীব মানুষ একটা মাটির ঢেলার মত। এর কোন কদর নাই। বাজারে তার কোন দাম নাই। যেহেতু ব্যাপকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হলে একটা রাষ্ট্রীয় আয়োজন লাগে, এবং সেটা হয়ে ওঠে না, ফলে তাঁদেরকে বেকার অবস্থায় বিনা উপার্জনে দিন কাটাতে হয়।

গরীব মানুষের উপার্জন করার ক্ষমতা নাই এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা। উপার্জনই যদি করতে না-পারে তবে গরীব মানুষ বেঁচে আছে কি করে?

গরীব মানুষ তাঁর নিজের দক্ষতা এবং পরিশ্রম দিয়ে যে শুধু নিজেই বেঁচে—বর্তে আছে তাই নয়, বরং তাঁর দক্ষতা এবং পরিশ্রমের ফসলে অন্যদের গোলাও ভর্তি হচ্ছে। সমগ্র জাতীয় আয়ের একটা বৃহৎ অংশ সৃষ্টি হয় গরীবের শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে। কিন্তু অর্থনীতির পাতায় সেটা সেভাবে স্বীকৃত হয় না। গরীব মানুষ তাঁর উৎপাদন থেকে ন্যায্য অংশ তাঁর নিজের জন্য রাখতে পারেন না। এর বৃহত্তর অংশ অন্যের নামে লেখা হয়ে যায়। গরীব মানুষকে জীবন ধারণের জন্য এমন এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হয় যে উপার্জনের ভাগ নিয়ে শক্তিধরদের সংগে তর্ক-বিতর্ক করার অবকাশ থাকে না। যা পান তা দিয়ে চলার চেষ্টা করেন। তাছাড়া শক্তিধরেরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো চারদিকে এমনভাবে খাড়া করে রেখেছেন এর মধ্যে প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগ গরীবের জন্য নাই। গরীব মানুষ তাঁর চারদিকে যা যেভাবে দেখে এসেছেন সেটাকেই জগতের নিয়ম বলে মেনে নিয়েছেন। নিজের অসহায় অবস্থায় তিনি কোন উচ্চবাচ্য না-করাই বুদ্ধিমানের পন্থা হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

উপার্জনের ন্যায্য ভাগই যে শুধু গরীব মানুষ পাচ্ছেন না তা-ই নয়। তাঁর যে দক্ষতা আছে সে দক্ষতাকে তিনি পুরোপুরি কাজেও লাগাতে পারেন না। তিনি কৃষি কাজ জানেন, কিন্তু সারা বছর কৃষি কাজ করার তাঁর সুযোগ নাই। যে ক'দিন গৃহস্থ তাঁকে কাজে খাটাবেন, শুধু সে ক'দিন তিনি কাজ করতে পারবেন। যতটা শ্রমঘন্টা তাঁর কাজে মজুত আছে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ তিনি প্রকৃত কাজে ব্যবহার করতে পারেন। বাকীটা নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম নষ্ট হয়ে যায় বলেই তিনি যেকোন মূল্যে সেটা বিকিয়ে দিতে তৈরী হয়ে যান। এজন্যেই আজও বাংলাদেশে পেটেভাতে, বিনামজুরীতে, কিংবা আধাসের চালের বিনিময়ে দৈনিক শ্রমিক পাওয়া যায়।

গরীব মানুষ কৃষি বহির্ভূত হাজারো কাজ জানেন। নিজের দৈনন্দিন জীবনে, উপার্জন উপলক্ষে, কিংবা জীবন ধারণের উপলক্ষে এই দক্ষতার কিছু অংশ তিনি কাজে লাগান। তিনি তাঁর সমগ্র দক্ষতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন না কারণ তাঁর কাছে কোন পুঁজির ভিৎ নাই। পুঁজির ভিৎ ছাড়া যে দক্ষতা সেটা পুঁজিওয়ালার ইচ্ছা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ

করার মত পুঁজির ভিৎ যদি গরীবের আয়ত্বে আনা যেতো তবে তিনি তাঁর দক্ষতা পূর্ণ ব্যবহারের দিকে এগুতে পারতেন। সংগে সংগে তিনি নিজের ক্রমাগত সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির একটা প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারতেন। সম্পদ বৃদ্ধির সংগে সংগে পুঁজির ভিৎ প্রশস্ততর এবং গভীরতর হতো, ফলে দক্ষতার বিনিময়ে উপার্জন আরো বাড়তো।

একারণেই গরীবের কাছে ঋণ এত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণের মারফৎ তিনি পুঁজির ভিৎ রচনা করতে পারেন। এজন্যেই, যে- মহাজন উপার্জনশীল কাজের জন্য ঋণ দেন, তিনি দৈনিক শতকরা দশ টাকা হারে সুদ নিয়ে ব্যবসা করতে পারেন।

ঋণ মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার

অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু সমাজের বিত্তবান অংশই ঋণ নিতে পারেন। বিত্তহীনদের প্রবেশাধিকার এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নাই। এর পেছনে যুক্তি হচ্ছে বিত্তহীনদের সংগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক লেনদেনের কোন ভিত্তি নাই। অর্থাৎ বিত্তহীন জনগোষ্ঠী কোন জামানত দিতে পারেন না। জামানতই যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের একমাত্র ভিত্তি হয় তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে তেলামাথায় তেল দেয়ার প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করলে মোটেই অযৌক্তিক হবে না।

ঋণকে অর্থনৈতিক শাস্ত্রে অত্যন্ত নিরীহ একটা ভূমিকায় চিত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে এটা ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে লেনদেনকে মসৃণ করে, তৈলাক্ত করে। এটাতে একটা সহযোগী ভূমিকা আরোপ করা হয়েছে। এরকম কল্পনা কেন শাস্ত্রকাররা করেছেন সেটা তাঁরাই বুঝেন। হয়ত তাঁরা আসল ভূমিকা ধরতে পারেন নি, অথবা তাঁরা ইচ্ছা করে প্রকৃত ভূমিকা গোপন করে গিয়েছিলেন। আমি ঋণকে একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভূমিকায় দেখি। ঋণ একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক অস্ত্র। সঠিক ঋণনীতির মাধ্যমে এবং লাগসই ঋণ—প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকে একটা নির্দিষ্ট চেহারার দিকে নিয়ে নেওয়া যায়। ঋণ একজন মানুষের জন্য সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রাণাধিকার সৃষ্টি করে। যিনি যত বেশী ঋণ আয়ত্বে আনতে পারেন তিনি তত ক্ষমতাবান। আজকের দিনে জরীপ করে যার হাতে যত ঋণ আছে দেখা যাবে তার থেকে নিশ্চিত করে বলা যাবে আগামীকাল কার হাতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতটুকু থাকবে। এবং কারা এর থেকে বঞ্চিত হবে।

বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে সকল ঋণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় উৎস থেকে উৎসারিত সেখানে ক্ষমতা বন্টন রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্য থেকেই জন্ম নেয়। ঋণের মাধ্যমে সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার দেয়া হলো বটে, কিন্তু শর্ত থাকে যে এই নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করে অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি করে ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হবে। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করার কোন ঐতিহ্য বাংলাদেশে সৃষ্টি হচ্ছে না। যিনি যত বড় তিনি তত বড় সম্পদ ঋণের মাধ্যমে আত্মসাৎ করে রেখেছেন এবং রাখছেন। এর ফলে সমাজে কি ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে সেটা বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। যেদেশে এক ইঞ্চি জমির অধিকার প্রতিষ্ঠিত

করার জন্য আপন সহোদরের মাথা ভাংতে কেউ দ্বিধা করে না, এক ব্যক্তির সম্পদ আরেক ব্যক্তি নিতে গেলে লাঠালাঠি হয়, সেদেশে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লোপাট করা যেন সকলের নাগরিক অধিকার বলে আমরা ধরে নিয়েছি। যে যত বেশী লোপাট করতে পারে সে-ই তত নমস্য ব্যক্তি, জাতীয় বীরপুরুষ।

জামানতই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের একমাত্র ভিত্তি এটা গরীবদের ঠকানোর একটা কৌশল মাত্র। জামানত ছাড়া ব্যাংকিং হবে না, এটা বলা আর পাখা না-থাকলে উড়তে পারবে না বলা একই কথা। মানুষের চাইতে উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণী দ্বিতীয়টি নাই। মানুষ কোন দিন আকাশে উড়তে পারবে এটা যেকোন সুস্থ মস্তিষ্কের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন ছিল। সে মানুষই এখন দিব্যি নানা দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে শুধু নয় তার মধ্যে আবার হাজার রকম খেলা দেখাচ্ছে। এই প্রাণীর জন্য যদি বলা হয় জামানত ছাড়া ব্যাংকিং করার বুদ্ধি এদের মাথায় নাই, তার চাইতে হাস্যকর বিষয় কি হতে পারে।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত ঋণ মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। ঋণের মারফৎ একজন মানুষ অর্থনীতির কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে রণসজ্জা নিয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। ঋণ ছাড়া তাকে প্রবেশ করতে বলা মানে শুধু শুধু মার খাবার জন্য ঠেলে দেয়া। এই মৌলিক মানবাধিকার সকলের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।

যারা ঋণ পাচ্ছে তাদের কাছ থেকে ঋণ আদায় নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।

দরিদ্র মহিলাদের অবস্থান

আমরা কর্ম-সংস্থানের কথা যখনই বলি তখন আমরা বরাবরই পুরুষের কর্ম-সংস্থানের কথা বুঝাই। মেয়েদের সংগে কর্ম-সংস্থানের কোন যোগাযোগ আছে এটা আমাদের মনেই আসে না। অনেক সময় এমন যুক্তিও শোনা যায় মহিলাদের কর্ম-সংস্থান হলে তাতে সামগ্রিকভাবে ক্ষতির কারণ হবে। কারণ এতে করে পুরুষদের কর্ম সংস্থান কমে যাবে। যেন পুরুষদের কর্ম-সংস্থানে ফায়দা এত বেশী যে তাকে ক্ষুন্ন করে মহিলাদের কর্ম-সংস্থান করা মোটেই কাম্য হতে পারে না।

মহিলারাও যে শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত এটা আমরা ভুলে গেছি। এটা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে।

আমাদের সমাজের প্রকৃত চেহারা দেখতে হলে মহিলাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখা দরকার। তাতে এই চেহারার বিকৃতিগুলি লুকিয়ে রাখার অবকাশ থাকে না। বিশেষ করে সে অভিজ্ঞতা যদি দরিদ্র মহিলার হয়। সমাজের নিপীড়নের যত কৌশল আছে সব ক'টি গরীব মহিলাদের উপর নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয়। এতে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের আশংকা থাকে না। দারিদ্র্যের নিপীড়নের সংগে পুরুষ-শাসিত সমাজ কর্তৃক দরিদ্র মহিলার প্রতি হৃদয়হীন আচরণের ভয়াবহতম অংশ যখন সংযুক্ত হয় তখন তা সভ্য সমাজের রীতি-নীতির গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে যায়।

আমাদের দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ স্বামী নিগৃহীতা, পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্তদের নিয়ে গঠিত। এঁদের যে পৃথক কোন ব্যক্তিসত্তা আছে, নিজস্ব কোন সম্ভাবনা আছে, সেরকম ধারণা করার সুযোগ সৃষ্টি হতে দিতে সমাজ নারাজ। অথচ সাংসারিক এমন কোন কাজ নেই যা তিনি করতে জানেন না, বা করেন না। সাংসারিক নানা কাজকর্মের যে দক্ষতা তিনি অর্জন করেন সে দক্ষতা অনায়াসে অর্থোপার্জনের কাজে লাগানো যায়। অন্যের বাড়ীতে ধান ভেনে সারাদিন একবেলা খানা এবং আধসের চাল পাওয়ার চাইতে নিজে ধান কিনে ভানতে পারলে কমপক্ষে দৈনিক বিশ টাকা নগদ লাভ, তার উপর খুদ-কুড়া। কিন্তু পুঁজির অভাবে তার পক্ষে এসবের কিছুই করার উপায় নাই।

দারিদ্র্য নিয়ে দুঃশ্চিন্তা কারো কম নাই। কিন্তু এই দারিদ্র্য যে—জনগোষ্ঠীকে কঠিনভাবে আঘাত করে তাদের কথা পৃথকভাবে আলোচনায় আসে না। দারিদ্র্য যাদের কাছে সব চাইতে রূঢ়তম রূপ নিয়ে দেখা দেয় তাঁরা হলেন দরিদ্র্য মহিলা। অভাবের দিনে স্বামীও নিখোঁজ হয়ে যায়। বাপ তার অভুক্ত সন্তানের মুখোমুখি না হবার জন্যে পালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু মা পারেন না। মা-কে অভুক্ত সন্তানের মুখে আহার যোগানোর জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। একজন দরিদ্র মহিলাকে যেভাবে সারাজীবন ধরে অভাবের মোকাবেলা করতে হয়, অন্য কাউকে সেভাবে করতে হয় না। দারিদ্র্য যেভাবে মহিলাকে অবমাননা করে, নিষ্পেষিত করে পুরুষকে সেভাবে করে না।

সেজন্য অভাব দূর করার সামান্যতম সুযোগ পাওয়া গেলে একজন দরিদ্র মহিলা যেভাবে সেটাকে আঁকড়ে ধরে, একজন দরিদ্র পুরুষ সেরকমটি করেন না। দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা মহিলাদের মাধ্যমে সফল হবার সম্ভাবনা সেজন্যই বেশী। মহিলারা তাঁদের আয় থেকে সঞ্চয় করার চেষ্টা করেন অনেক বেশী। মহিলারা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন পুরুষের চাইতে বেশী। তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান, সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান, সংসারের নিরাপত্তা চান। মহিলারা ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য বর্তমানে কঠোর পরিশ্রম করতে রাজী থাকেন। সন্তানের মংগলের জন্য, স্বামীর মংগলের জন্য তিনি আত্মত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকেন।

অথচ দারিদ্র্য বিমোচনের সামগ্রিক চিন্তায় মহিলারা একেবারেই অনুপস্থিত। আমার মতে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা মহিলাদের মাধ্যমেই অগ্রসর হওয়া উচিত।

দারিদ্র্য ও কর্ম-সংস্থান

কর্ম-সংস্থান হলেই দারিদ্র্যের অবসান হবে এরকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা দারিদ্রের কথা উঠলেই কর্মসংস্থানের খোঁজ করি। কর্ম-সংস্থান মাত্রেই দারিদ্র্যের অবসান নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে কর্ম-সংস্থান দারিদ্রকে চিরস্থায়ী করে দেবার একটা ব্যবস্থা মাত্র। কর্ম-সংস্থান থেকে যদি একজন ব্যক্তি তাঁর মৌলিক চাহিদা মেটানোর পর উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত আহরণ করতে না-পারে, তাহলে সে-কর্ম-সংস্থান তাকে দারিদ্র্যের মধ্যেই টেনে রাখবে চিরকাল। কারখানায়

শ্রমিকের কাজ করে সারাজীবন বস্তিতে কাটানোর নাম দারিদ্র্যের অবসান নিশ্চয়ই নয়। অথচ এর নাম কর্ম-সংস্থান।

মজুরী ভিত্তিক কর্ম-সংস্থানের মধ্যে এদেশের বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনে দারিদ্র্যের অবসান হবে না। কারণ, বেশীরভাগ মজুরীভিত্তিক কর্মে যে মজুরী পাওয়া যায় তা নুন-আনতে পান্তা–ফুরায় জাতীয় মজুরী। এটা মজুরীর সান্তনা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ যে বিপুল শ্রমশক্তি কর্ম-সংস্থানের অপেক্ষায় আছে তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মজুরীভিত্তিক কর্ম-সংস্থান পেতে পারেন। তৃতীয়তঃ মুজুরীভিত্তিক কর্ম সংস্থানে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নাই বললেই চলে।

আমাদের দেশের লোকের ঐতিহ্যগত পেশা (অর্থাৎ জীবিকার উপায়) হচ্ছে "গৃহস্থী"। "গৃহস্থী" শব্দের মোড়কে যে–ছবিটি তুলে ধরা হচ্ছে সেটি হচ্ছে একজন ব্যক্তি তাঁর সন্তান সন্ততি নিয়ে নিজের আহার নিজে উৎপাদন করেন, বাড়তি উৎপাদন অন্যের সংগে বিনিময় করে সাংসারিক প্রয়োজন মেটান। এটা স্ব-কর্ম–সংস্থানের একটা ধ্রুপদী চিত্র। সাম্প্রতিক কালে জমি–জিরাত হারিয়ে গৃহস্থী শব্দটার পাশাপাশি আরেকটি শব্দের প্রচলন হয়েছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য। সেটি হচ্ছে "টুকটাক করা"। "কি করেন?" "এই টুকটাক করি।" এটা ভূমিহীনের জীবনচিত্র। গৃহস্থীর ভিত্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। জমি–জিরাত নাই। গোলা নাই। গোয়াল নাই। আছে দু'খানা হাত। কাজেই তিনি তা-দিয়ে টুকটাক করেন। যখন যা পারেন তাই করেন। এর থেকে আহার সংগ্রহ করতে হয়। বেঁচে থাকতে হয়।

এটা একটা হতাশার ছবি। এই হতাশার মধ্যেও ক্ষীণ আশার আলো দেখি আমি। যিনি গৃহস্থী করেন তিনি জমির বাঁধনে আবদ্ধ,তাঁর জীবন ধারা ঋতু পরিবর্তনের মত অপরিবর্তনীয় চক্রে আবর্তিত, তাঁর চিন্তা গৃহস্থীর জীবনদর্শনের খুঁটিতে বাঁধা। যিনি টুকটাক করেন তিনি প্রতিনিয়ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। তিনি শিকারী। ঝোপ বুঝে কোপ। গৃহস্থ ধান কেটে বাড়ী নিয়ে গেলে তিনি খুঁটে খুঁটে একটি একটি করে ধান নাড়ার আশপাশ থেকে সযত্নে তুলে নেন। তিনি ইঁদুরের গর্তে হাত গলিয়ে দিয়ে ইঁদুরের থাবা থেকে সঞ্চিত ধানের গোছা টেনে বের করে আনেন। তাঁর চোখ সদা সচেতন। ভেতরে তাঁর কোন বাঁধন নেই। মূলতঃ তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে নারাজ নন। তিনি নতুন নতুন বুদ্ধি গ্রহণ করতে গররাজী নন। তিনি পরিবর্তনে আগ্রহী। মোটমাট, টুকটাকের মধ্যে একটা সম্ভাবনার রেখা আছে।

স্ব-কর্ম–সংস্থানকে আমাদের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে স্থান দিলে এই ছোট ছোট সম্ভাবনাগুলি বাস্তবে রূপ নিয়ে বিরাট অর্থনৈতিক জোয়ারে পরিণত হতে পারে। স্ব-কর্ম–সংস্থান মহিলাকে গুরুত্ব দেয়। পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে না, পরিবারের সকলে একই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে পারে, কেউ চাকুরী করে রোজগার করবে, অন্যরা বেতনের টাকা বসে বসে খাবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। স্ব-কর্ম–সংস্থানের পক্ষে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এটাকে অগ্রাধিকারের শীর্ষে যদি সত্যি সত্যি স্থাপন করা হয় তাহলে সমস্ত অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই হতে হবে---- কারণ স্ব-

কর্ম–সংস্থান সরাসরি গরীবদের ব্যাপার ---- এখানে কোন "মাধ্যমের" অবকাশ নাই। অথচ মজুরীভিত্তিক কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির নামে বিত্তশালীরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ নির্দ্বিধায় নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসার সুযোগটি পেয়ে যায়।

মজুরীভিত্তিক কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করতে গেলে মাথা পিছু যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বিনিয়োগের মাধ্যমে স্ব-কর্ম–সংস্থান নিশ্চিত করা যেতে পারে। এতে যেমন মুদ্রাস্ফীতির ভয় থাকে না, তেমনি অচল প্রযুক্তি বিক্রী করে এক থোকে অঢেল সম্পদ লোপাট করে নিয়ে যাওয়ারও উপায় থাকে না।

স্ব-কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে দরিদ্রের জন্য ঋণ কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিনিয়োগ, তুমি কার?

বিনিয়োগের শ্রেণী বিন্যাসে তিন ধরনের বিনিয়োগ সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়ঃ ১. রাষ্ট্রীয় খাত, ২. বেসরকারী খাত, ৩. বৈদেশিক খাত। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আমরা আলোচনার বাইরে রাখলাম। অন্য যে দু'টি খাত আছে দেখতে তা দু'রকম মনে হলেও আদতে এক। বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ যেটা ব্যয় হয় সেটাও মূলতঃ রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকেই আসে, রাষ্ট্রীয় অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে। কাজেই বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ কার মাধ্যমে হবে কি কাজের জন্য হবে, সেটা সরকার বেঁধে দিতে পারেন।

তাহলে সরকার বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের দায়িত্ব কার কাছে দেবেন? মনে করা যাক, সরকারের কাছে দু'টি বিকল্প আছে। একটি হচ্ছে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ কয়েকজন বড় শিল্পপতির হাতে তুরে দেয়া, যাতে করে তাঁরা বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে তুলে দেশে উৎপাদন বাড়াবেন এবং মজুরীভিত্তিক কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয় পন্থাটি সেই একই পরিমাণ অর্থ অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দেয়া যাতে করে তাঁরা তাঁদের চিন্তাভাবনা থেকে বুদ্ধি বের করে, টাকাটা খাটিয়ে নিজেদের আয় ও সম্পদ বাড়াতে পারে।

সরকার কার হাতে টাকাটা তুলে দেবেন?

আমার জবাব হবে, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থে, স্বনির্ভরতার স্বার্থে টাকাটা অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দেয়াই মংগলজনক হবে।

গুটিকতক শিল্পপতির হাতে এই সম্পদ তুলে দেয়ার অর্থ হবে তাঁদেরকে আরো সম্পদশালী করে দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়া। অল্প ক'জন শিল্পপতির হাতে পড়ে এই সম্পদের কত অংশ সত্যিকারভাবে বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার হবে, এবং কত অংশ বাইরে পাচার হয়ে যাবে, এবং/ কিংবা বিলাসী ভোগ্যপণ্যে ব্যয়িত হবে সেটা দেশের পরিস্থিতি থেকে আঁচ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে অংশ পাচার হলো সেটা থেকে জাতি সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত হলো। যে অংশ বিনিয়োগে লাগলো সেটি যাবে বিদেশী প্রযুক্তি-নির্ভর প্রায়

স্বয়ংক্রিয় এক শিল্প প্রক্রিয়ায়। এর আমদানীতে গেলে বৈদেশিক মুদ্রা, সেদেশের বিশেষজ্ঞদের আনতে এবং পুষতে ব্যয় হলো অজস্র। তারপর ভবিষ্যতের জন্য বাঁধা পড়লো দেশ, এই প্রযুক্তি আমদানীর মাধ্যমে। খুচরো যন্ত্রাংশ লাগবে, বিশেষ ধরনের কাঁচা মাল লাগবে, যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাগবে বিদেশী বিশেষজ্ঞ। দেশ পরনির্ভরতার জন্য দশ আংগুলের টিপসই দিয়ে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লো। এতেও শেষ নেই। সম্পদের যেভাগটা বিলাসীভোগ্যপণ্যে গেলো সেটাও দেশের ভাগে থাকলো না। বিত্তশালীদের যে বিলাসী ভোগ্যপণ্য সেটা আবার যেমন তেমন দেশ বানাতেও পারে না–আমাদের দেশে তৈরী হবে ঐ জিনিস এরকম ভাবাও অপমানজনক। কাজেই সেভাগটাও গেলো। এই বিলাস দ্রব্যকে তরতাজা রাখার জন্য আনুসংগিক যা-কিছু লাগবে সেটাও এখন বছরের পর বছর বিদেশ থেকে আনতে হবে।

এরপর মনে করুন শিল্পপতির কারখানা চালিয়ে প্রচুর মুনাফা হয়েছে। সে মুনাফা কোথায় যাবে? হয় বিনিয়োগে (যেটা হবে বিদেশ নির্ভর) কিংবা যাবে বিলাসী ভোগ্যপণ্যে(আবার বিদেশ)। মোট কথা আমাদের দেশে বিনিয়োগ করতে গিয়ে অর্থনীতি মোটা করলাম অন্য দেশের।

অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির হাতে যদি বিনিয়োগের অর্থ পৌঁছানো যেতো তাহলে পুরো চক্রটিই উল্টোদিকে, অর্থাৎ দেশের জন্য মংগলজনক দিকে ঘুরতো। গরীব মানুষ যেসব কাজে অর্থটা বিনিয়োগ করতো সেটা হতো মূলতঃ দেশী প্রযুক্তি নির্ভর, তার জন্য বিশেষজ্ঞ আমদানী করতে হয় না, তার কাঁচামাল গ্রাম কিংবা গঞ্জের হাটেই পাওয়া যায়। এই বিনিয়োগ করতে গিয়ে প্রত্যেকে নিজের গ্রামের কিংবা পাশের গ্রামের আর একজনের কাজের চাহিদা সৃষ্টি করলেন। বিনিয়োগের ফলে যে জিনিস তৈরী হলো সেটি গ্রামের হাটেই বিক্রী হলো। গরীবের আয়/মুনাফা হলে সেটা যে ভোগ্যপণ্যে ব্যয় হবে সেটা দেশেই প্রস্তুত হয় কিংবা প্রস্তুত করা যায়। একজনের উৎপন্ন দ্রব্য আরেকজন কিনবে। ফলে চাহিদার অভাবে মাল পড়ে থাকবে এমনটি হবার সম্ভাবনা কম থাকবে। দেশ স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হবে। দেশে আভ্যন্তরীণভাবেই অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। গরীবের জন্য নতুন সুযোগের সৃষ্টি হবে।

আমি বরাবরই আবেদন করে এসেছি অসংখ্য মানুষকে ফেলে রেখে গুটি কয়েক মানুষকে নিয়ে যদি অর্থনীতি সামনে চলতে যায় তাহলে অর্থনীতির চাকা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এমন এক দিকে ঘুরতে আরম্ভ করবে। অর্থনীতির চাকা একবার উল্টোদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলে এটাকে সোজা দিকে ঘোরানো বড় কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এখনো সুযোগ আছে এই চাকাকে দৃঢ় হাতে সোজা দিকে মুচড়ে দেবার।

ভূমিহীনদের যৌথ উদ্যোগ

১৯৮১ সালে প্রথম যৌথ উদ্যোগের দিকে আমরা পা বাড়াই। প্রথম কাজটি ছিল একটি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অগভীর নলকূপ ক্রয় করার জন্য যৌথভাবে ঋণ গ্রহণ। সাফল্যজনকভাবে তাঁরা ঋণটি একবছরের মধ্যে শোধও

করে দিয়েছিলেন। এর পরে যৌথ উদ্যোগ আসলো মহিলাদের ধানকল স্থাপন। বলতে এখন খুব সহজ মনে হলেও প্রত্যেকটির পেছনে প্রচুর উদ্যোগ-আয়োজন প্রয়োজন হয়েছিল। অগভীর নলকূপের বেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশ্ন করে বসলো ভূমিহীনরা অগভীর নলকূপ দিয়ে কি করবে? নলকূপ স্থাপনের জমি কোথায় পাবে? টাকা শোধ করবে কিভাবে? এটা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাছে এতো রকমের জবাবদিহি করতে হয়েছিল মনে হয়েছিল যেন আমরা অসামাজিক কোন কাজে লিপ্ত হতে যাচ্ছি–এবং তাঁদের হাতে ধরা পড়ে গেছি। দীর্ঘ একবছর এই লেখালেখি এবং বৈঠকের পরে অবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের ব্যক্তিগত সমর্থনের মাধ্যমে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কর্মকর্তাদের নিকট। পরবর্তীতে যখন আমরা গভীর নলকূপ যৌথ উদ্যোগে কেনার জন্য অগ্রসর হলাম, তখন বি, এ, ডি, সি, বেঁকে বসলেন। তাঁরা জানালেন যে সরকারের আইন অনুসারে ভূমিহীনদের নিকট গভীর নলকূপ বিক্রী করা যায় না। গভীর নলকূপ কিনতে হলে জমির মালিক হতে হবে। প্রথম প্রথম মনে করলাম এটা একটা মনগড়া কথা। সরকারের আইনে এটা থাকতেই পারে না। কাগজপত্র বের করে দেখলাম–কথাটি তাই আছে। অনেক দরবার করতে হলো এই আইন বদলাতে। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী সাহেবকে ধরলাম। তিনি নিয়মটি পরিবর্তন করতে সম্মত হলেন। আমাদের বক্তব্যের যুক্তি অনুধাবন করলেন। মন্ত্রী সাহেব লিখিত নির্দেশ দিলেন নিয়ম পরিবর্তনের জন্য। নির্দেশটি সরকারী যন্ত্রের নানা স্তর পার হয়ে হুকুম হয়ে বের করতে গিয়ে গলদগর্ম হতে হয়েছে আমাদের। নিয়মটি পাল্টে এখন করা হলো এরকমঃ যদি কোন গভীর নলকূপ বিক্রী করা হয়, এবং এই গভীর নলকূপটি কেনার জন্য কোন ভূমিহীন ব্যক্তি এককভাবে বা ভূমিহীনগণ যৌথভাবে কেনার জন্য আগ্রহী হয় তবে নলকূপটি ভুমিহীনদের নিকট অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিক্রি করতে হবে।

ক্রমে ক্রমে যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্র বেড়েছে। ঋণের পরিমাণও বেড়েছে। এককেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগ থেকে এক শাখার সকল সদস্যের যৌথ উদ্যোগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। পুকুর লীজ, জমি লীজ, হাট বাজার ইজারা, জলমহাল ইজারা, পাওয়ার টিলার, থ্রেশার, তেলের মিল, তাঁতের মিল, ধানকল, অগভীর ও গভীর নলকূপ ইত্যাদি নানা কাজে যৌথ উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। ৮৫-তে যৌথ উদ্যোগের মাঝে মাঝে ফাটল দেখা গেল। যৌথ উদ্যোগ চালাতে গিয়ে কেন্দ্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে অনেক জায়গায়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দু'একজনের হাতে টাকা পয়সার নিয়ন্ত্রণ চলে গেলো। বড় যৌথ উদ্যোগ চালাতে গিয়ে স্থানীয় কোন্দলের মধ্যে কেন্দ্র ঢুকে পড়লো। যৌথ উদ্যোগের উৎসাহে ভাটা নেমে আসলো।

৮৬তে আবার নতুন ধরনের যৌথ উদ্যোগ সুরু হয়েছে। ৮৫-র যোনাল ম্যানেজার সম্মেলনে স্থির হলো এখন থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রযুক্তি বিভাগ প্রথমে সরাসরি যৌথ উদ্যোগের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবে। উদ্যোগটি ব্যবসায়িক দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠলে ক্রমে ক্রমে তার মালিকানা এক বা একাধিক কেন্দ্রের হাতে ছাড়া হবে। গ্রামীণ ব্যাংক এক-চতুর্থাংশ মালিকানা নিজের কাছে

রাখবে এবং কিছুদিন পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজে রাখবে। তবে যখন স্থানীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে তখন অধিকতর দায়িত্ব স্থানীয় ব্যবস্থাপনার কাছে ছেড়ে দেয়া হবে।

এই নীতিতে প্রযুক্তি বিভাগ ক্রমে ক্রমে অচল যৌথ উদ্যোগগুলির দায়িত্ব নিজে নেয়া সুরু করলো। সেগুলি নতুনভাবে গড়ে তুলে ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল করে তোলার জন্য সচেষ্ট হলো। এখনো পর্যন্ত মনে হচ্ছে এ–নীতিতে যৌথ উদ্যোগ সফল হবার সম্ভাবনা আগের চাইতে অনেক বেশী হবে।

৮৬-তে এ-নীতি আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়া গেলো সম্পূর্ণ অভাবনীয় রূপে। মৎস্য মন্ত্রণালয় আমাদেরকে অনুরোধ করলেন নিমগাছি মৎস্য খামার নামক বিরাটাকার এক খামারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। এই খামারে ৫ হাজার বিঘা জলায়তনের মোট ৭ শত ৮৩ টি পুকুর আছে, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার ৪টি উপজেলায়। কোন কোন পুকুরের আয়তন ৫০ একরের উপরে। সরকার গত দশ বছরে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করেছে পুকুরগুলি সংস্কার করে মাছ চাষের জন্য। গাড়ী বাড়ী অনেক হয়েছে, কিন্তু পুকুর থেকে মাছ আসে নি।

মৎস্য মন্ত্রণালয় অবশেষে এর কোন গতি হবে না মনে করে সমগ্র খামারটি গ্রামীণ ব্যাংককে দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দেবার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। আমরা প্রথমে রাজী হই নি যেহেতু মাছ চাষের ব্যাপারে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই নাই। পরে আমরা সম্মত হই এশর্তে যে এটা ২৫ বছরের জন্য আমাদেরকে লীজ দেয়া হবে। এ মেয়াদকালে মৎস্য মন্ত্রণালয় আমাদের উপর কোন রকম চাপ প্রয়োগ করবেন না। আমরা সফল হলে আনন্দের বিষয় কিন্তু যদি বিফল হই তার জন্যে আমাদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

৮৬-র জানুয়ারীতে চুক্তি সই হলো। কিন্তু খামারের দায়িত্বভার পেতে পেতে জুন মাস পর্যন্ত সময় লাগলো। আমরা এর নাম পাল্টে নতুন নাম রাখলাম জয়সাগর মৎস্য খামার। এ-এক বিরাট সুপ্ত সম্পদ। মনে হলো এই পুকুরগুলোকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে বছরে তিন চার কোটি টাকার মাছ এখান থেকে উৎপন্ন করা যাবে। পুকুরের দখল নিতে গিয়ে দেখা গেলো কাগজপত্রে এগুলো সরকারের পুকুর হিসেবে আমাদেরকে হস্তান্তর করা হলেও এর অর্ধেকেরও বেশী পুকুর স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে দাবী করে ভোগদখল করে যাচ্ছেন। আমাদের দাবী তাঁরা গ্রাহ্য করতেই নারাজ। যে ক'টা পুকুরে আমরা আমাদের দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম সেখান থেকে ৮৬ সালে মাছ ধরলাম। দশ লাখ টাকার মাছ বিক্রী হলো।

পোনা উৎপাদন কেন্দ্রটি অবহেলায় পড়ে ছিল। সেটিকে আমাদের কর্মীরা সচল করলো। তারা প্রতিজ্ঞা করলো এই পোনা উৎপাদন কেন্দ্রে তারা অন্তত ঃ ১ শত কেজি (৪ কোটি) পোনা উৎপাদন করবে। তারা আগে কোন দিন পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া দেখে নাই পর্যন্ত। ব্যাংকের ম্যানেজার হতে এসে এখন হয়ে পড়েছে পোনা উৎপাদন কেন্দ্রের কারিগর। তাদের ধৈর্য এবং পরিশ্রমের জয় হয়েছে। ৮৬ সালে পুরো বাংলাদেশের সকল হ্যাচারীর মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ

পোনা উৎপাদন গৌরব তারা অর্জন করেছে প্রথম প্রচেষ্টাতেই। তারা ১ শত ৬৫ কেজি পোনা (৬ কোটি ৬০ লক্ষ পোনা) উৎপাদন করেছে।

অক্টোবরের বন্যায় অনেক পুকুর যেগুলিতে মাছের পোনা ছাড়া হয়েছিল ভেসে গেলো। যত উৎপাদন আশা করা হয়েছিল তত উৎপাদন করার আর সুযোগ রইলো না। এখন খামারের কর্মীরা আশা করছে ৮৭ সালের মাছ ধরার মৌসুমে ৩০ লক্ষ টাকার মাছ ধরা যাবে। মার্চ মাস থেকে মৌসুম সুরু হবে।

জয়সাগর মৎস্য খামার একটি বিরাটায়তনের যৌথ উদ্যোগ। এটার অংশীদার হবেন গ্রামীণ ব্যাংকের সকল সদস্য-সদস্যা। ক্রমে এই খামারের মালিকানা দেবার জন্য তাঁদের কাছে খামারের শেয়ার বিক্রী করা হবে। গ্রামীণ ব্যাংক এক-চতুর্থাংশ মালিকানা নিজের কাছে রাখবে এবং এই খামারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজে পালন করবে।

এই নীতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যে কোন আয়তনের যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা যায়। এর মুনাফা বাবদ বাৎসরিক যে লভ্যাংশ পাবেন সেটা সরাসরিভাবে একেকজনকে ব্যক্তিগত ভাবে না-দিয়ে প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য একটা "মুনাফা তহবিল" গঠন করা যায় এবং সে তহবিলে এ টাকা জমা করা যায়। এ-তহবিলের টাকা দিয়ে তাঁরা স্থানীয়ভাবে নতুন যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারেন, নিজেদের অবস্থার উন্নতি কল্পে নানারকম কর্মসূচী নিতে পারেন, যেমন ঃ গৃহনির্মাণ কর্মসূচী, যৌথভাবে জমি ক্রয়, আকাল নিরোধক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কর্মসূচী ইত্যাদি।

এরকম আরো একটি যৌথ উদ্যোগ মৎস্য মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে আমরা সুরু করেছি। সেটি হলো চকরিয়া চিংড়ী খামার। মৎস্য মন্ত্রণালয় থেকে ৩ শত একর জমি দশ বছরের জন্য লীজ নিয়ে এই খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৮৬ সালের চিংড়ী চাষ মৌসুমে এই খামারে ২৩ লক্ষ টাকার চিংড়ী মাছ উৎপাদন করা হয়েছে।

এই খামারটির মালিকানা চকরিয়া উপজেলার ১৫ হাজার গ্রামীণ ব্যাংক সদস্য সদস্যাদের মধ্যে সীমিত রাখা হবে। যদি সরকার থেকে আরো চিংড়ী চাষের জমি পাওয়া যায় তবে মালিকানার আওতা আরো সম্প্রসারণ করা যাবে।

যৌথ উদ্যোগের এ নতুন নীতিতে যেমন প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনার বড় বাধাগুলি অতিক্রম করা যাবে তেমনি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের একটি পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রাথমিকভাবে দেশের অজস্র অব্যবহৃত সম্পদও যদি এ ধরনের যৌথ উদ্যোগের আওতায় আনা যায় অর্থনীতি ক্ষেত্রে এটা বিরাট পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারবে। দেশের অবহেলিত খাস পুকুর, হাওড়-বাওড়, জলমহাল, হাজার হাজার একর চিংড়ী চাষোপযোগী জমি, বনাঞ্চল, উদাম পাহাড়, খাস জমি, বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল সব কিছুতেই প্রচুর সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। উপযুক্ত সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিলে এর মাধ্যমে বহু মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা যেতে পারবে।

ভূমিহীনদের নিকট নানারকম সম্পদ বন্টন করে দেবার সিদ্ধান্ত মাঝে মাঝে সরকার নিয়ে থাকে। কোন কোন সময় জমি, খাস পুকুর, চরাভূমি, মাছের জমি

ভূমিহীনদের নিকট বন্টনও হয়ে থাকে। তবে ব্যক্তিগতভাবে ভূমিহীনদের নিকট সরকার যা-ই দিক না কেন, সেটা তার কাছে সত্যি সত্যি পৌঁছার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। যদি সত্যি সত্যি কেউ পৌঁছাতে পারেও, তবে সেটা তার হাতে বেশীক্ষণ ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা করা কখনো সম্ভব হবে না, সেটা খাস পুকুরই হোক, বা সামান্য কম্বলই হোক।

গ্রামীণ ব্যাংকের পদ্ধতিতে যদি সংগঠিত ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে সম্পদের সমষ্টিগত মালিকানায় আনা যায় তাতে তার মালিকানা যেমন নিশ্চিত করা যাবে তেমনি তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী সোচ্চার করাও সহজ হবে।

এটা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সব ক্ষেত্রেই সম্ভব।